সুভাষ-মরণ সন্ধানে

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

জয়শ্রী প্রকাশন
কলিকাতা

উৎসর্গ

নেতাজীর জীবনাদর্শের রূপকার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী
সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়ক অনিল রায় স্মরণে।

ভূমিকা

'সুভাষ-মনন সন্ধানে'র গ্রন্থকার ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্রের মননের স্বরূপ-পরিক্রমায় ব্রতী হয়ে ভারতের জাতিসত্তা থেকে শুরু করে তার আন্তরসত্তার বিচারে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় গ্রন্থকারের অভিযাত্রা সুভাষ-মানস সন্ধানে নয়, তাঁর দৃষ্টি আরও গভীরে। কারণ, তাঁর অনুসন্ধিৎসা সুভাষ-মানসের উপাদানের উৎস-সন্ধানের দিকে উৎসারিত। গড়ে-ওঠা বস্তুটিকে গ্রহণ করবার পূর্বে কী দিয়ে বস্তুটি গড়া হ'ল, কোন্ কোন্ পদ্ধতিগত প্রয়োগে—সে সূত্রগুলিকে বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াসের স্বাক্ষর রয়েছে এই গ্রন্থ রচনার মধ্যে।

ভারতের জাতীয়-সত্তা অবচ্ছিন্ন, সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের ইতিহাস-ভূগোল-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য-বিরুদ্ধ বিপরীত প্রচার সত্বেও। সুভাষ-মননের এই পূর্বশর্ত থেকে লেখক গ্রন্থের আদিপর্ব সংগতভাবেই শুরু করেছেন। ব্যক্তিসত্তা যেমন অবচ্ছিন্ন, অবিভাজ্য— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ব্যক্তিমানসকে ভাগ করলে সেই ব্যক্তিসত্তার যেমন ধ্বংসসাধন অনিবার্য, তেমনি জাতিসত্তাকে খণ্ড খণ্ড সত্তায় বিচ্ছিন্ন করলে জাতীয়-মানস বিলুপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন-মানসের জন্ম দেবে। জাতীয় সত্তা অবচ্ছিন্ন, অবিভাজ্য— এই তত্ত্বটিকে তথ্যগত ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্র উপস্থাপন করেছেন। তারই ব্যাপক রেখাঙ্কন করে গ্রন্থকার সুভাষ-মননের এই অন্যতম পূর্বশর্তটিকে সুভাষচন্দ্রের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ; "ভারতবর্ষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবিভাজ্য একটি দেশ"। সুভাষ-মননে জাতিসত্তার এই সমগ্রতাবোধ থেকে উপজাত পারম্পর্যবোধ আর-একটি অলঙ্ঘনীয় পূর্বশর্ত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অমোঘ পরম্পরা কালের দিগন্তে সেতুবন্ধন রচনা করে সুভাষ-মননকে স্বকীয়তা দান করেছে। অতীত ভারত অতীতেই নিঃশেষিত তো নয়ই, বর্তমানে তা প্রবলভাবে সঞ্চারিত। এই অতীতসিক্ত বর্তমান, ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসের এই তো পরম্পরা ! ব্যক্তি-মানুষের জীবনে এই পরম্পরা নিছক কোনো যান্ত্রিক ঘটনা নয়। এই পরম্পরার বাহন হয়ে ইতিহাস কথা কয়, অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে সুভাষ-মনন দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয় নিয়ে বলেছে : "Life is a mission, a duty"। জীবনটা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মোহ নয়— জীবনের উপর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের দাবি রয়েছে। এই

কর্তব্যের দাবি থেকে আরো দাবি এসে হাজির হয়ে জীবনের ওপর পরোয়ানা জারি করে যায়— নিরাসক্ত, ত্যাগব্রতী, সেবাব্রতী হয়ে দেশমাতৃকার পদতলে আত্মনিবেদনের। তেমনি সুভাষ-মননের গভীরে যখন আর-একটি প্রত্যয়ের দৃঢ়তা জানিয়ে দিয়ে গেল "অতীত ভারত বর্তমানে বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে", তখনই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ভারতের অখণ্ড পারম্পর্য প্রাণবন্ত ও বাঙ্ময় হয়ে উঠল সুভাষ-মননে। "India of the past is not dead"—সুভাষ-মননের এই অনুপম মন্থন কেবলমাত্র বাক্যচ্ছটা নয়। অতীতের কাছে এই ঋণবোধ ভারতের জাতীয় সত্তা সম্পর্কে সুভাষ-মননের দৃঢ় প্রত্যয়ের পৃষ্ঠভূমি। তাঁর এই দৃঢ়মূল প্রত্যয় তাঁকে যেমন অপার শক্তি দান করেছে, তেমনি আগামীতে নূতন ভাবধারা গ্রহণে সুভাষ-মননের উন্মুখতাকে উজ্জীবিত করেছে। জাতির জীবনে অতীত-স্মরণের পৃষ্ঠভূমির অনিবার্যতাও সুভাষ-মননে এইখানেই নিহিত রয়েছে। এই কারণেই সুভাষ-মননের প্রত্যয়দৃঢ়তা থেকে আপ্তবাক্যের মতো উৎসারিত হয় যে-জাতি অতীত-বিস্মৃত সে আত্মবিস্মৃতও বটে। যে ব্যক্তি-মানুষের জীবন সুদৃঢ়ভাবে অতীতে গ্রথিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সংসারে তিনি যেমন ছিন্নমূল নোঙরহীন নৌকার মতো লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে তাড়িত হবেন না, তেমনি যে-জাতি অতীত-সিক্ত সে জাতিও আপন মর্মবাণীর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে পথভ্রষ্ট হবে না। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই যেমন সুভাষ-মননের বাণী উচ্চারিত হ'ল "আমার জীবনে একটা definite Mission আছে, তার জন্যই আমার শরীর ধারণ", তেমনি ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সুভাষ-মননের প্রত্যয়দৃঢ় বাণী এল "--India has a mission to fulfil"। ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পরিণতিতে বিশ্বমানবতার মুক্তির প্রতিশ্রুতি বহন করে এল এই বাণী— তারই রেখাঙ্কন ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রন্থকার তাঁর প্রারম্ভিক অধ্যায়ে। এই নিষ্ঠার অভিব্যক্তি অনুরণিত হয়েছে গ্রন্থের এই অধ্যায়ের উপসংহারে: "ভারতীয় সত্তায় অনুসিক্ত বলেই সুভাষচন্দ্রের 'ব্যক্তিস্বরূপ'কে আশ্রয় করে দেশের 'আত্মস্বরূপ' গড়ে উঠুক এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ" (পৃ: ৪৩)।

কোন্ সে পথ, যে পথে মানবতার বন্ধনমুক্তি ঘটবে এবং সর্বাঙ্গীণ বন্ধন-মুক্তির মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠিত হবে? সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের চোখ দিয়েই মৃন্ময়ী দেশমাতাকে চিন্ময়ী দেবীরূপে উপলব্ধি করে ভারতীয় জনজীবনকে মনুষ্যত্বের অবমাননার জ্বালা থেকে মুক্ত করতে সর্বস্বপণ আত্মনিবেদনের আহ্বান জানান। তাঁর কৈশোরের আদি

থেকে সুভাষচন্দ্র এই আত্মনিবেদনের পথের নিশানা দিয়ে গেছেন এবং সে-পথ ধরেই তিনি চলেছেন তাঁর সাধনার পূর্ণায়ত উপলব্ধিতে। মানবসেবার আদর্শ দিয়ে যে অভিযাত্রার শুরু; স্বদেশসেবার পথ বেয়ে সে পথে তিনি বিপ্লব-সাধনায় উত্তীর্ণ হলেন। সার্থক বিপ্লবী যে, অবরোধের পর অবরোধ ডিঙিয়ে তাঁকে পথ কেটে এগোতে হয়। বাস্তব জীবনে যেমন, মনন-সন্ধানেও তেমনি আত্মোপলব্ধির জগতে বিপ্লবীর আত্মজিজ্ঞাসার অভিযাত্রা তাঁকে আত্ম-আবিষ্কারের শেষ ধাপে পৌঁছে দিয়ে আত্মদহনে পরিশুদ্ধ; নির্মল করে তোলে— বিপ্লব-সাধক এই পরম্পরা অতিক্রম করে অধ্যাত্মসাধকের স্তরে উন্নীত হন। সুভাষচন্দ্রের মানসে বিপ্লব-সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনা তাই পাশাপাশি দুইটি গিরিশৃঙ্গের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধ্যাত্ম-সাধনাকে ভারতীয়ত্ববোধের পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। যে মানুষ নিজেকে চিনল না, জানল না, আত্ম-আবিষ্কারের সাধনায় মগ্ন হ'ল না, ভারতের বাণীর স্বরূপ উপলব্ধির অধিকার সে পাবে কোথায়? ভারতীয় জীবনবোধের ভাবনায় প্রত্যয়িত সুভাষচন্দ্র, ভারতের বাণীর মর্মোপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁর উচ্চকিত ঘোষণা : "ভারতের একটি বাণী আছে।"

ভারতীয়ত্বে অন্তহীন প্রত্যয় নিয়েই সুভাষচন্দ্র 'ব্রিটিশ-সম্পর্করহিত পূর্ণ স্বাধীনতা'র পতাকা ঊর্ধ্বে উত্তোলন ক'রে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিকল্প নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নিয়ে হিংসা-অহিংসার বিতর্কিত সীমানা অতিক্রম করে একই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্নতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে সেই অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশশক্তিকে পর্যুদস্ত করবার জন্য ভারতবর্ষকে দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানান। ১৯৪২ জানুয়ারিতে 'ফ্রি ইন্ডিয়া লিগেশন'-এর প্রথম বাহিনী গঠন করে সে দায়িত্বের প্রাথমিক পর্যায় পূরণ করলেন এবং ১৯৪৩-এ আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মধ্য দিয়ে তাকে পূর্ণায়ত রূপ দিলেন এবং সে বছর অক্টোবরে আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রূপে পরিগণিত হন। হার-জিতের ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ-দৃষ্টি এই মহাবিপ্লবী মহাসাধকের মূলমন্ত্র ছিল : "আমার যে সব দিতে হবে"। পরার্থপরতায়, জনসেবায়, স্বাধীনতার জন্য আত্মদানে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দেওয়া ছিল সুভাষ-মননের সর্বোত্তম পরিচয়। ১৯৪৪-এর আগস্টে ইম্ফল রণাঙ্গণে আজাদ-হিন্দ বাহিনী পশ্চাদপসরণের পর ব্যাকুল এক সেনাধ্যক্ষ নেতাজীকে প্রশ্ন করেছিলেন : "যুদ্ধে তো পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, আর যুদ্ধ করবার রইল কী?"

নেতাজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন : "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিয়ে যেতে হবে।"

স্বাধীনতার বেদীমূলে সর্বস্ব সমর্পণের আত্মিক মাধুর্যবোধ থেকেই ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে জাতির নেতৃত্বের প্রতি উদাত্ত আবেদন জানিয়েছিলেন : "My divine Motherland shall not be cut up"। যুদ্ধোত্তর প্রতারিত বিপ্লবের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রামবিমুখ, ক্ষমতা-লোলুপ জাতীয় নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশ-বিভাগ করে দিল। গান্ধীজীও দেশবিভাগের প্রবল বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রতিনিধিদের কাছে দেশ-বিভাগের সুপারিশ করে জীবনের উপান্তে নৈতিক স্খলনের স্বাক্ষর রেখে যান। সুভাষ-মননে যে ভারতীয়ত্ববোধ ভাস্বর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামের তূর্যধ্বনিতে, আপসের কালিমায় সেই দীপ্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এল। কলুষিত ভারতীয়ত্ববোধ, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়াল। এই সংকটের মধ্যেও সুভাষ-মননের বর্তিকা রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবের একমাত্র দিশারী হয়ে আছে।

সুভাষ-মনন, সমাজ-পরিবর্তনে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর পূর্বশর্তরূপে বারবার উপস্থাপিত করেছে। গ্রন্থের 'আর্থিক মননে সুভাষচন্দ্র' অধ্যায়ে গ্রন্থকার বৈপ্লবিক রূপান্তরের এই পূর্বশর্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্ম অথচ যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজবাদী কাঠামোর ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন সুভাষ-মননের স্বচ্ছদৃষ্টিতে সুপরিস্ফুট হয়ে আছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা এই পুনর্গঠনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। সেজন্য প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে পূর্বাহ্ণেই পরিকল্পনা তৈরি করে রাখতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর অকারণ কালক্ষেপণ না হয়। সমন্বিত ও সংহত শিল্পনীতি রচনা করতে হবে যাতে ক্ষুদ্র,মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কোনো বিরোধ না থাকে। কৃষক সমাজের উন্নতিসাধন করতে হবে, শিল্পোৎপাদন বিপুলভাবে বাড়াতে হবে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশকে শিল্পে নিযুক্ত করতে হবে।

সুভাষ-মনন ভারতীয়ত্ববোধের উপর আধুনিক জাতিগঠন করতে চেয়েছে, পরানুকরণের পথে নয়। সুভাষচন্দ্র বলছেন : "আমরা স্বভাবতই অন্যান্য দেশের পরীক্ষাগুলি বিবেচনা করে দেখব, কিন্তু কার্যত ভারতীয় পন্থায়…সে জন্য পরিশেষে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করব তা হবে ভারতবর্ষের প্রয়োজনের

উপযোগী এক ভারতীয় পদ্ধতি" (পৃ ১১৫)। কিন্তু বাহুবল, রাষ্ট্রশক্তির চোখ-রাঙানি নয় : "আমরা রাষ্ট্রকে জনতার সেবকরূপে সংগঠিত করে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি" (পৃ ১২৬)। ত্যাগব্রতের তপশ্চর্যা থেকে সেবাব্রতের শক্তি আহরণ করে সুভাষচন্দ্র ভারতীয়ত্ববোধের সঙ্গে মানবতাবোধের সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক মননে ত্যাগ ও সেবার মাপকাঠি প্রয়োগে কর্তব্য নির্ধারণে সুভাষ-মনন নিয়োজিত হয়েছিল। মার্কসবাদের নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত, মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় জড়শক্তির আতিশয্য, ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পরিণতিতে মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ্রমিক শক্তির পরিবর্তে ভারতীয় আর্থিক সামাজিক ক্ষেত্রে কৃষক শক্তির প্রাধান্যের ফলে সুভাষ-মননে মার্কসবাদ বর্জিত হয়েছে এবং স্থলবর্তী হয়েছে সমন্বয়ী দর্শন doctrine of synthesis। অর্থাৎ সমাজজীবনের অন্তিম লক্ষ্য চিরন্তন সংঘাত নয়, পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমন্বয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলছেন : "আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং তা মানবজীবনের মূলনীতি"। আর মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বিরোধ, বিদ্বেষ এবং বিরোধ অতিক্রমণের পর আর-এক বিরোধের আবর্তন। তাই মার্কসবাদ সম্বন্ধে সুভাষ-মনন ১৯৪৪ নভেম্বরে টোকিও-বক্তৃতায় আরো স্বচ্ছ ভাবনায় উপনীত হয়ে ঘোষণা করছে : "...এটা বলা বোকামি হবে যে, কোনো একটি পদ্ধতি মানব-প্রগতির শেষ কথা।...মানব-প্রগতি কখনো থামতে পারে না...আমরা ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সাধন করব..."(পৃ ১০২)।

মার্কসবাদের 'মুদ্রা-তত্ত্ব' ও 'উদ্বৃত্ত মূল্য-তত্ত্ব' বর্জন এবং গেসেল-এর 'ফ্রি-মানি তত্ত্ব' বিচারের জন্য আহ্বান সুভাষ-মননের একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ। এই গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রাঞ্জল অথচ বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন।

সুভাষচন্দ্র সিলভিও গেসেল-এর ভূমি-স্বত্ব এবং মুদ্রা-তত্ত্ব সম্পর্কিত নূতন নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-সম্পর্কে এই নীতিকে পুরাতন নীতির বিকল্পরূপে চিহ্নিত করেছেন (পৃ ১০৫)। আর জন মেনার্ড কীনস গেসেল-তত্ত্বকে "মার্কসের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার" জন্য বিকল্পরূপে দেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন : "...আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বংশধরেরা মার্কস অপেক্ষা গেসেলের চিন্তাধারা থেকেই বেশী শিক্ষা লাভ করবে" (পৃ ১০৫)।

সুভাষ-মনন ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিরও যেমন দিশারী তেমনি সমাজ-

পরিবর্তনের অন্যতম বলিষ্ঠ দিশারীও বটে। সুভাষ-মনন ভারতীয় কাঠামোতে, ভারতীয় ঐতিহ্যগত প্রেক্ষায় এই দুই কর্তব্যসাধনের নির্ভীক পথ-নির্দেশ দিয়েছে। হিংসা-অহিংসার অবাস্তব দ্বন্দ্বের সংকীর্ণ পরিধিতে তাকে সীমিত না করে এবং বাস্তবের অমোঘ দাবি স্বীকার করে নিযে তিনি বিপ্লবের তূর্যধ্বনি বাজিয়েছেন, তেমনি আত্ম-আবিষ্কারের দুর্গম পথ পরিক্রমা করে অধ্যাত্মচেতনার দ্বারপ্রান্তে পেঁছে গেছেন। বন্ধনমুক্তির সাধনাই যে অন্তরাত্মার মুক্তির সাধনার সঙ্গে গভীর পরম্পরায় আবদ্ধ, ভারতীয়ত্ববোধের এই দুর্লভ সঙ্গম থেকে যিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামী, বিপ্লব-পথের অভিযাত্রী, তিনিই আবার ভারতীয়ত্ববোধ থেকে উৎসারিত ত্যাগব্রতের সঙ্গে সেবাব্রতের মিলিত অভিযানে দুর্জয় শক্তিব্রতী হয়ে ওঠেন। ত্যাগব্রতী, সেবাব্রতী এবং শক্তিব্রতী —এই তিনটি সত্তার একটি সত্তায় অন্তরঙ্গ সংহতি-সাধনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়ত্ব-বোধে সঞ্জীবিত সকল কর্মের মহামিলন হবে সমন্বয়ের মহাসঙ্গমে। সুভাষ-মননের বিচিত্রধারার সংহত রূপ অভিব্যক্ত হয়েছে ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন কিংবা অন্যতর গোষ্ঠী-জীবন এবং সর্বশেষে জাতীয় জীবন সমন্বয়ের অভ্রান্ত লক্ষ্যে। এই সমন্বয়ের পশ্চাদভূমিতে প্রবাহমান রয়েছে প্রেম। প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্যই বিপ্লব আর প্রেমের ভিত্তিতে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রগত জীবনের পরস্পরবিরোধী উপাদানের সমন্বয় সাধন। তাই গ্রন্থকার তার গ্রন্থের অন্তিমে সংগতভাবে বিপ্লবী চিন্তানায়ক অনিল রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন : "নেতাজীর পথই ভারতের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

নিবেদন

এই পুস্তকখানি পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ধারাবাহিকভাবে বা একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি রচনার প্রেরণা হল, স্বর্গত বিপ্লবী চিন্তাবিদ সুভাষবাদের রূপকার অনিল রায়-রচিত 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থ, তাঁর অন্যান্য পুস্তক, প্রবন্ধাদি ও বিদগ্ধ আলোচনাসমূহ। বিপ্লবী নেতা অনিল রায় ছিলেন ত্যাগ ও বিপ্লব-মন্ত্রের দীক্ষাগুরু এবং বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মাত্র একান্ন বৎসর বয়সেই ১৯৫২ সালের ৬ জানুয়ারি তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুভাষ-অনুরাগী বা সুভাষবাদী বন্ধুদের আয়োজিত পাঠচক্র ও আলোচনা সভায় এই প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু প্রথম উপস্থাপিত হয়। সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা এই-সব বিষয়বস্তুর রূপরেখা রচনায় সহায়ক হয়েছিল।

এই পুস্তক রচনার সময় প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োজনমতো সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে এবং শেষ প্রবন্ধ 'নান্যঃ পন্থা' পুনর্লিখিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শ ও তাঁর জীবনের বিপুল কর্মরাজি সম্পর্কে ভিত্তিগত গবেষণার প্রচেষ্টার ক্ষেত্র আশ্চর্যজনকভাবে স্বল্পপরিসর। সেজন্য প্রতিপক্ষের দিক থেকে জনমনে নানাপ্রকার বিভ্রান্তি ছড়ানো সহজ হয়েছে। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সহজ শ্রদ্ধাবোধকে সরকারী, সংস্থা বা দলগত অবহেলা দিয়ে বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপের চেষ্টা এখনো সফল হয় নি। নেতাজীর মতবাদ এবং আজাদ-হিন্দ আন্দোলনকে অন্যায়ভাবে ফ্যাসীবাদ বা মার্কসবাদের ছাঁচে ফেলে আলোচনা বা সমালোচনার প্রবণতা প্রায়ই চোখে পড়ে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই ভুল ধারণা নিরসনের জন্য তথ্যগত আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রকে বর্তমানের পুঁথিগত ধ্যানধারণার নিরিখে বিচার করা যায় না। তাঁর চিন্তাধারা একটি স্বতন্ত্র খাতে বয়ে চলেছে এবং তা ভিত্তিগত ভাবে ভারতীয়। আর অতীত ভারতের চিন্তাধারা বৈশ্বিক ও মানবিক আবেদনে পূর্ণ। এই ভিত্তির উপর পৃথিবীর বিভিন্ন মতের ভালো দিকগুলির যৌক্তিক সংযোজনে সুভাষ-মনন রাষ্ট্রদর্শনে নূতন দিগন্ত রচনা করেছে। সুভাষ-দর্শন বর্তমান যুগের জীবনদর্শন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বিপুল ভাবে এবং সেখানে প্রজাতান্ত্রিক, সাম্যভিত্তিক, গণ-

তান্ত্রিক, সাংগঠনিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী সমাজব্যবস্থার পরিচয় রয়েছে। পঞ্চায়েতী বিকেন্দ্রীকরণের ধ্যানধারণা ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা এবং তার ধ্যান-ধারণায় আজো এর ফল্গুধারা বিভিন্নভাবে প্রবাহিত। সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শে ভারতীয় সাম্য-সমাজের পরীক্ষাদি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাঁর জাতীয়তার দর্শন এরূপ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে। আর ভারতের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে সুভাষ-মনন ধনবাদী ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এক গতিশীল সাম্যভিত্তিক ধ্যানধারণার সন্ধান দিয়েছে। সুভাষ-দর্শন কোনো দেশের মতাদর্শের অনুকরণ নয়, তা ভারতবর্ষের স্বকীয়, যদিও পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যুক্তিবিচারের নিরিখে গ্রহণে কোনো বাধা নাই।

এই সাম্যের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ তার অখণ্ড সাম্য সমন্বয়ের আদর্শ উপহার দেবে পৃথিবীকে আর প্রতিটি দেশের বিশিষ্ট অবদানের সমাহারেই পৃথিবীতে নূতন আন্তর্জাতিকতার জন্ম হবে। এ কথাই বলতে চেয়েছেন সুভাষচন্দ্র।

ভারতবর্ষে এর পরীক্ষা সফল করার পথে দুস্তর বাধার পাহাড় হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাকে বিদূরিত করেই তবে সাংস্কৃতিক, আর্থিক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভেদহীন প্রগতি সম্ভব। অহিংস উপায়ে এই নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করা যায় না কারণ সে হৃদয়বৃত্তির ধার ধারে না। এই বাস্তবতা থেকে সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বিপ্লবের দর্শন রূপায়িত হয় এবং তিনি অকল্পনীয় সাহসের সঙ্গে সমস্ত বাধা চূর্ণ করে প্রথমে যান জার্মানীতে, সেখান থেকে সাবমেরিনে সুমাত্রা ও পরে বিমানে জাপানে। পূর্ব-এশিয়ায় তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ পুনর্গঠিত করেন আর গড়ে তোলেন আজাদ-হিন্দ-সরকার ও তার অধীনে আজাদ-হিন্দ ফৌজ—যে-ফৌজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হেনে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অন্তর্বিপ্লবকে সফল করে তুলবে। বৃটিশশক্তি বিতাড়িত হবে এবং পরে ভারতবর্ষে মূর্ত করে তুলতে হবে অখণ্ড সাম্য-স্বাধীনতার আদর্শ—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন।

অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নি। তাঁকে দ্বিতীয়বার অন্তর্ধান করতে হয়েছে। কিন্তু আজাদী সৈনিকরা ধৃত হয়ে ভারতবর্ষে নীত হলে এখানে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা গড়ে ওঠে, সুভাষচন্দ্র যে পরিস্থিতির কথা পূর্বেই ভেবেছিলেন কিন্তু তা প্রতারিত হয়। তবুও বৃটিশ-ভারতীয়

বাহিনীতে বৃটিশের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভের জোয়ারে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয় যদিও সুভাষচন্দ্রের আকুল আবেদন উপেক্ষা করে ভারতীয় নেতৃত্ব দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন।

সুভাষ-মনন সন্ধানের পাঁচটি প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা ও তাঁর কর্মের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও তাঁর জীবন-দর্শন সম্পর্কে নূতন চর্চার আবেগ যদি বৃদ্ধি পায় তা হলেই শ্রম সার্থক মনে করব। বক্তব্যের পূর্ণতার জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনা থেকে একই উদ্ধৃতির পুনরুল্লেখ করতে হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে টীকা ও পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

মুদ্রণ সম্পর্কিত নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আলোচনা বা সমালোচনা কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত ও বিবেচিত হবে।

এই প্রবন্ধসমূহ ও পুস্তক রচনায় আমার সতীর্থ বন্ধুরা উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। পুস্তক রচনায় ও প্রকাশে ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীবিজয় নাগের অকুণ্ঠ সাহায্য রয়েছে। শ্রীসুবিমল লাহিড়ী মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

সূচীপত্র

ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র

মধ্যপ্রদেশ যুবসম্মেলনে (২৯ নভেম্বর ১৯২৯) সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে তার আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে...।"[১] এর জন্য সমগ্র জাতির মধ্যে বন্ধনমুক্তির প্রেরণা জাগ্রত ক'রে তাকে নূতনভাবে চেতনাঋদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। এর সফল রূপায়ণ জাতীয়তার প্রকৃত অনুশীলনের মধ্য দিয়েই ঘটতে পারে। বৃটিশশক্তি ভারত ত্যাগ করলেও ইতিহাস-সচেতন নেতৃত্বের অভাবে জাতির বিশিষ্ট সত্তা জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে একটি ছেদহীন মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহের ধারক হয়েও বর্তমানের ভারত অতীত ঐতিহ্যের সমকক্ষতা অর্জনে নিজেকে উত্তীর্ণ করে তুলতে পারেনি। তাই স্বাধীনতা অন্দোলনের শেষ প্রান্তে বহুদিনের সঞ্চিত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আকুল আবেদন উপেক্ষা ক'রে, যে ইতিহাস-বিরোধী দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক চরমতম দুর্ভাগ্যময় প্রতারণার কাহিনীরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আমরা যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছি, যার অবদানকে বিশ্বের ভাণ্ডারে তুলে দিতে চেয়েছি, যে ভারতের সাধনার ফল জাতীয় ভাবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে গেছে, বর্তমানে তার ঐতিহাসিক রূপায়ণের পন্থা সম্পর্কে স্বতঃই প্রশ্ন উঠবে। বর্তমান যুগে জাতীয়তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আন্তর্জাতিকতার একনায়কী ঢেউ এই প্রশ্নকে আরও গুরুতর করে তুলেছে। তাই ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আত্মিক ও রাষ্ট্রিক উপাদানে সমৃদ্ধ, তার জাতীয়তার অনুশীলন ভারতের ভবিষ্যৎ মিশনের দিকে অগ্রসর হবার বাস্তবপন্থা নির্বাচনে সহায়তা করবে।

ভৌগোলিক সত্তা

জাতিসত্তার গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের অবদান অলঙ্ঘনীয় এবং সেদিক থেকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক প্রকৃতি তাকে একটি বিশিষ্টসত্তা দান করেছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন: "ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসাবে যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তরে বিশাল হিমালয় আর দুদিকে অসীম সমুদ্র পরিবেষ্টিত

ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"[২] এই ভৌগোলিক সত্তা জাতি-সত্তার অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে স্বীকৃত। বৃটিশ শাসকেরা ভারত-বর্ষের একত্বকে আমল দিতে চাননি এবং বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের অনৈক্যের দিক-গুলিকে তুলে ধরতে তাঁরা কোন কার্পণ্য করেন নি।[৩] ভারতবর্ষের ভূগোল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা একজন ইংরেজ লেখক তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন: "ভারতবর্ষকে সাধারণভাবে একক দেশ মনে করা হয়, কিন্তু তা সত্য নয়,...ভারতবর্ষকে বরং কয়েকটি দেশের সমষ্টি বলা যায়।"[৪] Sir John Strachey-র মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলেছেন: "ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রথম এবং মুখ্য বিষয় জানবার হ'ল—পশ্চিমী ধারণায় ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক কোন প্রকারেরই ঐক্য নাই, সেজন্য ভারতবর্ষ বলে কোন একটি দেশ নাই বা ছিলও না।"[৫] ভারতবিদ্বেষী পশ্চিমী পণ্ডিতদের যুক্তিগুলি বৃটিশরাজের ভেদ-নীতিকে (divide and rule policy) স্থায়িত্ব দান করার তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় আমরা আরও দেখব ... প্রাকৃতিক ভিন্নতার মতের অনুরূপ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত ভিন্নতার মত সৃষ্টি করে ভারতের জাতীয়তাকে দুই জাতিতত্ত্বে রূপ দেবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং সে প্রচেষ্টায় বৃটিশরাজ যে সফলতা অর্জন ক'রেছিল তার বেদনাদায়ক ইতিহাস কারো অজানা নয়।

যাই হ'ক ভৌগোলিক ঐক্য অনৈক্যের বিষয়ে ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল। যেমন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ V. A Smith বলছেন: "সমুদ্র আর পাহাড়ঘেরা ভারতবর্ষ যে একটি ভৌগোলিক সত্তা তাতে সন্দেহ নাই এবং সেজন্য তাকে একটি নামে অভিহিত করাই যথার্থ।"[৬] সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle পুস্তকের ভূমিকায় V. A. Smith এর Oxford History of India নামক পুস্তকের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে Smith বলেছেন: "সাধারণত ইউরোপীয় লেখকগণ ভারতের একত্ব অপেক্ষা তার ভিন্ন-তার দিকগুলি সম্পর্কে বেশী সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন।" এই বিষয়ে Smith তাঁর উল্লিখিত পুস্তকের ভূমিকায় অন্যত্র বলেছেন, "Joseph Cunningham এর মতো অস্বাভাবিক স্বাধীনচেতা লেখক হ'লেন এর ব্যতিক্রম।" Smith, Cunningham এর লেখা থেকে উদ্ধৃত দিয়েছেন, যেখানে Cunning-ham বলছেন: "কাবুল থেকে আসাম উপত্যকা এবং সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত হিন্দুস্তানকে একটি দেশ, একটি রাজ্য হিসাবে দেখা হয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনগণের মন, যে জনগণ একই মহারাজাধিরাজের অধীনে একজাতি হিসাবে বসবাস করেছেন।"

ভূগোল বিষয়ে পণ্ডিত Chisholm বলছেন: "প্রকৃতি ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডরূপে চিহ্নিত করেছে, পৃথিবীর অন্যত্র যার তুলনা বিরল। এই

অঞ্চলটির প্রাকৃতিক গঠনে এবং জলবায়ুতে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে তার পার্থক্যকে উপেক্ষা করার উপায় নাই।"[৭]

জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান তার ভৌগোলিক সত্তা এবং ভৌগোলিক ঐক্য থাকলে জাতীয়তার অন্যান্য দিকগুলি প্রকাশিত হ'য়ে কালক্রমে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। "...এই ভৌগোলিক সত্তা...অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাকারী শক্তির —যেমন স্থানীয় আচার ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির—বিরুদ্ধে কাজ করে।"[৮] পণ্ডিত রাধাকুমুদ মুখার্জি ভারতবর্ষের মূলগত ঐক্যের সমর্থনে অনেক যুক্তি উত্থাপন ক'রে ভারতের ঐক্যের ইমারতের ভিত্তিস্তম্ভগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর উল্লিখিত পুস্তকের ভূমিকায় সেই সব যুক্তি-গুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে, ভারতের (পাকিস্তান সমেত) প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদগুলি (যেমন কয়লা, লৌহ ইত্যাদি) বিভিন্ন অঞ্চলে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যাতে আঞ্চলিক পারস্পরিকতার মধ্যেই জাতীয় অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা নির্ভর করে এবং সেজন্যই ভারত বিভাগ নিতান্তই রাজনৈতিক—প্রাকৃতিক নয়।

জাতীয়তার বিষয়ে অন্যতম পণ্ডিত Hans Kohn বলছেনঃ "জাতীয়তার গঠনে সর্বপ্রধান বাহ্যিক উপাদান হ'ল একটি সাধারণ ভৌগোলিক অঞ্চল।... রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বতন্ত্রতার কারণেই কানাডীয় প্রমুখ জাতি গড়ে উঠেছে।"[৯]

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতিসত্তাকে ভিত্তি-গত উপাদানে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ধ্যানগম্ভীর হিমালয়, লীলাচঞ্চল সমুদ্র, সুদীর্ঘ শ্যামল সমতল আর উপত্যকা মিলিয়ে যে ভৌগোলিক ভারত– জাতি-সত্তায় তার অবদান ভারতবর্ষ নামের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে।

ভারতীয় জাতির গঠন ও তার সভ্যতা

ভারতের সভ্যতা অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পুরাতন এবং সেই কাল থেকে মোটামুটি তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বয়ে চলেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ "এর থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় জনতার সজীবতা, তাদের সংস্কৃতি সভ্যতার সজীবতা।"[১০] তিনি আরও বলেছেন যে মোহেন-জো-দড়ো হড়প্পার খননকার্যের পরে এটা নিশ্চিত জানা গেছে আর্য বিজয়ের বহুপূর্বেও ভারতবর্ষ এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল।[১১] ভারত ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সুভাষচন্দ্র কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যার মধ্যে তিনি বলেছেনঃ "ভারতের ইতিহাসে সব সময়েই দেখা

গেছে সমস্ত বিদেশীগণ ভারতীয় সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে গেছেন। বৃটিশেরাই এর প্রথম এবং একমাত্র ব্যতিক্রম।"[১২]

ভারতবর্ষে আর্যরা আসার আগে নানা জাতির বসবাস ছিল, এঁদের মধ্যে প্রধানতঃ দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিকরাই প্রধান এবং তাঁরা তাঁদের বিশিষ্ট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। আরও আদিম ছিলেন নেগ্রিটোরা যাঁরা সমুদ্রোপকূলে বসবাস করতেন। এঁদের অবস্থিতি এখন খুঁজে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে—অষ্ট্রিকরা এসেছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পথে। অনেকের মতে তাঁরা এসেছিলেন এশিয়া মাইনর থেকে। কোল ও খাসিয়াগণকে এঁদের উত্তরপুরুষ বলে চিহ্নিত করা হয়। গঙ্গার উপত্যকা, মধ্য ও দক্ষিণভারতে এবং হিমালয় অঞ্চলে এঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ধানের চাষ, পানসুপারির ব্যবহার, হিন্দুর পূজা পদ্ধতি ও বিবাহের নানা অনুষ্ঠান এবং পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি অষ্ট্রিকদের অবদান বলে অনুমিত হয়েছে। ''অষ্ট্রিকভাষী জনগণ উত্তর ভারতের সমতল অংশে এখনকার হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে, তাদের পৃথক অষ্ট্রিক অস্তিত্ব বর্জন করেছে।"[১৩]

দীর্ঘকায় সরলনাসিক দ্রাবিড়েরা এসেছিলেন সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে, আর্য আগমনের কয়েক সহস্র বছর পূর্বে এবং তাঁরা ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করতেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁরা উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অষ্ট্রিকদের সঙ্গে বসবাস করতেন। অষ্ট্রিক কোল ও দ্রাবিড় এই দুই জাতির খুব মিলন মিশ্রণ ঘটেছিল ব'লে বোধ হয়। হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে আহৃত। শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগসাধনার মূলতত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় ব'লে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক ব'লে বোধ হয়।[১৪]

আর্যরা শক্তিশালী জাতি হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের ভাষা আর সঙ্ঘশক্তি ছিল জোরালো। আর্যরা অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতার ধারক ছিলেন এবং অষ্ট্রিকরা মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতা ও দ্রাবিড়েরা নাগরিক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন। এঁদের সকলের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটতে লাগল, আর্যের ভাষা ও ধর্মের অনুষ্ঠানাদি অনার্যরা (আর্যপূর্ব অধিবাসী) মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে আর্য অনার্য সভ্যতার অঙ্গাঙ্গি মিলন ঘটল। এইভাবে সংস্কৃত ভাষাকে বাহন ক'রে মিশ্র আর্যানার্য সভ্যতা হিন্দুসভ্যতা হ'য়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এবং 'হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয়, national বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্টরূপে ফুটে উঠতে প্রায় হাজার বছর লাগে।[১৫] অনেকে অবশ্য এ মতও প্রকাশ করেছেন যে, আর্যরা দলে দলে ভারতে আসেননি, তাঁদের

ধর্মমত, ভাষা, অনুষ্ঠানাদি ইরাণ প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতে সঞ্চারিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ "সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নাই।...আমাদের শাস্ত্রে...এমন কোন বাক্য নাই যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[১৬]

হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছে এক বিপুল সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এবং তার সংস্কৃতিতে আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিকদের বিভিন্ন সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গি মিশে গেছে। আর্য ও অনার্যের গ্রহীষ্ণুতা ভারতীয় ঐতিহ্যের এবং হিন্দু সভ্যতার একটি মুখ্য উপাদান। পণ্ডিতদের মতে অনার্যদের প্রভূত কাহিনী পুরাণ, মহাভারত, শাস্ত্র ও কাব্যে রূপ নিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজ করছে। "ভারতের সভ্যতায় দ্রাবিড়ের আহৃত উপাদান আর্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়।"[১৭] বলা হয়ে থাকে আর্যভাষা গ্রহণ ক'রে ভারতের আদি জাতি দ্রাবিড় ও আষ্ট্রিকরা আর্যদের সঙ্গে একদেহে লীন হ'য়ে ভারতের সৃজনশীল সমন্বয়ের ধারার জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে গ্রহীষ্ণু হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা শক, হূন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতিকে আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ভারতে এই হিন্দুসভ্যতার মূল শক্তি হ'ল তার ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন ঃ "ভারতে...ধর্ম জাতীয় জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন সঙ্গীতের প্রধান সুর।" ধর্মই হিন্দু জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। এ ধর্ম সঙ্কীর্ণতাকে বর্জন ক'রে হিন্দু সভ্যতাকে বিশ্বজনীন আবেদনে পূর্ণ ক'রে তুলেছে।

ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐক্য

সুভাষচন্দ্রও বলেছেন, "The most important cementing factor has been the Hindu religion."[১৮] ঐক্যবন্ধনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল হিন্দুধর্ম। বহুমত, বহুসাধনার মিলিত ফল হ'ল হিন্দু ধর্ম—এবং তা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়।... 'আমার সাধনমার্গই একমাত্র সাধন মার্গ'...এ ধারণার অবকাশ হিন্দুধর্মে নাই।[১৯] হিন্দু ধর্ম অবশ্য এক শাশ্বত সত্তাকে মানে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ঐশী সত্তা অঙ্গাঙ্গি যুক্ত। এই বিশ্বানুভূতি থেকেই সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও প্রেম উৎসারিত হয়। কোনও একখানিমাত্র গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের অনুমোদিত সত্য লভ্য নয়, তা অসংখ্য শাস্ত্রাদিতে ছড়িয়ে রয়েছে। হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালে নানামতের ও পথের জন্ম দিয়েছে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এর মধ্যে পড়ে। তন্ত্রের বিশিষ্ট অবদানও হিন্দুধর্মের

অঙ্গীভূত। হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্ম ও হিন্দুর বিশিষ্ট চিন্তাধারা মূলতঃ একই বস্তু। গ্রহীষ্ণু এই ধর্ম নানামতকে আত্মসাৎ ক'রে বহিরাগত বহু জাতি ও স্বদেশের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীকে একই সমাজের মধ্যে গ্রথিত করেছে। ইতিহাসে এই চলার পথে অবশ্য তাকে অনেক বিরোধ ও বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, কিন্তু তার মূলধারা অপরিবর্তিত রূপেই আজও প্রবাহিত। হিন্দু ধর্মের প্রধান আঙ্গিকের মধ্যে আছে তার বর্ণ ও আশ্রম। ঋকবেদের যুগে বর্ণবিভাগ বর্তমানের মতো এত তীক্ষ্ণ ছিল না। চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) মধ্যে সমাজের বিভাগ মুখ্যতঃ ছিল গুণকর্মভিত্তিক। চারি আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ছিল জীবনচর্চার বিভাগ , আজ আর এর উপর জোর দেওয়া হয় না। হিন্দু ধর্মের মূল বোধ থেকেই সুভাষচন্দ্র বর্তমানের জাতিভেদ (বর্ণভেদ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ ''জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না।''[২০] স্বামীজীও বলেছেন ঃ ''বর্ণ ছিল ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা বিকাশের প্রতিষ্ঠান...এবং হাজার বছর ধরে তাই চলছিল। সর্বশেষে রচিত শাস্ত্রাদিতেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে একত্রে আহারে বাধার কথা নাই, প্রাচীনতর শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহে নিষেধ ছিল না।...বর্তমানের বর্ণভেদ প্রকৃত নয়—বরং তা (বর্ণ) প্রগতির বাধা স্বরূপ।''[২১] ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Hindu Civilization-এ বলেছেন ঃ ''...বেদের যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়েরা শূদ্র প্রভৃতি নিম্নজাতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারতেন।...আশ্রম ধর্মে বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে একটি ছন্দোময় জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যেতে হত।''[২২] হিন্দু সভ্যতার বিরুদ্ধবাদীরা এই বর্ণভেদের দিক ধ'রে কটু সমালোচনায় মুখর হ'ন কিন্তু তাঁরা এর মূল বক্তব্য ও প্রাচীন মূল্যবান চিন্তার বিষয়কে উপেক্ষা করেন। বর্তমান সমাজকে সাম্যমূলক অতীত মূল্যবোধের গুরুত্ব অনুভব করতে হবে।

হিন্দু সভ্যতার বা ভারতীয় জাতির গ্রহীষ্ণুতা, সহনশীলতা, ধর্মবোধের মধ্য দিয়ে তার বিশ্বজনীন দৃষ্টি, তাকে এক মহাসমন্বয়ে উত্তীর্ণ করেছে—যার উপর ভিত্তি করে ভৌগোলিক ভারতবর্ষ রচনা করেছে মহা-ভারত, আহ্বান করেছে মহা-মানবকে আর এর সঙ্গে বাস্তববোধ মিশিয়ে ভারতে গড়ে তুলেছে এক মহান সাংস্কৃতিক ঐক্য—যা জাতিসত্তা সংগঠনের অন্যতম প্রধান বনিয়াদ।

ভারতবর্ষ কেবল মাত্র ভৌগোলিক নাম নয়—এর যে একটা উদ্দেশ্যমূলক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এ নামের উদ্গাতারা সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সারা ভারতভূমিকেই পুণ্যভূমি করে তুলেছেন হিন্দুশাস্ত্রকাররা। তাঁদের ঐতিহ্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সম্পদ যেমন পরবর্তীকালের মুসলিম সভ্যতা ও অন্যান্য সভ্যতার অবদান কালপ্রবাহে বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে গেছে। শ্রীবিনয় সরকার তাঁর The Pedagogy of the

Hindus বইতে আমাদের জানিয়েছেন যে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ তদানীন্তন প্রয়োজন ও ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির কথা বিবেচনা ক'রেই নানা প্রকার শাস্ত্র, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁরা জনশিক্ষার এক বিপুল সংগঠনের মধ্য দিয়ে একই প্রকার নৈতিকতা ও ধর্মবোধের সৃষ্টি ক'রে বিশাল ভারতীয় সমাজ গঠনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।[২৩] হিন্দুশাস্ত্রের নদীস্তোত্র আজও প্রতিদিনের পূজার জলশুদ্ধির আবাহন মন্ত্র হয়ে রয়েছে, যেমন ঃ

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

এই মন্ত্রে ভারতের গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী নদীসমূহের পূতসলিলকে আহ্বান করা হয়। ভারতের দূর প্রান্তের সহর গ্রাম গঞ্জে এই আবাহন মন্ত্র হিন্দুজনতার মধ্যে এক ঐক্যের সুর ধ্বনিত করে।[২৪]

ভারতের মহান ধর্মীয় নেতৃবর্গ তাঁদের প্রচারিত ধর্মমতকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টিত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর মঠগুলি স্থাপন করেছিলেন (১) কেদারবদ্রী (২) রামেশ্বর (৩) দ্বারকা ও (৪) জগন্নাথ পুরীতে। আরও হিন্দু তীর্থ হ'ল ঃ

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) পুরী, দ্বারাবতী (দ্বারকা), ইত্যাদি।

তেমনি শৈবতীর্থও ভারতবর্ষময় এবং সতীতীর্থ আসাম থেকে বেলুচিস্থান পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে বৌদ্ধগণ চৈত্যস্তূপ ও স্তম্ভ তৈরী করেছেন যার মধ্যে সাঁচী, অজন্তা, উদয়গিরি, সারনাথ, অমরাবতী, মথুরা, গয়া প্রভৃতির নাম করা যায়। জৈন ধর্মীয় নেতারাও সেইরূপ করেছেন। এইভাবে সমগ্র ভারতভূমি হয়ে উঠেছে তীর্থভূমি—ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষ মাত্র নয়। সুভাষচন্দ্র বলছেন ঃ "জাতি বৈচিত্র্য ভারতবর্ষে কখনও সমস্যা হয়ে ওঠেনি কারণ ইতিহাসে ভারতবর্ষ বিভিন্নজাতিকে আত্মসাৎ ক'রে তাদের এক সাধারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রবাহে নিয়ে এসেছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য সমন্বয়সূত্র হ'ল হিন্দুধর্ম। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই যান, একই প্রকার ধর্মীয় ধ্যান ধারণা, একই রকম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য লক্ষ্য করবেন। সকল হিন্দুই ভারতবর্ষকে দেখে পুণ্যভূমি হিসাবে। পুণ্যতোয়া নদীগুলির মতো, পবিত্র নগর সমূহ ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে রয়েছে। একজন ধর্মপ্রবণ হিন্দু হিসাবে আপনি যদি তীর্থদর্শন সম্পন্ন ক'রতে চান তা হ'লে সর্বদক্ষিণে অবস্থিত রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে উত্তর সীমান্তে তুষারমৌলি হিমালয়ের বুকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত পর্যটন করতে হবে। মহান ধর্মগুরুগণ যাঁরা ভারতবর্ষকে তাঁদের মতে আনতে

চেয়েছেন তাঁরা সারাভারত ভ্রমণ ক'রেছেন এবং এ'দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের চারপ্রান্তে চারটি আশ্রম স্থাপন করেন। সর্বত্র একই প্রকারের ধর্মগ্রন্থ পঠিত এবং অনুসৃত হয়। যেখানেই যান দেখবেন রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য দুটি কত জনপ্রিয়। মুসলিম আগমনের ফলে ক্রমশঃ একটি নূতন সমন্বয় গড়ে তোলা হ'ল। যদিও তাঁরা হিন্দুদের ধর্ম গ্রহণ করেননি, তাঁরা ভারতবর্ষেই বসতি স্থাপন করলেন এবং জনগণের সাধারণ সমাজ জীবনের, তাদের সুখদুঃখের শরিক হয়ে গেলেন।"[২৫]

ভারতের ইতিহাসের ধারাকে যাঁরা কিছুটা ঐতিহাসিক নিষ্ঠা নিয়ে দেখেছেন এমন বিদেশী পণ্ডিতগণও ভারতের মূলগত ঐক্যের কথা বলেছেন, যেমন V. A. Smith এর কথা বলা যায়। Smith লিখেছেনঃ "ভারতবর্ষে ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য আর রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব দিয়ে গঠিত ঐক্যের থেকে গভীরতর এক অন্তঃচারী ঐক্য যে বিদ্যমান, তাতে সন্দেহ নাই। সে ঐক্য রক্ত, বর্ণ, ভাষা, পোষাক, সামাজিক ব্যবহার আর গোষ্ঠীর সীমাহীন বৈচিত্র্য অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে।"[২৬]

ভারতের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের রথ কালজয়ী সমন্বয়ের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। নানা রাষ্ট্রনৈতিক ঝঞ্ঝায় তার গতি সাময়িক রুদ্ধ হলেও তার ঐতিহাসিক লক্ষ্যে সে পৌঁছবেই। স্বামীজী বলেছেনঃ 'আমার দেশমাতৃকা পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমাময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। স্বর্গ বা মর্তের কোন শক্তির সাধ্য নাই এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।"[২৭] সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো ভাষণে বলেছেন, "অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে, ভবিষ্যতেও থাকবে।" অন্যত্র বলেছেনঃ "...ভারতের একটা মিশন আছে,...ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।

"ভারতের এই mission এ যার বিশ্বাস আছে সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে।"[২৮] এই জীবন্ত ও জ্বলন্ত ধারণাই সুভাষ-জীবনের ঐতিহাসিক পাথেয় হয়ে তাঁকে ভারতপুরুষে উত্তীর্ণ করে তুলেছে। নিজেকে তিনি বলেছেন 'ভারত পথিক'; ভারতের অতীত থেকে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের পানে যাঁর অভিযাত্রা।

উদ্দেশ্য সমন্ধ ভারতীয় জাতি শুধু যে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক আর সামাজিক ঐক্য বন্ধনেই সঞ্জীবিত তাই নয়, ইতিহাসের পরতে পরতে তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যও সাধিত হয়েছে; ভারতের পুরো ইতিহাসে যার নজীরের অভাব নাই।

রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য

একটি প্রচারমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় বৃটিশ আগমনের পরই ভারতে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি ঘটেছিল কিন্তু ইতিহাসগতভাবে তা অসত্য। সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো ভাষণে বলেছেনঃ ''যাঁরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বৃটিশ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের মনের ধারণা বৃটিশ অতি সহজেই ভারতবর্ষ জয় করেছিল এবং তাদের বিজয়ের পরই ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি লাভ করে। এই দুই ধারণাই সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন।

''প্রথমত, একথা সত্য নয় যে বৃটিশ সহজে ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল। ভারতবর্ষকে অধীনে আনতে তাদের ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত, প্রায় একশত বৎসর সময় লাগে। দ্বিতীয়ত, বৃটিশের দ্বারাই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তথ্য হ'ল, ভারতবর্ষ প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে মহান অশোকের সময়ের ভারতবর্ষ বর্তমানের ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল।...

''অশোকের পরে ভারতবর্ষ তার জাতীয় জীবনের অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চ'লে এসেছে। অবনতির যুগের পর এসেছে উন্নতি ও জাতীয় আলোড়নের যুগ।...অশোকের হাজার বৎসর পরে গুপ্ত সম্রাটদের আমলে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির শীর্ষে আরোহণ করে। আরও নয়শত বৎসর পরে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ পুনরায় এক গৌরবময় যুগে উপনীত হয়। সেজন্য বৃটিশ শাসনাধীনেই আমরা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য লাভ করেছি—বৃটিশের এই ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত তা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।''[২৯]

অশোকের সিংহাসন লাভ ২৭৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। সেই যুগে তাঁর রাষ্ট্র প্রশাসনও এক উন্নত সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় রেখেছে। সুভাষচন্দ্র বলেছেনঃ ''মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে সরকারী প্রশাসন এক উচ্চপর্যায়ের দক্ষতায় পৌঁচেছিল। সামরিক সংগঠন ছিল সে যুগের পক্ষে ত্রুটিহীন। সরকারী শাসনযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীদের অধীনে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান পাটনা সহরের নিকটবর্তী রাজধানী পাটলীপুত্রের পৌর প্রশাসনও ছিল প্রশংসার্হ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমস্ত দেশ সর্বপ্রথম একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য লাভ করেছিল।''[৩০] এই যুগে বৌদ্ধধর্মেরও বিস্তার ঘটে। ভারত ইতিহাসে এযুগকে স্বর্ণযুগ ব'লে অভিহিত করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করেন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর সময়ে ভারতে কেবল যে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়েছিল তাই নয়, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিও ঘটেছিল।

কিছুকাল অবনতির সম্মুখীন হ'য়ে ভারতবর্ষ হর্ষবর্ধনের সময়ে (৬৪০ খৃষ্টাব্দে) আবার রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সংহত হয়।[৩১]

অতীত ভারতের এই রাষ্ট্রগুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল; তারা বিপুল সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের গ্রাম-ভিত্তিক স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করেনি। বস্তুতঃ আর্য সভ্যতার বহুপূর্ব থেকে মুসলমান রাজত্বের সময় পর্যন্তও গ্রামীণ জীবনের স্বাধীন সত্তা অব্যাহত ছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন সত্ত্বেও জনসাধারণ সব সময়েই বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেছেন।"[৩২] ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর Hindu Civilization পুস্তকে লিখেছেনঃ "সেই গ্রামগুলি স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক হিসাবে স্বীকৃত ছিল। গ্রামীণ সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য এই সব গ্রাম স্বরাজে একটি পূর্ণ প্রশাসন কাঠামো বিদ্যমান ছিল। উচ্চতম প্রশাসনের বা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনে, এর পরিবর্তন ঘটত না।"[৩৩] বর্তমান যুগে রাষ্ট্রতন্ত্র-গুলির সার্বিক ক্ষমতা প্রসারের স্বৈরীপ্রবণতার বাতাবরণে অতীত ভারতের অনুরূপ সামাজিক কাঠামোর ভাবনা কষ্টসাধ্য। শাসকরা ছিলেন বাস্তবিক গঠনতান্ত্রিক সম্রাট এবং সহরে পৌরপ্রশাসন, গ্রামীণ সমাজে 'জনপদ' ও পঞ্চায়েত পরিচালনাব্যবস্থা ছিল স্ব-শাসিত ও সুসংগঠিত।[৩৪] রাজা কোন প্রজার শাসক-রূপে নয়, দুষ্টের শাসকরূপে প্রতিভাত ছিলেন।[৩৫] রাজার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ব'লে কিছু নাই, প্রজার ইচ্ছাই হ'ল তাঁর ইচ্ছা—ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারগণ রাজার আদর্শকে এভাবেই সংগঠিত করতে চেয়েছেন।[৩৬] শাস্ত্র রাজাকে ত্যাগের আদর্শানুযায়ী চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে, বলেছে, রাজার জীবন হবে ত্যাগের জীবন, প্রজাপালনই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।... ত্যাগীরাজা হর্ষবর্ধনের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পৌরজনপদে আলোচিত হ'ত।[৩৭] রাজতন্ত্রের মধ্যে ও সমাজে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির প্রবাহে ছেদ পড়েনি। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সামাজিক গণতান্ত্রিক অধিকার স্বাধীনতার অন্য নাম। তিনি জন-গণের হাতে সব ক্ষমতার বনিয়াদ রচনা করতে চেয়েছেন।

নূতন রাজা পেতেন বিজিত রাজারই ব্যক্তিগত সম্পদ, প্রজার সম্পদ নয়।[৩৮] অতীতভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রগুলি ভারতের প্রবহমান সমাজ সংগঠন এবং পৌর জনপদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করত এবং তারা রাষ্ট্রসংহতিতে জনগণের ঐচ্ছিক অবদান আকর্ষণ ক'রে, দীর্ঘস্থায়ী প্রশাসন পরিকল্পনায় বিশিষ্ট সাংগঠনিক ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে।

রাজতন্ত্রের ইতিহাস শুরু খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে, চন্দ্রগুপ্ত যখন তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে এবং তার বহু পূর্ব থেকে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয়

শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটছিল অনেক রিপাবলিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ "এই কালে এবং তার পরেও ভারতবর্ষে অনেক রিপাবলিক বা প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। মালব, ক্ষুদ্রক, লিচ্ছবি এবং অন্যান্য উপজাতিগণের সংবিধান ছিল প্রজাতান্ত্রিক।"[৩৯] অন্যত্র বলেছেনঃ ভারতের অতীত ইতিহাসে অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় মেলে। শ্রী কে. পি জয়সওয়াল, তাঁর 'Hindu Polity' নামক বিস্ময়কর পুস্তকে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন ভারতের একাশিটি প্রজাতন্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন।"[৪০] তিনি (সুভাষচন্দ্র) আরও লিখেছেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল।[৪১] এই যুগে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এক উন্নত সমাজব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। সভা' ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান আর 'সমিতি' হ'ল সমগ্র সমাজের প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধ, জাতীয় বিপর্যয়, এমন-কি রাজঅভিষেকের সময়েও এই সমিতির বৈঠক বসত। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সমিতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রিপাবলিক রাষ্ট্র অভিহিত হ'ত 'সঙ্ঘ' নামে। সমস্ত বর্ণের লোকই এর সদস্য থাকতেন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা গণসভায় অনুষ্ঠিত হ'ত। কৌটিল্যও এইরূপ রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। এই রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিনিধিমূলক গণসংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিধান পরিচালিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীর সংসদে প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজারের মতো (৭৭০৭)।[৪২] ব্যালট ভোট এবং অধিক সংখ্যকের মতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল।[৪৩] প্রতিটি সংসার ছিল সঙ্ঘরাষ্ট্রসংগঠনের ভিত্তি এবং প্রতিটি মানুষ ছিল সমান অধিকারের অধিকারী।[৪৪] সঙ্ঘরাষ্ট্রগুলিতে নাগরিক সৈন্যবাহিনীর (Peoples' Army) নৈতিক মান ছিল অনেক উন্নত।[৪৫] সুভাষচন্দ্র যে সমস্ত রিপাবলিকের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলি হাজার বৎসর বা তার বেশী সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সব সঙ্ঘগুলি অনেকসময় একত্রিত হয়ে সঙ্ঘসংহতি গড়ে তুলেছে। এদের আর্থিক ব্যবস্থাও ছিল শক্তিশালী। এই বিপুল ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব কথা ইতিহাসের জানা নাই এবং সে সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে রাষ্ট্রিক ইচ্ছার পীড়াদায়ক অভাব লক্ষিত হচ্ছে। যাই হ'ক এরূপ শক্তিশালী অতীত গণতান্ত্রিক সংগঠনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রসংহতির ভাবনায় অতীত ভারতের আশ্চর্যজনক সাংগঠনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় উদ্দেশ্যমূলক প্রচার—ভারতের রাষ্ট্রসংহতি বৃটিশের অবদান—একথা কত যুক্তিহীন ও ভ্রান্ত। দবান্দিক

জড়বাদীরাও বৃটিশের অনুরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। একটি উপনিবেশ-বাদী রাষ্ট্র বিজিত রাজ্যের ইতিহাসের বিকৃত আলোচনা তুলবে সেটা ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু তথাকথিত উপনিবেশবাদ বিরোধীরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের নামে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে যে ঔপনিবেশিক সিদ্ধান্তে আসার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা ক'রবে সেটাই ভাববার ব্যাপার। এই উন্নাসিক মতের অনুগামীরা ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ ক'রে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রদর্শনেও খাটো ক'রে দেখাবার প্রচেষ্টা করেন এবং এর অনুশীলনের মধ্যে ভারতীয় ভাবাদর্শবর্জিত বহুজাতিতত্ত্বের অবতারণা ক'রে ভারতের জাতীয়তার বিরুদ্ধে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শন দাঁড় করান। এ সম্পর্কে এই প্রবন্ধের অন্যত্র সংক্ষেপে কিছু আলোচিত হবে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক 'সঙ্ঘ' ও 'সংঘসংহতি' বিদ্যমান ছিল; খৃষ্টপূর্ব প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বে যাদের উৎপত্তির পরিচয় মেলে এবং এদের কয়েকটি অন্ততঃ হাজার থেকে তেরশ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। এই সঙ্ঘগুলির আশ্চর্যজনক প্রজাতান্ত্রিক সংগঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পরবর্তীকালের রাজতন্ত্রগুলিও শিক্ষাগ্রহণ করেছে। তাই তদানীন্তন কালের বিশ্বে অদ্বিতীয় সামরিক সংগঠনে বলীয়ান মৌর্যরাজারাও ভারতবর্ষের গ্রামীণ প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ করেন নি। উপরন্তু গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্যে মহান ভারতের অতীত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্কের মধ্যে শাসক-শাসিতের সর্বনাশা ভেদ সৃষ্ট হ'তে পারেনি। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এই ভারসাম্য বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতেও লক্ষ্য করা যায় না। সংগঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বিশাল গণতান্ত্রিক গ্রামপ্রধান ভারতের কালাতিক্রমী অবস্থিতি যুগ যুগ ধ'রে ভারতবর্ষে বিশিষ্ট জাতীয়তার রাষ্ট্রিক উপাদানের অনন্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

শুধুমাত্র হিন্দু যুগে নয়, মুসলিম প্রশাসনের যুগেও ভারতে যে রাষ্ট্রসংহতি সাধিত হয়েছিল ভারতসম্রাট আকবরের প্রশাসন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম সভ্যতাও ভারতের পুরাকালীন সভ্যতার ঐতিহ্যের স্রোতে মিশে ভারতবর্ষে কয়েকশত বর্ষ ধ'রে একই রাষ্ট্রযন্ত্রের পতাকাতলে সুখদুঃখ ও উত্থানপতনের সমান শরিক হয়ে, ভারতের মহাসমাজের অঙ্গ হয়ে গেছে। ভারতের জাতীয় সত্তায় তার নূতন অবদানের অনুধাবন তাই অপরিহার্য।

মুসলিম সভ্যতা, ধর্ম ও সমন্বয়

সুভাষচন্দ্র বলেছেনঃ "ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ আবার উন্নতি ও প্রগতির শীর্ষে পৌঁচেছিল। এঁদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আকবর যিনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যস্থাপনই আকবরের একমাত্র অবদান নয় সম্ভবতঃ তাঁর অধিকতর মূল্যবান কীর্তি, নূতন ও পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য নূতন সাংস্কৃতিক সমন্বয় রচনা করা এবং নূতন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি করা।"[৪৬]

আকবর ধর্মের ক্ষেত্রেও এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে নূতন ধর্মসমন্বয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ঃ "আকবর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও এক সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। সর্বদর্শন সার সংগ্রহের ভিত্তিতে এক নূতন ধর্ম উদ্ভাবন করে তার নাম দিলেন 'দীন ইলাহী'। তাঁর জীবদ্দশায় এই ধর্মের অনেক সমর্থক ছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এর সমর্থক আর কেউ রইলেন না।"[৪৭]

ভারতের মুসলিম আমলের প্রথম যুগে মুসলিম যোদ্ধা ও নৃপতিরা ভারতের সম্পদ আহরণ ক'রে বিদেশে পাড়ি দিতেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরা ভারতবর্ষকে তাঁদের বাসভূমি করলেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন ঃ "তাঁরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেননি কিন্তু ভারতেই তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন এবং জনগণের সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে পড়লেন। পারস্পরিকতার মাধ্যমে এক নূতন শিল্পকলা ও এক নূতন সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠল যা পুরাতন থেকে ভিন্ন হ'লেও সুস্পষ্টভাবে ভারতীয়।

"স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে, দুই সাংস্কৃতিক ধারার সুখপ্রদ সমন্বয়ে নূতন জিনিসের উদ্ভব হ'ল। তদুপরি মুসলমান শাসকবর্গ জনগণের দৈনন্দিন জীবনে এবং অতীতের গ্রামভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করেন নি।"[৪৮]

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আকবরের সমন্বয়ী চিন্তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সংস্কৃতি ও ধর্মে এমন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এক ভিন্নধর্মের পরাক্রমশালী নৃপতির পক্ষে ইতিহাসে এক অতি বিরল ঘটনা। ভারতের মহাসমন্বয়ের ইতিহাসে তাঁর প্রচেষ্টা যদিও ততটা ফলবতী হয়ে ওঠেনি তবুও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আজও তা নূতন দিগদর্শনের ইঙ্গিত বহন করে।

আকবর লিখতে পড়তে পারতেন না কিন্তু সমস্ত ধর্মের মূলবিষয় সম্পর্কে জানতে তিনি গভীর আগ্রহ বোধ করতেন এবং বুঝতেন ভারতবর্ষে এক সর্ব-গ্রাহ্য ধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে সংহতির ভাব এনে দিতে হবে। ফতেপুর সিক্রিতে ধর্মালোচনার জন্য সভাগৃহ নির্মিত হয়েছিল। আকবর ধর্মালোচনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। সেখানে সুন্নী উলেমা, সুফী শেইখ, হিন্দু পণ্ডিত, পারসী, জোরাষ্ট্রীয়, জৈন ও গোয়ার ক্যাথলিক পুরোহিত সকলে

উপস্থিত থাকতেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে এক সনদ ঘোষণার পর আকবরের ব্যক্তিগত ধর্মানুসন্ধান সুরু হয়। এই সনদে বলা হয় আকবর উলেমাগণের দ্বারা ধর্মনৈতিক বিতণ্ডার বিচারক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন, তিনি 'দীন ইলাহী'র প্রবক্তা। এই ধর্মমতে হিন্দুদের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধক অনেক বিষয় ছিল। আকবর অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদের আদেশ দেন। বদাউনী বলেছেন যে আকবর গাভীহত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং কতকগুলি বিশেষ দিনে মাংসভক্ষণ করতেন না। তিনি অমুসলিম উৎসবাদি পালন করতেন।[৪৯]

"এই ধর্ম অবশ্য খুব অল্প সংখ্যক সভাসদের মধ্যে সীমিত ছিল এবং তা রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের দ্বারা সারা সাম্রাজ্যে প্রচার করা হয়নি।"[৫০] আকবর বিশেষ ক'রে শুক্রবার সারারাত ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করতেন। হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে শুনতেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির উপাখ্যান, সুফী সাধকদের ডেকে শুনতেন সুফীধর্মের কথা, পাদরীদের থেকে জানতেন যিশুর মত। রাজপুত্র মুরাদকে তিনি খৃষ্টধর্মে পাঠ নিতে বলেন এবং আবুল ফজলকে যিশুর বাণীসমূহের (gospel) অনুবাদের দায়িত্ব দেন। জোরাষ্ট্রীয় ধর্মের উপাসকদের কাছ থেকে তিনি অগ্নি উপাসনা গ্রহণ করেন। আর রাতের গহনে তিনি হিন্দু যোগীদের কাছে সত্য ও যোগাভ্যাস সম্বন্ধে নানা জ্ঞান আহরণ করতেন।[৫১] বদাউনী বলছেন যে সম্রাট আদেশ দিয়েছিলেন দিনে চারবার সূর্যপূজা করা হবে, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। সূর্যের এক হাজার এক সংস্কৃত নাম সংগৃহীত হয়েছিল এবং সূর্যমুখিন হয়ে প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে তিনি তা পাঠ করতেন।[৫২] 'দীন ইলাহী'র পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই ধর্মে মূলতঃ সুফী ধর্মমতের উপর জোরাষ্ট্রীয় ধর্মের অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছিল। এই ধর্ম একেশ্বরবাদ স্বীকার করে এবং সিয়া ধর্মমতের ধর্মবিচারকের প্রভাবকে গ্রহণ করে। অবশ্য এতে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা মুসলিম ধর্মের প্রতিপাদ্যই অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়েছিল।[৫৩]

আকব্বরের পরে মোগল সম্রাট বংশে দারা শিকোহ হিন্দুদর্শন ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্বাদি পাঠ করতেন। তিনি অবশ্য ছিলেন সুফী (কাদিরীয়) মতের অনুগামী। তিনি হিন্দু ও মুসলিম সর্বেশ্বরবাদী (বিশ্বপ্রকৃতিই ঈশ্বর এই তত্ত্বে বিশ্বাসী) মতের সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। অবশ্য এই মত কার্যে পরিণত হবার সুযোগলাভ করেনি। তিনি বাহান্নখানি উপনিষদ পারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

এমনি ভাবে নানা টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতীয় সাধু সন্তদের প্রভাব ইসলামের উপর এবং ইসলাম ধর্মের সাধকদের, বিশেষ করে সুফী সম্প্রদায়ের

সাধকদের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর লক্ষণীয়ভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইসলাম, সহরকেন্দ্রিক সভ্যতাসৃষ্টিতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। গ্রামীণ সভ্যতায় ইসলামীয় মতের তীব্রতা ততটা ছিল না, সেজন্য গ্রামভারতে হিন্দু-মুসলিম চিন্তাধারা ও আচার-আচরণের নানা বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সামান্য কিছু তথ্য আমাদের আলোচনায় সাহায্য করতে পারে।

দিল্লীর উত্তরে কর্নালে মুসলমান কৃষকেরা গ্রাম্যদেবীর পূজা করতেন। আলোয়ার ভরতপুরের মেয়ো সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ হিন্দুনাম গ্রহণ ক'রে নামের শেষে খাঁ যোগ করতেন এবং স্বগোত্রে বিবাহাদি দিতেন না। রতলমের উত্তরে জাওরা দেশীয় রাজ্যে মুসলিম কৃষকগণ বিবাহে হিন্দু অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। সিন্ধুর বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্নী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অনেক সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ হিন্দু ফকিরের মতো জীবনযাপন করতেন এবং দেবল দেবীর পূজা করতেন। উত্তর প্রদেশ, মধ্য বিহার, গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক মুসলমান সম্প্রদায় মৃত বা জীবিত সাধুদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। পূর্ণিয়া জেলায় অনেক মুসলিম সংসারে কালী আর আল্লার নামে পূজা অর্চনা করা হ'ত। কিষাণগঞ্জের বাঙালী মুসলমানগণ বিষহরির পূজা করতেন। চট্টগ্রামের পীরবদরকে পূজা না দিয়ে কোন হিন্দু বা মুসলমান নাবিক সমুদ্রযাত্রায় বের হতেন না। গুজরাতে খোজা ও মাহাদাবী সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের ধ্যান-ধারণা হিন্দুর থেকে ভিন্ন নয়। হোসেনী ব্রাহ্মণেরা (অথর্ববেদী) অনেকে মুসলিম মত গ্রহণ করেছেন যা হিন্দুধর্মের বিরোধী নয়। মধ্যপ্রদেশ, বেরার, থানা, আমেদনগর, বিজাপুর অঞ্চলের গ্রামবাসী মুসলমানদের আচার আচরণ, অনুষ্ঠান শতকরা পঁচাত্তর ভাগ স্থানীয়। দক্ষিণ ভারতের মুসলিম প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এঁদের অনেকে এসেছেন আরবদেশ থেকে। তবুও সমাজপ্রথা এবং উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি হিন্দুদের মতোই হয়ে গিয়েছে।[৫৪] বাংলার গ্রামে গঞ্জে মুসলমান পীরের পূজার সঙ্গে কে না পরিচিত!

রাজস্থানে সুরঙ্গগড়ের কাছে একটি হিন্দুমন্দিরে পুরুষ পরম্পরানুক্রমে মুসলিম পুরোহিত নিযুক্ত ছিলেন। মন্দিরটি হ'ল রাজপুত সাধু খোগাজীর মন্দির।[৫৫]

এমনি ক'রে শত শত বর্ষ ধ'রে ভারতের হিন্দু মুসলিম অধিবাসীরা নানা সামাজিক আচার-আচরণের বৈচিত্র্যের মধ্যে পাশাপাশি একই জাতির অঙ্গ হিসাবে বসবাস করেছেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম ধর্মান্তরের ইতিহাসও সঠিক লিপিবদ্ধ হয়নি।

বলপ্রয়োগের ঘটনা অস্বীকৃত নয়, কিন্তু অনেকেই নানা কারণে এমন-কি সমাজগত কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেনাবাহিনীর কার্যের এবং রাজকার্যের সুবিধার জন্য অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। আবার মুসলিম ধর্মগুরুদের প্রচারের ফলেও অনেকে এই ধর্মে অনুপ্রাণিত হন। এম. মুজিব তাঁর The Indian Muslims নামক পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেছেন যে ধর্মান্তরকরণের মুখ্য কারণ ছিল অতীন্দ্রিয়বাদীরা এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেই তা ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন ঃ "(বাংলায়) মুসলমান শাসনের সময়ে সাম্যবাদী বৌদ্ধসমাজ দোটানার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিকাংশ বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুদয় পছন্দ না করিয়া এবং ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট বৌদ্ধ হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিল।"[১]

কবীরের মতো ধর্মগুরুগণ দুই সম্প্রদায়ের কাছেই পূজ্য হয়েছেন। হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবও কম নয়।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছেন বহু শতাব্দী ধ'রে। ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মমতগুলি বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছে কিন্তু সেইসব ধর্মমতাবলম্বীগণ অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তাঁরা তাঁদের ধর্মমত নিয়েই মহান ভারতীয় মহাসমাজের স্রষ্টা। ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতীয় ভাবনায় ভিন্নতাবোধ স্বার্থান্বেষীর সৃষ্টি এবং বর্তমানের নীচ রাজনীতির উপজীবিকা। ধর্মের মূল বিষয়ে অর্থাৎ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মিক উন্নতি, সৎজীবন যাপন ও সৎকার্য সম্পাদনে ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ নাই এবং এই ঔদার্যই ভারতমনীষায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যুগযুগ ধ'রে পাশাপাশি বসবাসের মধ্য দিয়ে নূতন সমন্বয় গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। স্বামীজী বলেছেন ঃ "এশিয়ায়... ধর্মই ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন।... আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে যেগুলি সম্পর্কে সকল সম্প্রদায়ই একমত।...ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ সম্বন্ধে সমুদয় বাধা ধর্মের সমন্বয়ী শক্তির নিকট তিরোহিত হয়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই ; ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র ; আর ইহাও জানি—আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে পারি।"[২৭]

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে অনেক মুসলমান অংশগ্রহণ করেছেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলনে ও পূর্বরণাঙ্গনে

আজাদ হিন্দ ফৌজের জীবনযাত্রা ও ভাবের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ নেতাজীর নেতৃত্বে জাতীয় ভাবনার মহান ঐক্যে এক মহাভারত রচনা করেছিলেন।

ধর্মবিশ্বাস ও সাধনা মানুষের স্বাধীন আচরণের বিষয়। ধর্মের পার্থক্য, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক সত্তার উপরে জাতিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তি হ'তে পারে না। সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "ভারতবর্ষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিকভাবে অবিভাজ্য একটি দেশ।...ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানগণ এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁদেরকে আলাদা করা অসম্ভব।"[৫৮] অন্যত্র বলেছেন: "ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বৃটিশের কৃত্রিম সৃষ্টি...। বৃটিশ রাজশক্তি নির্মূল হ'লে এ সমস্যা অন্তর্হিত হবে।"[৫৯] সেজন্য সুভাষচন্দ্র ভারত বিভাগের ঘোর বিরোধী এবং এ বিষয়ে পূর্বরণাঙ্গন থেকে ভারতের নেতৃবৃন্দের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, "আমার ঐশী মাতৃভূমিকে খণ্ডিত কোরো না...।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসাধনার সমন্বয়ের আদর্শে ও স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র আরও বলেছেন: "স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন।"[৬০] অখণ্ড সাম্য-সমন্বয় প্রতিষ্ঠাই সুভাষ-জীবনাদর্শের লক্ষ্য।

জাতিসত্তার সংগঠনে এবং বিভিন্ন উপাদানগুলির বিষয়ে, বর্তমান মতামত-গুলির দৃষ্টিভঙ্গিও বিচার্য বিষয় এবং তা ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

জাতীয়তার তত্ত্বের নিরিখে

জাতি-সত্তার উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তার তত্ত্বের জন্ম। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগে জাতীয়তার তত্ত্বের সংহত বিকাশের সুযোগ হয়নি। জাতি-রাষ্ট্রের সূতিকাগার বলা হয় ইউরোপকে, আর ফরাসী বিপ্লবের সময়কে চিহ্নিত করা হয় তার জন্মকাল রূপে। এ মতকেও নানা আলোচনা ও মতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

বিশিষ্ট ইংরেজ অধ্যাপক Elie Kedourie বলছেন: "জাতীয়তার তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে আবিষ্কৃত...এই তত্ত্বের বক্তব্য হল: 'মানব জাতি প্রাকৃতিকভাবেই জাতিতে বিভক্ত আর জাতির আছে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা নিরূপণ করা চলে এবং স্বয়ংশাসিত জাতীয় সরকারই আইনগত সরকার'।"[৬১]

অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পূর্ব থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে

প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে গবেষণার জোয়ার বইছিল। এই দর্শনের মতে বিশ্ব-জগতের নিয়ন্তা হ'ল অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম—কোথাও এর হেরফের হ'বার উপায় নাই। মানুষ যুক্তি বিচার দিয়ে তা অনুভব ক'রে সমাজকে সেই নিয়মমাফিক গড়ে তুলতে পারলে আরামে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্বপ্রযোজ্য হ'লেও মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবে না এমন নয়...তবে ঐক্যের উপাদানগুলিই বেশী প্রয়োজনীয়। এই মত অনুসারেই দেশের শাসক প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবেন কারণ দেশের মহানতাই শাসকের গৌরব।[৬২] ফরাসী বিপ্লবের অর্থ দাঁড়ালো রাষ্ট্রের প্রশাসন কঠোমো জনগণের স্বীকৃতি না পেলে তা বদলে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা জনগণের রয়েছে। দাবী সনদের (Declarations of the Rights of Man and the Citizen) বক্তব্যে রয়েছে—জাতিব মধ্যেই সার্বভৌমত্বের নীতি নিহিত এবং জাতির প্রকাশ্য সমর্থন না পেলে কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব করার অধিকার নাই।

জাতীয়তার বিকাশের জন্য এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক মানসিকতার প্রয়োজন ছিল। জাতি-রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনে জাতীয় জনতার অধিকার এবং সে বিষয়ে বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল এবং ফরাসী বিপ্লব তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

এখন জাতি বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার। ইউরোপে জাতি বলতে বোঝাত গৃহসংসার থেকে বড় কিন্তু রাষ্ট্র থেকে ছোট কোন সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীকে কিংবা বিদেশী নাগরিক সম্প্রদায়কে। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কয়েকটি 'নেশনে' ভাগ করা হ'ত। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ চারটি নেশন ছিল। এই 'নেশন' বিভাগ ছিল স্থানীয় বিভাগ, বর্তমান জাতিবিভাগের ভৌগোলিক অর্থে নয়। বৃটিশ দার্শনিক Hume-এর (১৭১১-৭৬) ভাবনায় নেশন হ'চ্ছে এক জনগোষ্ঠী যেখানে মানুষ পরস্পর আদানপ্রদানে ভাব-বিনিময়ে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। Diderot ও D' Alembert বিশ্বকোষে বলছেন যে 'নেশন' হচ্ছে এক জনগোষ্ঠী যাঁরা একটি দেশের বিশিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বসবাস করেন এবং সেখানকার সরকারকে মেনে চলেন। এমনি করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতির অর্থ ক্রমশঃ বিকাশলাভ ক'রছিল এবং তার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলছিল। নেশন বলতে ফরাসী দার্শনিক Montesquieu'র (১৬৮৯-১৭৫৫) সময়ে Lords আর Bishopsদের বোঝাত। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এই সব ব্যাখ্যার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল এবং জাতীয় সরকার ও জাতীয়তার তত্ত্বের বিকাশ দ্রুততালে এগিয়ে চললো। তবে জাতিতত্ত্বসংগঠনের ইতিহাসে শুধু ফরাসী বিপ্লবের নয়— এতে চিন্তারাজ্যেরও বিপ্লবী অবদান রয়েছে।

স্বাধীনতা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার কিন্তু তা কি উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন? এর তত্ত্বগত প্রমাণ তখনও দুর্লভ। Kantএর (১৭২৪-১৮০৪) দর্শন এর মীমাংসার পথ দেখিয়ে দিল। জ্ঞান থেকে নৈতিকতাকে আলাদা ক'রে ফেলতে হবে...তা না হ'লে নৈতিকতার স্বাধীনতা থাকে না। Kant তাঁর Cirtique of Practical Reason (১৭৮৮)-এ বলেছেন যে ভিত্তিগত অর্থে এই স্বতন্ত্রতাই সঠিক স্বাধীনতা। নৈতিকতা প্রাকৃতিক জগতের বস্তু নয়—মানুষের অন্তরের বস্তু। এ বস্তু ফলাফলের ধার ধারে না, পুরস্কারের প্রত্যাশাও তার নাই। মানুষের অন্তরের নির্দেশ থেকে এই স্বাধীন ইচ্ছার জন্ম। Kant এমনি করে মানুষকে তার নিয়ন্তা করে তুললেন—ভাগ্য বা প্রাকৃতিক নিয়মকে নয়। "দর্শনের ইতিহাসে Kant-এর মতের ব্যাপ্তি ও প্রভাবের গভীরতা অতুলনীয়। পরবর্তী একশো বছরের দর্শনের ইতিহাস Kant-এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল।"[৬৩] কবি Heine বলেছেন, বিপ্লবী হিসাবে দার্শনিক Kant, ফরাসী বিপ্লবী Robespierre'র প্রভাবকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। "কারণ Kant-এর মতবাদ ব্যক্তিকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করল—ব্যক্তিই হ'ল তার বিচারক, তার নিয়ন্তা।"[৬৪] অন্তরের স্বাধীন নির্দেশ মহত্তর কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় মানুষকে। এই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন কল্পনা থেকেই ঈশ্বরের কল্পনা। এই কল্পনা সে করে তার নৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য। Kant মনে করতেন প্রতিটি রাষ্ট্রের গঠন প্রজাতান্ত্রিক হওয়া উচিত। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে মানব-ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়রূপে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাল মানুষের অর্থ হ'ল স্বাধীন মানুষ—তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন... এর থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তত্ত্ব গতিশীল হ'ল। জাতীয়তাবাদ বস্তুতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। মানুষের স্বাধিকারের নৈতিকমূল্যের বিকাশ ঘটে তার সমাজের পরিবেশের মধ্যে।[৬৫] ফরাসী-সুইস চিন্তাবিদ Rousseau-র (১৭১২-৭৮) রাষ্ট্রিক মতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে —তাঁর মতে ব্যক্তি-ইচ্ছা, সমষ্টি ইচ্ছার পরিপূরক হ'তে হবে—না হলে ব্যক্তি বা সরকার কখনো সুখ অর্জন করতে পারে না। Kant-এর মতে বৈচিত্র্য থাকবেই যার জন্য একটি মাত্র বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠিত হচ্ছে না—জগৎপ্রকৃতি ও তার গতি সে পথে নয়। তবে মানুষের চিন্তার গতি সামঞ্জস্য বিধানের পথে এগিয়ে চলেছে —ভাষা ও ধর্মের বাধা সত্ত্বেও। পৃথিবী হবে অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমাহার। আর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাম্য-সামঞ্জস্যের ধারা এগিয়ে চলবে।[৬৬]

এর উপর J. G. Herder (১৭৪৪-১৮০৩) বললেন অতীতের অর্জিত প্রমূল্যগুলিরও স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।...আজকের অর্জিত মূল্যই শ্রেষ্ঠ আর অতীতের মূল্যগুলি তাদের পথ তৈরী করেছে, তা নয়। আজকের মূল্যগুলিকে

বড় ক'রে দেখাবার প্রয়াসে অতীত মূল্যগুলিকে ছোট করা ঠিক নয়। অতীত মূল্যের পূর্ণতা রয়েছে আর ঈশ্বরের সব সৃষ্টির সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর আবহাওয়ায় বৈচিত্র্য আছে ছড়িয়ে এবং তা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার অঙ্গ।[৬৭]

Herder ছিলেন তদানীন্তন জার্মান জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী প্রবক্তা। তাঁর মতে প্রতিটি জাতিকেই বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে তার বিশিষ্ট অবদান রাখতে হবে।[৬৮] কোন জাতির উপর জোর করে বিদেশী জ্ঞানের ধারা চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়।[৬৯]

জাতীয়তা সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদ Friedrich Schleiermacher (১৭৬৮-১৮৩৪) -এর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। বলছেন: "ঈশ্বর প্রতিটি জাতিকে পৃথিবীতে তার বিশিষ্ট কাজে নিয়োজিত করেছেন। সেজন্য তাকে বিশিষ্ট চেতনামণ্ডিত করেছেন যাতে সে তার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে নিজেকে গৌরবময় ক'রে তুলতে পারে।"[৭০] Herder যুক্তি দিয়েছেন যে অনেকগুলি জাতি মিলিয়ে যে রাষ্ট্র সেখানে বৈচিত্র্যের নিয়মে বিরুদ্ধতার ফলে অন্যায় ঘটে।... বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি তাদের বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলতে পারে, যেমন হয়েছিল অত্যাচারী অটোমান ও গ্র্যান্ড-মোগল সাম্রাজ্যে, যেখানে অনেক জাতিকে রাষ্ট্রের বাঁধনে বন্ধ করা হ'য়েছিল; কিন্তু চীন রাজ্য, ব্রাহ্মণদের এবং জুদের রাজ্য ছিল...কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। সেগুলির বিনাশ হলেও জাতি বেঁচে থাকে কারণ তা বিভিন্ন জাতির মিশ্রণকে অতিক্রম করেছে।[৭১] জাতীয়তা সম্পর্কে পণ্ডিত Hans Kohn বলেছেন যে চিন্তাজগতে Rousseau, Herder আর রাষ্ট্রনৈতিক জগতে ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লব থেকে জাতীয়তাবাদের যুগের সূচনা...যদিও অন্যান্য উপাদানও এ যুগ-সংগঠনে সহায়ক ছিল।...বিশ্বের ইতিহাস,... নানা ঘটনা ও কার্য-কারণের জটিল গ্রন্থনা, কত ব্যক্তিত্বের অবদান, দৈবঘটনা, কত ধরনের গতি-প্রকৃতির প্রভাবে রচিত হয়ে চ'লেছে। জাতীয়তা এ সকল উপাদানের অন্যতম। কোন ইতিহাসই মানুষের জীবনের পূর্ণতার কাহিনী তুলে ধরতে পারে না। জাতীয়তার চরিত্র জানতে হ'লে একটি জাতির ইতিহাস জানলে চলবে না... পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার ক'রেই তবে জাতীয়তার সাধারণ উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে।[৭২]

পুরাকালে বর্তমান জাতীয়তার উপাদান-বিশিষ্ট রাষ্ট্র ছিল না তা নয়। অধ্যাপক M. T. Walek-Czernecki'র মতে গ্রীক ও রোমানগণ প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ ঘটাতে পারেননি বরং বেবিলনীয়গণ, মিশরীয় ও প্রাচ্যের অধিবাসীরা জাতীয়তার পূর্ণবিকাশ ঘটিয়েছিলেন। "অন্যান্য সব ঐতিহাসিক আন্দোলনের মতই জাতীয়তার শিকড় প্রসারিত হয়ে আছে অতীতের

গভীরে।"[৭৩] "জাতীয়তার যুগের বহু পূর্বেই জাতীয়তার ভাবধারা ও প্রকৃতি সংগঠিত হয়েছে।"[৭৪] তারপর একদিন তা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন কালে। অবশ্য পারস্পরিক অবদানের প্রভাব স্বীকার করতেই হবে।

জাতীয়তার বিকাশের পথে সাধারণের সমষ্টিগত প্রভাব নীরবে কাজ ক'রে চলে। যে যুগে যে রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছে —সেখানেই সে জাতি ইতিহাসে তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের স্বাধীন সমাজধারা যুগ যুগ ধরে জাতীয় ভাবনার আধার। তার কালাতিক্রমী প্রভাব ভারতীয় চিন্তাধারার স্বকীয়তার মধ্যে গ্রথিত হয়ে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে লাগলো, এবং সাধারণ মানুষের সামাজিক প্রভাব বাড়লো তখন জাতীয়তার উপাদান-গুলি তার রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্তনে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল যেমন ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে। জাতির আর্থিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে জাতিরাষ্ট্রের সংগঠনে।[৭৫] বলা হয় জাতিরাষ্ট্রের ভাবনায় অর্থনৈতিক দিকটি একটি আধুনিক সংযোজন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই তা ঘটেছে।[৭৬] ভারতে জাতীয় বিপ্লবের পুরোধা ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্রও অর্থ-নৈতিক বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেছেন, "আমাদের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মুখ্যতঃ এক অর্থনৈতিক প্রয়োজন।"[৭৭]

এখন জাতীয়তার তত্ত্বের নিরিখে উপাদানগুলির গুরুত্ব বিচার্য বিষয় হয়ে পড়ে। নেশনের আভিধানিক সংজ্ঞা হ'ল, জাতি হচ্ছে একটি বিশিষ্ট জনসমষ্টি যাঁরা বংশগত, ভাষাগত, বা ইতিহাসগত দিক থেকে এক এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একরাষ্ট্রের বন্ধনে একতাবদ্ধ (Short Oxford English Dictionary, Vol. II, 3rd Edition, p. 1311)।

Hans Kohn বলেছেন: "কোন সামাজিক জনগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈষয়িক বন্ধন থেকে হয় জাতির জন্ম।...এই বন্ধনগুলির ভিতর সবচেয়ে প্রচলিত হ'ল, সাধারণ বংশধারা, ভাষা, ভৌগোলিক সীমা, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, দেশাচার, ঐতিহ্য এবং ধর্ম। সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই দেখা যাবে কোনটিই জাতির অস্তিত্ব বা তার সংজ্ঞার পক্ষে অপরিহার্য নয়।"[৭৮]

সাধারণ বংশধারা বা রক্তের বিশুদ্ধতার কাহিনী আজ এক কুসংস্কার। পৃথিবীতে কত জাতির মিশ্রণের ফলশ্রুতি হ'ল বর্তমান মানবগোষ্ঠী এবং এখনও এই মিশ্রণ হয়ে চলেছে।

Herder এবং দার্শনিক Fichte জাতি গঠনে ভাষার উপর গুরুত্ব

দেন কিন্তু সুইস জাতির ভাষা হ'ল চারটি। এ বিষয়ে প্রবন্ধের অন্যত্র কিছু আলোচিত হবে। বর্তমান জাতীয়তার বিকাশের যুগের আগে ধর্ম ছিল প্রবল শক্তি। ধর্মীয় সভ্যতায় অন্য কোন উপাদানের স্থান ছিল না। বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের ফলে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটি ধর্মের অধীন বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র বর্তমান রয়েছে যেমন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। শুধু ধর্ম নয় এদের ভাষাও এক, তবুও এরা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। মধ্য প্রাচ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বহু রাষ্ট্র পাশাপাশি বিদ্যমান।

"জাতিগঠনের প্রধান উপাদান হ'ল ভৌগোলিক সীমা ও সেই সীমায় সীমায়িত রাষ্ট্র। ভৌগোলিক জাতিসত্তা থাকলে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী অনিবার্য হয়ে ওঠে। কানাডার মত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এই কারণেই।"[৭৯]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আবেদন ছিল ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে সীমায়িত ভারতীয় জাতির মুক্তি। জাতীয়তার আলোচিত উপাদানগুলির গুরুত্ব বিচার ক'রে Hans Kohn বলেন, শ্রেষ্ঠ উপাদান হ'ল 'সজীব সক্রিয় সমবেত ইচ্ছা' (Living and Active Corporate Will)। দেশের জনগণের সিদ্ধান্ত থেকেই হয় জাতির গঠন।"[৮০] জাতীয় ইচ্ছা ভাবাদর্শের সৃষ্টি করে। "বর্তমান যুগে রক্তের ডাক নয়, একটি ভাবাদর্শের শক্তি দিয়েই জাতিসত্তা সংগঠিত হচ্ছে।"[৮১]

প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবিদ Earnest Renan ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছার উপর।[৮২]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাতিগঠনের বিভিন্ন উপাদানের আলোচনা ক'রে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকেই 'বড়ো' উপাদান হিসাবে দেখেছেন। রেনার মতামত বিচার ক'রে তিনি জাতির গঠন সম্পর্কে এই মত ব্যক্ত করেছেন: "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুতঃ একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা।"[৮৩]

সুভাষচন্দ্র National Will বা জাতীয় ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে বলেছেন: "আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National Will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয়...তাহা হইলে জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না।"[৮৪] অন্যত্র বলেছেন: "...আমি বিশ্বাস করি বিদেশী শক্তি অপসারণের পর সর্বোপরি একটি জাতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হবার ও

সঙ্ঘবদ্ধ থাকার ইচ্ছা চাই।...ঐক্যের সমস্যা একটি মানসিক বিষয়। সাধারণ মানুষের ভিতর শিক্ষা ও আচরণের মাধ্যমে এক জাতিত্বের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।"[৮৫] আর "শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়...।"[৮৬]

প্রাচীন জাতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যে মহান ভৌগোলিক ভারতবর্ষের জনতা ভাবাদর্শময় ইচ্ছার আকুতিতে অখন্ড সাম্য-স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে উত্তাল জাতীয় আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় জাতিসত্তা নূতন ক'রে প্রকাশিত হয়ে ওঠে এবং সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলনের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় ঐক্যের আবেগ ঐতিহাসিক পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ইতিহাসের বিরল সুযোগ মূঢ়তা আর চক্রান্তের পাহাড়ে ভেঙে পড়ে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেশভাগের মধ্য দিয়ে তাই সংঘটিত হয়ে গেছে।

জাতীয় আন্দোলন ও বিভেদনীতি

সুভাষচন্দ্র বলেন, "ভারতবাসীরা বিদেশীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না।"[৮৭] সেজনাই অনেক জাতি ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু বৃটিশ জাতি ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার সময় থেকেই সেখানে তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছে এবং বহুসংখ্যক ধর্মপ্রচারক আমদানী ক'রে ভারতবাসীকে ইংরেজী ধাঁচে সভ্য করার ধর্মীয় কাজে বিপুল উদ্যোগ আয়োজন করেছে।[৮৮] বৃটিশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতি ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠল এবং এর থেকেই ভারতবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচীমুখ রচিত হ'ল। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র নূতন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার সুরু হ'ল এবং দীর্ঘস্থায়ী অনুরূপ শিক্ষা-কাঠামো গড়ে তোলা হ'ল। নূতন আগ্রাসী-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'লে স্বভাবতঃই সমাজের চিন্তানায়কেরা শঙ্কিত হ'লেন। ভারতের অন্তরাত্মার বিদ্রোহ* প্রথম রূপ নিল রামমোহনের আবির্ভাবে। বেদান্ত-দর্শনকে ভিত্তি ক'রে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হ'ল, যিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনালেন এবং ধর্মে ধর্মে বিরোধের অবসান ঘটাতে বললেন। ভারতের প্রাচীন মূল্য নূতন রূপ পেল তাঁর বিশ্ববিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, যাঁর ত্যাগ ও সেবার জ্বলন্ত আদর্শে সমগ্র জাতি উদ্বুদ্ধ হ'ল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলনও বিপুল প্রভাব বিস্তার

---

*"Faced with the menace of being swallowed up by a new religion and a new culture, the soul of the people revolted."—*Indian Struggle, p.* 20

ক'রল। এই সব ধর্মীয় নবজাগরণের আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচার না করলেও তা জাতির মনে দ্রুত আত্মসম্মানবোধ এবং দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিল।

ভারতবাসী জানল নূতন আক্রমণকারীরা শুধু বাণিজ্য করতে আসেনি, এসেছে শাসন করতে এবং ভারতে তারা ভারতবাসী হিসাবে নয় বিদেশী বিজেতা রূপে দেশীয় সত্তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এই বোধের অন্যতম পরিণতি হ'ল – সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। এই বিদ্রোহে একজন মুসলমান শাসকের নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু মুসলমান জনতা বৃটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে একত্রিত হয়েছিলেন।[৮৯] নানা ঘাত প্রতিঘাত অনৈক্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় সে সংগ্রাম বৃটিশ-বিতাড়নে উত্তীর্ণ হ'ল না। বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি সমগ্রজাতিকে অস্ত্রহীন ক'রে কঠোরতর শাসনের শৃঙ্খল পরিয়ে দিল। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের নূতন জাগরণী আন্দোলন রূপ নিল বিচারপতি এম জি রাণাডের নেতৃত্বে। গোখেল তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটল এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, সারভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, গণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে সে আন্দোলন অঞ্চলে অঞ্চলে সঞ্চারিত হ'ল। ভারতের সংস্কৃতি সভ্যতার এই নব জাগরণে অ্যানি বেসান্তের থিয়সফিক্যাল সোসাইটিও অংশ গ্রহণ করল। পরবর্তীকালে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনে (১৯১৬-১৭) আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে।

বিদেশী বৃটিশ শাসনের কঠোরতায় অতীতের গ্রামীণ সমাজের স্বায়ত্তশাসন কাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে গেল, ভারতের মানুষ বুঝতে পারলেন শাসকগোষ্ঠীর বজ্র-মুষ্টি গ্রাম ও শহরের সমস্ত মানুষকে এক ব্যাপক শাসন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছে।[৯০] ভারতের নূতন জাগরণকে বৃটিশ শাসকেরা নানাভাবে দমন করতে উদ্যত হলে জাতীয় আন্দোলন গোপনচারী বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করল, যার অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পরবর্তীকালের ঋষি অরবিন্দ। তিনি জাতিকে উচ্চ আদর্শে শিক্ষিত ক'রে তোলার কথা এবং জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণের কথা বলেন। 'আমাদের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন ঃ ''সমস্ত জগত আর্যদেশ সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানধর্ম শিক্ষা-প্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ...।'' অন্যত্র বললেন ঃ ''আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।'' এবং

''ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি-প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার...।''[১১] জাতীয়তার জাগরণকে অরবিন্দ এক উদ্দেশ্যময় মিশনের দিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। এ সুর আমরা বিবেকানন্দে লক্ষ্য করেছি। সুভাষচন্দ্রও ভারতের 'মিশনে' দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে ভারতের বিশিষ্ট অবদানকে বিশ্বের ভাণ্ডারে তুলে দিতে চেয়েছেন।

সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের যুগের পর ইংরেজ-বিদ্বেষ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২০ সাল থেকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালে সে আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। গান্ধীজীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হ'ল আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফৎ আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এরূপ আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত কবার যৌক্তিকতা বিষয়ে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মনে করতেন ভারতীয় মুসলিমদের কাছে ট্রিপলি, আলজিরিয়ার মুসলিমগণ হিন্দুদের চেয়ে বেশী আত্মীয়। বৃটিশ শাসকেরা হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্থক্যের রন্ধ্রপথে বিভেদের বীজ বপন করতে অনেকদিন থেকেই উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁদের প্ররোচনায় ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খাঁ বৃটিশ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সদস্যপদ দাবী করেন, যে পদগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মুসলিম ভোটারদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন। এখন সুনিশ্চিত জানা গেছে এই প্রতিনিধিত্বের চক্রান্ত বৃটিশ সরকার কর্তৃক বা সরকারী অনুপ্রেরণায় উদ্ভাবিত হয়েছিল।[১২]

এই বিষয়ে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ **Mr. Archbold,** নবাব মহসীন-উল-মুলককে ১০ই আগষ্ট ১৯০৩ তারিখের এক চিঠিতে লেখেন: ''...এই সব ব্যাপারে আমি পর্দার অন্তরালে থাকতে চাই এবং আপনার কাছ থেকেই যেন উদ্যোগের অবতারণা করা হয়।''[১৩] উক্ত ডেপুটেশন বৃটিশ প্রেসে আনন্দের রোল জাগিয়ে তোলে, ভারতের এক জাতিত্বের কল্পনা ফেটে গেল এই ভেবে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।[১৪] কোন সরকারী আমলা লেডি মিন্টোকে লিখে জানালেন যে ৬২ মিলিয়ন লোককে গুপ্ত বিদ্রোহী দলে যোগদান করা থেকে নিরস্ত করা গেছে।[১৫] ঢাকায় ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রস্তাবে হিন্দুদের ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে দৃঢ় থাকতে অনুরোধ করা হয় কারণ—তা পূর্ব-বঙ্গে মুসলিম অধিবাসীদের মুক্তি এনে দিয়েছে। এইভাবে বৃটিশ শাসকবর্গ গোপনে মুসলিম ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ভারত-বর্ষে বিভেদের বীজ রোপণ করে দিলেন। মর্লিমিন্টোর ১৯০৬-এর প্রশাসন সংস্কার পরিকল্পনা ১৯০৯-এ কাউন্সিল আইনে রূপ গ্রহণ করলে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রনির্বাচনের বিষবৃক্ষ উপ্ত হয়ে গেল এবং এরপর জাতীয় আন্দোলনের

ধারায় সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ প্রসারিত হ'ল। অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। অবশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন বহু স্বনামধন্য মুসলিম নেতার বিশিষ্ট অবদানে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ভারতের রাজনৈতিক ধারা সাম্প্রদায়িক বিভেদের খাতে বয়ে চলল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিতরে গড়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলন। গড়ে উঠল ভারতের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার –যার অধীনে পূর্বএশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতীয় অধিবাসী—বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নানা প্রদেশের অধিবাসী—এক সামগ্রিক সংগঠনে যুক্ত হয়ে সেই সরকারের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সহায়তায় ভারতের অখণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। এ ইতিহাস আজ আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। এই সরকারী সংগঠনে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের লেশমাত্র ছিল না। তাঁরা যে সংক্ষিপ্ত মহাভারত গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেনঃ ''আই. এন. এ অনেক গর্বের বস্তু অর্জন করেছে।...তারা ভারতের বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির জনগণকে এক পতাকা-তলে সমবেত করেছে এবং সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণতার মনোভাবকে নির্মূল ক'রে সকলের মনে জাগিয়েছে ঐক্য ও একাত্মতা। এই আদর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।''[৯৬] ১৯৪৫-এর ১৬ই আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুজীও আই এন. এ -র অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করেন।[৯৭]

১৯৪৫-এর মাঝামাঝি ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেল থেকে যখন মুক্তি পেলেন তখন তাঁদের সমক্ষে আন্দোলন করার মত কোন রাজনৈতিক বিষয় ছিল না।[৯৮] আই. এন. এ -র ঘটনাবলী এবং লালকেল্লায় শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলনের বিচার সে সুযোগ এনে দিল। আই. এন. এ. হ'ল বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তির বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতীক। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভাবলেন দেশে বৈপ্লবিক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হ'লে বৃটিশ কর্তৃক আই.এন.এ.-র সৈনিকদের বিচারের ব্যাপারে নিজেদের জড়িত করতে হবে। তার উপর ভবিষ্যতের নির্বাচনে (১৯৪৫-৪৬) অসাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতাকে সামনে রাখা প্রয়োজন এবং এর জন্য আই. এন. এ -র অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য কংগ্রেসকে সাহায্য করবে।[৯৯] আই. এন. এ.-র পক্ষ সমর্থনের জন্য 'ডিফেন্স কমিটি' গঠিত হ'ল এবং এই কমিটিতে সদস্য হিসাবে ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, জওহরলাল নেহরু, ভুলাভাই দেশাই, ডঃ কে.এন. কাটজু, রঘুনাথ শরণ ও আসফ আলী। মহম্মদ আলী জিন্নাও আই. এন এ.-র পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন। আই.এন.এ.-তে বহুসংখ্যক মুসলিম সৈনিক থাকায় লীগও আই. এন. এ.-র বিচার বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেনি।[১০০] আই.এন. এ.-র ক্যাপ্টেন রসিদ আলীর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে লীগ রসিদ আলী দিবসের ডাক দিলে (১১

থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) ভারতের দিকে দিকে হিন্দুমুসলিম জনতা একত্রে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। আই.এন.এ. সৈনিকদের বিচার কালে সারা ভারতে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের জোয়ারে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে পারেনি। এর উপর আই. এন. এ.-র প্রভাব বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আই. এন. এ.-র সৈনিকগণ (অধিকাংশই) পূর্বে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতেই ছিলেন। সুভাষ-নেতাজীর নেতৃত্বের স্পর্শে তাঁরা বিপ্লবী আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন। শ্রী কে. কে. ঘোষ এ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা পুস্তকে লিখেছেন যে সৈনিকদের মধ্যে এই ব্যাপক আনুগত্যের পরিবর্তন এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা এক বিপ্লবের থেকে ন্যূন নয়।[১০১] এর দীর্ঘ এবং ঐতিহ্যময় ইতিহাস আজ কিছুটা প্রকাশিত যদিও তা বহুল প্রচারিত নয়।

যাই হ'ক, বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলি আই এন এ -র পক্ষ সমর্থন করলেন। বৃটিশ শ্রমিকদলের সদস্য Woodrow Wyatt বলতে বাধ্য হলেনঃ "যদি বৃটিশ শক্তি সত্বর সহজে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় বের করতে না পারে তবে ...এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান তাদেরকে দূর করে দেবে।"[১০২] অন্য একজন বৃটিশ সংসদসদস্য Sorensen মন্তব্য করেন যে বিপ্লব ঘটলে বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈনিক ও তাদের অফিসারগণ জাতীয়তাবাদীদের দলে যোগদান করবে।[১০৩] বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলিতে বিদ্রোহমূলক ব্যাপক বিক্ষোভ এবং বন্দরে বন্দরে নৌবিদ্রোহের বৈপ্লবিক কাহিনী আজ আর কারো অবিদিত নয়। সমগ্র-ভারতবর্ষ তখন এক বৈপ্লবিক জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে বৈপ্লবিক জাতীয়তায় উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গেছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করলেন না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির গোলযোগের নিন্দা করলেন এবং নৌ-বিদ্রোহীদের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিলেন।[১০৪] বিপ্লবী আন্দোলন প্রতারিত হ'ল।

দ্বিতীয় অন্তর্ধানের পূর্ব পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেতার মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সমালোচনা করেছেন এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে মাতৃভূমি খণ্ডনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আকুল আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতা-লিপ্সু নেতৃত্বের মনে তা রেখাপাত করেনি। শ্রীঘোষ লিখেছেনঃ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় তাঁরা (জাতীয় নেতৃত্ব) নির্বাচনের পূর্বে আই.এন.এ.-র বিচার বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে সহজেই গণসমর্থন সংগঠিত করলেন। কিন্তু আন্দোলন যখন ক্রমশঃ অধিকতর সহিংস হতে লাগল তাঁরা তখন অসুবিধায় পড়ে পিছিয়ে গেলেন। তাঁরা এই সহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে অনিচ্ছুক সম্ভবত অপারগ ছিলেন এবং যে আন্দোলনকে তাঁরা বেড়ে উঠতে সাহায্য করলেন, সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বৃটিশের মতই তাঁরা আগ্রহান্বিত হলেন।"[১০৫] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের

এই মনোভাব বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও মুসলিম-লীগের না জানার কথা নয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ ক'রে মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন এবং বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা কর্তৃক ঐদিন ছুটি ঘোষিত হ'ল। বাংলায় তিনদিনে ছয় হাজার লোক নিহত হলেন। অনেক নারী হলেন নিগৃহীতা, ধর্ষিতা, বহু পুরুষের হ'ল অঙ্গহানি—যাদের সংখ্যা হবে বিশ হাজার।[১০৬] লীগ মন্ত্রীসভার প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বৃটিশ গভর্নরের চোখের উপর এরূপ নৃশংসতা সংঘটিত হ'ল। বৃটিশ ও লীগ প্রশাসন নীরব থেকে প্রমাণ করলেন— এই জিনিসটিই তাঁরা চাইছিলেন।

গান্ধীজী জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বকে ঘৃণা করতেন। তাঁর মতে সামান্য সংখ্যক ব্যতিরেকে ভারতের মুসলমানগণ ভারতীয় বংশোদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন জাতি নিয়ে কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি জাতিরাষ্ট্র যখন একত্রিত থাকার সূত্র বের করতে পারে তখন ভারতে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করতে পারবে না কেন, জিন্না ও উপরের স্তরের কংগ্রেস নেতৃত্ব সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।[১০৭] ভারতের দীর্ঘদিনের সাধনা ও চিন্তাধারাকে প্রতারিত করে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশ ভাগে রাজী হয়ে ইংরেজ ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতৃত্বের চক্রান্তকে সফল ক'রে তুললেন। গান্ধীজী আজাদকে বলেছিলেন ঃ "কংগ্রেস দেশবিভাগ গ্রহণ করলে তা আমার মৃতদেহের উপরই করবে।" কিন্তু আজাদ বলেছেন ঃ "...গান্ধীজীর সঙ্গে আবার যখন সাক্ষাৎ করলাম তখন জীবনের কঠিনতম আঘাত পেলাম, দেখলাম তাঁর মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে।...(দেশভাগের) বিরুদ্ধে তাঁর কঠিন মনোভাব ব্যক্ত করলেন না।"[১০৮] এ সময়কার দীর্ঘ জটিল ও ক্রুর ইতিহাস অনেকে অনুধাবন করেছেন। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ছয়লক্ষ লোক প্রাণ দিলেন, দুইলক্ষ নারী অপহৃতা হয়ে বাহুবলে ধর্মান্তরিতা কিংবা নীলামে বিক্রীতা হলেন।[১০৯] সুভাষ-নেতাজীর আই.এন এ -র প্রভাবে সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে যে জাতীয় ঐক্যের প্রবল জোয়ারে ভারতবর্ষ ভাবগত জাতীয় ঐক্যের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বৃটিশ ও লীগের চক্রান্তে তৈরী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার তান্ডবে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মূঢ়তায় সে জাগ্রত জাতীয়তাবোধের বলিদান ঘটে গেল। দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হ'ল। ইতিহাস-বিধাতা আড়াল থেকে ক্রুর হাসি হাসলেন। ১৯৭১ সালে ইতিহাসের রথ মোড় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। প্রমাণিত হ'ল শুধু ধর্মের ডাকই জাতীয় ঐক্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। অখন্ড ভারতের নেতৃত্বের অদূরদৃষ্টি যে বন্ধুর বিপথ রচনা ক'রেছে ইতিহাস কতদূর তাকে ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যবোধের প্রভাবে ঐক্যের ইচ্ছায় ফিরিয়ে আনতে পারবে কালই তার পরিচয় দেবে।

ভারতের কমিউনিস্টদলও সেদিন দেশভাগে সমর্থন জানালেন। তাঁরা

ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশশক্তির সমর্থনে খুবই মুখর ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁরা আই. এন. এ.-র প্রতিও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ অনেকের অজানা নয় কিন্তু সাম্প্রদায়িক দেশভাগে সমর্থন জানিয়ে তাঁরা ভারতে জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ বৈদেশিক শক্তিসাম্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য কোন কমিউনিস্ট-দেশের অভ্যন্তরে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের কোন যুক্তির অবতারণা করেননি। বিশিষ্ট কমিউনিস্টনেতা জি. অধিকারী বললেনঃ "প্রগতিবাদী মূল্যায়ণের দিক থেকে পাকিস্তানের জন্য দাবীর বাস্তবিক অর্থ স্বাধীনতার অধিকারের দাবী এবং ভারতবর্ষ থেকে মুসলিমপ্রধান অঞ্চল সমূহের যেমন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু বেলুচিস্তান এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার দাবী।"[১১০] তিনি আরও বলেছেনঃ 'এই একজাতি, একভাষার ধারণা হিন্দু কল্পনায় আচ্ছাদিত হয়ে অতীত থেকে বর্তমানের জাতীয় আন্দোলনে প্রসারিত হয়েছে। আজ যখন জাতীয় প্রগতির ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতঃ বহুজাতিত্বের আকার গ্রহণ করেছে, তখনও এই ধারণা বিদ্যমান।"[১১১] তাঁর মতে জাতীয় ঐক্যের সমস্যা হচ্ছে বহুজাতির একত্র হবার সমস্যা।[১১২] কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৪৩-এর পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনতা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির স্বাধিকার ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার স্বীকার করে নেবার কথা বলা হয়েছিল।[১১৩] কমিউনিস্ট বন্ধুদের যুক্তিগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির দেশ-বিভাগের চক্রান্তের সহায়ক হয়ে উঠল। পাঠকমাত্রই বুঝবেন দেশবিভাগের ফলে অনৈক্যের কবন্ধরাজি আজও খণ্ডিত ভারতে জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টায় অন্তরাল থেকে ভয়াল প্রতিরোধ রচনা করে চলেছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার আগ্রাসী ও একপেশে তত্ত্বই জাতীয়তা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধ মনোভাব ও দিশেহারা ধ্যানধারণার জন্য দায়ী; যেমন বিকৃত ও উন্নাসিক জাতীয়তাবাদ সাম্যপন্থী বা সমন্বয়বাদী জাতীয়তার বিরোধী।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

জাতীয়তা সম্পর্কে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার বিষয়ে অধ্যাপক Solomon F. Bloom তাঁর গবেষণা পুস্তকে বলছেনঃ "মার্কস এঙ্গেলস লিখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা পিতৃভূমি ও জাতীয়তা তুলে দিতে চান। পিতৃ-

ভূমির অর্থ হ'ল শোষক শ্রেণীর দেশ, বর্তমানে যা বুর্জোয়াদের করায়ত্ত। সেই অর্থে এ কথা স্পষ্ট শ্রমিকদের পিতৃভূমি বলে কিছু নেই। যা তাদের নেই তা আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি না।

"এইরূপ স্থূল উক্তি রক্ষণশীলদের সমালোচনা এবং বিপ্লবীদের অনেক কল্পনার বিষয়বস্তু হয়েছে।"[১১৪]

কার্ল মার্কস কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংগঠন ও অগ্রগতির ক্ষমতাকে জাতিগঠনের মুখ্য উপাদান বলে মনে করেছেন। অন্যান্য উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক ও অন্য উপাদানগুলির মধ্যে কোন সম্পর্কের কথা বলেননি।[১১৫]

তাঁর মতে সব জাতির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকার প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে এমন নয়।...কোথায় এবং কখন একটি জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভবপর তা মূলতঃ নির্ভর করবে সেই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটির শিল্পায়িত আর্থিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষমতার উপর। মার্কস সেজন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকার সম্পর্কে বড় ও ছোটজাতির মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য করেছেন। সেই সব জাতির বা জাতিগোষ্ঠীরই রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আছে যারা আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। মার্কস নিঃসন্দেহে মনে করতেন, জার্মান, ইটালীয়, পোলিশ ও হাঙ্গেরীয় (ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, আমেরিকান তো বটেই—যাদের রাষ্ট্র রয়েছে) জাতির মত বড়, একত্রিত এবং ভৌগোলিক সীমার অবদানে সমৃদ্ধ জাতিগুলির রাষ্ট্রগঠনের অধিকার রয়েছে। অপর পক্ষে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলির যেমন, পুরাতন অষ্ট্রীয় বা তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্লাভ গোষ্ঠীগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার দাবী করতে পারে না বা সাফল্যজনকভাবে সে দাবী রক্ষা করতেও পারে না...ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার দাবী 'প্রতিক্রিয়াশীলতার' বিপদ ডেকে আনতে পারে। তারা অনিবার্যভাবে উন্নতি ও প্রগতির বিরুদ্ধে যাবে। উন্নতির লক্ষণগুলি হ'ল বড় ধরনের আর্থিক রাষ্ট্রিক সংগঠন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা ও সংস্কৃতির আত্মবিলুপ্তি।[১১৬]

মার্কস এমন-কি বড়জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকেও আন্তর্জাতিক স্বার্থের নীচে স্থান দিয়েছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া ইটালীতে হ্যাপসবার্গ *প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মার্কস কিন্তু হ্যাপসবার্গ স্বার্থের স্বপক্ষে দাঁড়ান কারণ ইটালীতে ফরাসী হস্তক্ষেপ জার্মানীর একতার সহায়ক হবে না এবং যেহেতু জার্মানী ছিল ইটালীর থেকে বৃহত্তর ও উন্নততর দেশ। এ বিষয়ে লাসেলের সঙ্গে মার্কসের মতপার্থক্য ঘটে।[১১৭]

---

* **Hapsburg or Habsburg–** অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্র।

স্লাভ জাতিগুলি সম্পর্কে মার্কস একটি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও তিনি পোলদের স্বাধীনতা সমর্থন করতেন। মার্কস নর্ডিক বা স্কান্দিনেভীয় জাতীয়তার কথা সহ্য করতে পারতেন না। মার্কস বিশ্বাস করতেন শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিটি জাতি শাসিত হ'লেই আন্তর্জাতিক শান্তি বাস্তবায়িত হবে।[১১৮]

জাতীয়তার ঐতিহ্যগত উপাদানের বিষয়ে এবং কোন জাতির সার্বজনীন উদ্দেশ্যের (Universal Purpose) সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা ক'রে তিনি বলেছেন যে একপ্রকার জাতীয়তাবাদ রয়েছে যা নিজের জাতিকে গৌরবময়, বিশেষ ক'রে সার্বজনীন উদ্দেশ্যমণ্ডিত মনে করে। কখনো কখনো তারা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উপর জোর দেয়। এই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সেইসব জাতিগুলি তাদের অতীতকে 'প্রত্যাদিষ্ট তৈলে' (Inspired Oil) সিক্ত ক'রে।[১১৯]

জাতিরাষ্ট্রের গঠনে মার্কস অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষমতাকেই মুখ্য উপাদান হিসাবে দেখেছেন। সেখানে স্বাধীনতার অখণ্ড প্রকৃতির মনন বা অত্যাচারের নৈতিক দোষ রেখাপাত করতে পারেনি। মার্কসের জাতীয়তার চিন্তাধারা ব্যাখ্যা ক'রে Blocm লিখেছেনঃ "সভ্যতার বাস্তব প্রয়োজন হ'ল বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন এবং তা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য বৃহৎ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুচ্ছের আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনই মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে থেকেই আপস ক'রে চলতে হবে। কোনো কোনো জাতি তাদের সংস্কৃতি, তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলবে কিন্তু উপায় নেই।...অর্থনৈতিক রূপান্তর না ঘটলে অনুন্নত বৃহৎ জাতির স্বাধিকারের দাবীকেও সমর্থন করা যায় না। অর্থনৈতিক সংগঠনের বিচার দিয়ে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণের সহায়তা হবে। প্রতিটি জাতির ভৌগোলিক সীমা, প্রাকৃতিক সম্পদ, জলপথ, জনসংখ্যা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিরাট অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।"[১২০]

কিন্তু মার্কসের সময়েই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের সজীবতা প্রমাণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক মধ্য ইউরোপীয় জাতি তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে তোলে। পোল বা হাঙ্গেরীয়দের থেকে ছোট জাতিগুলি হ্যাপসবার্গের মত বড় সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে সাহায্য করেছে। মার্কস তা বুঝতে পারেননি।[১২১]

পরবর্তী যুগে বিশ্বে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার যখন এলো মার্কসের অনুসারীগণ তত্ত্বগত দিক থেকে বিপদে পড়লেন। কারণ জাতীয়তার বিষয়ে মার্কসের চিন্তা তাদের পথের নির্দেশ দিতে পারল না। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রিয়াতে Otto Bauer মার্কসবাদ ও জাতীয়তার সম্পর্কে নূতন মূল্যায়ণ

করতে বাধ্য হলেন।[১২২] এজন্য The Right of Nations to Self Determination পুস্তিকায় লেনিন, তাঁর (Otto Bauer-এর) কঠিন সমালোচনা করেছেন।

জাতিগত ভাবনা ও আন্তর্জাতিকতার বিষয়ে লেনিনের সুতীক্ষ্ণ মতগুলি কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণকে বুঝতে সাহায্য করবে। লেনিন বলেছেন: "Wilhelm-এর অধীনে যদি কোন জার্মান বা Clemenceau-এর অধীনে কোন ফরাসী বলে, 'আমার দেশ কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে সমাজবাদী হিসাবে আমার অধিকার ও কর্তব্য দেশকে রক্ষা করা' সে তখন সমাজবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী বা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত হিসাবে নয় একজন পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী হিসাবে এই যুক্তি খাড়া করে। কারণ এই যুক্তি পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামের কথা বাদ দেয়, এই যুক্তি পৃথিবীর বুর্জোয়া ও পৃথিবীর প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের সমীক্ষাকে বাদ দেয় অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাকে বাদ দেয়।

"সমাজবাদী, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদী অন্যভাবে যুক্তি দেয়। সে বলে, 'যুদ্ধের (সে যুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল বা বৈপ্লবিক যাই হোক-না কেন) চরিত্র— কে আক্রমণ করেছে, কিংবা কার দেশে শত্রু বসে আছে তার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে কোন্ শ্রেণী যুদ্ধ করেছে এবং কোন্ রাজনীতির ধারা ধরে সে যুদ্ধ, তার উপর।'

"আমার যুক্তি অবশ্যই 'আমার' দেশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় (কারণ সে যুক্তি হচ্ছে হতভাগা, মূর্খ, পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর), তা হবে সর্বহারা বিপ্লবের প্রস্তুতি, প্রচার এবং তা ত্বরান্বিত করণে আমার অংশ কতটুকু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে।

"এই হচ্ছে আন্তর্জাতিকতার অর্থ এবং এই হচ্ছে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদীর, বিপ্লবী কর্মীর আর যথার্থ সমাজবাদীর কর্তব্য।"[১২৩]

অন্যত্র বলেছেন: "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক ঔপনিবেশিক অনুন্নত দেশগুলিতে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটিক জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করা উচিত, একটিমাত্র শর্তে যে—এই সব দেশে ভবিষ্যতের সর্বহারা পার্টির সংগঠনকারীদের যারা শুধু নামে কমিউনিস্ট হবে না, তাদের একত্রিত করে বিশেষ কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে; সেই বিশেষ কাজ হ'ল তাদের নিজেদের জাতির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।"[১২৪]

অধ্যাপক Ele Kedourie মন্তব্য করেছেন: "তাদের (বলশেভিকদের)

তত্ত্বানুসারে জাতীয় আন্দোলনগুলি প্রগতিবাদী কিংবা প্রগতি-বিরোধী কিনা তা নির্ভর করবে কোন অর্থনৈতিক উন্নতির স্তরে সেগুলি সংঘটিত হল তার উপর।... জাতীয়তাবাদ একটি প্রগতিবাদী আন্দোলন যতদিন সামন্ত-তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের সংগ্রামের জয় না ঘটছে।... লেনিন ও স্তালিন তাঁদের রাজনৈতিক তর্ক সমন্বিত রচনাগুলিতে জার শাসিত রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কখনও সমর্থন জানিয়েছেন আবার কখনও তার বিরুদ্ধতা করেছেন— তাঁদের বিচারের মানদণ্ড ছিল, এরূপ আন্দোলন বিপ্লবের সফলতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করছে কিনা। সেজন্য লেনিন জু শ্রমিকদল Bund-এর পূর্ব ইউরোপে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধতা করেন, কারণ এরূপ দাবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বকে দুর্বল ও বিভক্ত করে দেবে, কিন্তু পোলিশ জাতীয়তাবাদের—যা জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ তার—প্রতি অবহেলা ও তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য Rosa Luxembourg-এর সমালোচনা করেন। এই যুক্তি দিয়ে এটা বোঝা সহজ কেন বলশেভিকদের কাছে সমকালীন ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি দক্ষিণপন্থী আন্দোলন এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় তা একটি বামপন্থী আন্দোলন। কিন্তু এও সুস্পষ্ট যে এরূপ শ্রেণী-বিভাগের ব্যাপক গ্রহণ নির্ভর করে ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রতি মৌন ও সমালোচনাহীন সম্মতির উপর।"[১২৫]

শ্রী জি অধিকারী তাঁর পুস্তিকায় (Pakistan and National Unity) বলেছেন: "জাতি ও জাতীয় চেতনা সমাজ প্রগতির নির্দিষ্ট স্তরে উত্থিত হয়।" এর সমর্থনে তিনি স্তালিন এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন, যেখানে স্তালিন বলছেন: "বর্তমান জাতিগুলি উন্নয়নশীল ধনবাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম নেয়।"

কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণে ধনবাদী সমাজবিকাশের এক বিশিষ্টস্তরকে জাতীয়তার নিয়ামক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জাতীয়তার গঠনে বিভিন্ন বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে ন্যূন ভাবে দেখে অর্থনৈতিক উপাদানকে প্রধান বলে চিহ্নিত করায় এবং জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার একরোখা বিরূপ মনোভাবের ফলে কমিউনিজম বিভিন্ন দেশের জাতীয়তার চিন্তায় ও আন্দোলনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা বিশ্বের জাতীয়তার চিন্তাসমূহের সমন্বয় নয়, তা এক জাতীয়তা-বিরোধী দর্শনে পরিণত হয়েছে। কার্ল মার্কস ও লেনিনের যুগ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস অনেক এগিয়ে গেছে, এগিয়ে গেছে বিশ্বের মনীষা আর আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে সমন্বয়ী মননধারা এবং বিশ্বে নানা ধরনের জাতিরাষ্ট্র গঠনের সাংগঠনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এর সূত্র ধরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে নূতন

আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের দিক্‌দর্শন রচিত হবে। সুভাষচন্দ্র এরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গিরই সুস্পষ্ট রূপরেখা রচনা করেছেন। তিনি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক বিষয়ে লেনিনের মতের সমালোচনা করেছেন এবং ভারতবর্ষে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা যে সমালোচনার সম্মুখীন হবে—সেকথা বলেছেন।[১২৬]

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তার উৎস সম্পর্কে নানা আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রী এ. আর. দেশাই রচিত **Social Background of Indian Nationalism** নামক গবেষণামূলক পুস্তকে ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসকে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। শ্রীদেশাই স্বীকার করেছেন : "ভারতের বিশিষ্ট সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, তার বিশালতা এবং জনসংখ্যা সব মিলিয়ে ভারতের জাতীয়তার সমীক্ষণকে কঠিনতর করে তুলেছে কিন্তু তা আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয়। অতীতের সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনকে ধরে রাখার ইচ্ছা ভারতে যত শক্তিশালী সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তেমন নয়।"[১২৭]

অন্যত্র বলেছেন : "...ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা ইউরোপীয় সামন্ত-তন্ত্র থেকে ভিন্ন কারণ এর (ভারতের) সামন্ততান্ত্রিকতায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপার ছিল না।"

তারপর এর সমর্থনে **Wadia & Merchant** লিখিত **Our Economic Problem** নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : "হিন্দুযুগে জমির মালিকানা ছিল গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হাতে ; তা কখনও রাজার সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত ছিল না।"[১২৮]

শ্রীদেশাই আরও মন্তব্য করেছেন যে, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও আকবরের মতো শক্তিশালী নৃপতিরা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য নামমাত্র ছিল, কারণ অতীত ভারতের গ্রামগুলি ছিল যেন এক একটি রিপাবলিক। বৃটিশ আসার পরই ভারতে সর্বপ্রথম প্রকৃত একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়।[১২৯] ঐ পুস্তকের লেখক আরও মত প্রকাশ করেছেন যে ভারতে জাতীয় শিল্প বলে কিছু ছিল না। আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ভারতবর্ষময় সংগঠিত ছিল না ; ছিল না তার যাতায়াত ব্যবস্থার সংহতি। "প্রাক্ বৃটিশ ভারতে জাতীয় সংস্কৃতির বস্তুগত বা ভাবগত উপাদান সমূহের যেমন সাধারণ আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উপাদানের অবস্থিতি ছিলনা এবং এই অবস্থিতির সজ্ঞানতাও নয়।... জাতীয় সংস্কৃতিই জাতির সাংগঠনিক অস্তিত্ব সূচিত করে।"[১৩০]

জাতীয়তার উপাদান বিষয়ে কমিউনিস্টদের এইরূপ খণ্ডিত আলোচনার ধারা নিতান্তই একপেশে এবং সেজন্যই তা শ্রীদেশাইকে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পোঁছে দিয়েছে। বস্তুতঃ কমিউনিস্ট তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভারতের জাতীয়তার তথ্যগত উপাদানগুলিকে অবহেলা করা হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে দেখেছি ভারতে বৃটিশ শক্তিই প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য এনে দেয় এই মত কত ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বৃটিশের প্রচার আর কমিউনিস্ট সিদ্ধান্ত এখানে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে। দ্বান্দিক জড়বাদী দৃষ্টিতে অতীত ভারতের গ্রামীণ কাঠামো, রাষ্ট্র ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক এবং অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিপুল এবং বিশিষ্ট প্রমূল্য যথার্থ মর্যাদার স্থান পায়নি। সম্ভবতঃ ভারতের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের অতুলনীয় বিশিষ্টতার বিষয়ে কমিউনিস্ট ভাবনার দীনতা ও বিরূপতা এর অন্যতম কারণ। যাই হোক এ বিষয়ে তিনি আলোচনার গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আরও একটি বিষয় সম্পর্কে বলা প্রয়োজন এই যে অতীত ভারতের শিল্পগত কুশলতা ও সমৃদ্ধি ছিল তদানীন্তন বিশ্বে অতুলনীয় এবং তখন ভারতের শিল্পজাত পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী হয়েছে। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তিও ছিল বিপুল। সেজন্য অতীতের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগঠন ছিল না এ কথা সত্য নয়।

কমিউনিস্ট মতবাদের জাতীয়তার তত্ত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তার ভাবনার মূলগত বিপুল পার্থক্য রয়েছে। তিনি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের অবদানকে ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন, একমাত্র এই জাতিই বিশ্বে দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এবং এর জীবন্ত সত্তায় অনেক সত্যের সফল পরীক্ষার সন্ধান মিলবে—যা বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর। অবশ্য সকল জাতির অবদানের পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই গড়ে উঠবে সত্য আন্তর্জাতিকতা। টোকিয়োতে এক ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "আমরা জেনেছি সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে অবহেলা করে না বরং জাতীয়তা থেকেই তা গড়ে ওঠে।" অন্যত্র বলেছেন: "কোনও প্রকার জাতীয়তাবাদের প্রতি ইহার (কমিউনিজমের) সহানুভূতি নাই কিন্তু ভারতের আন্দোলন একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর জাতীয় মুক্তির আন্দোলন।"[১৩১] অমরাবতী ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন: "সমগ্র মানব-সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে, যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্বজগৎ মানবজাতির পক্ষে অধিকতর সুখকর, কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।"[১৩২]

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদের জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতায় উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন, যে স্বাধীনতা হবে জাতীয় সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনের পূর্বশর্ত। এই সাম্যবোধকে তিনি আহরণ করেছেন ভারতীয় ঋষিদের সাম্যের আত্মিক মনন থেকে এবং তাকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের মানবিক প্রয়োজনে দেশের অর্থনীতিতে প্রসারিত করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে সুভাষচন্দ্রের এক সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত কাঠামো রয়েছে—সে কথা আজ সুবিদিত। আর জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হলেই নূতন জাতীয় আর্থিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। শুধুমাত্র আর্থিক সংগঠনের বেপরোয়া ভৌগোলিক চতুঃসীমা দিয়ে জাতিগঠনের আগ্রাসী কল্পনা নয়। সুভাষচন্দ্র "জনগণের হাতে সব ক্ষমতার" আহ্বান জানিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত সমস্ত জাতির মুক্তি সংগ্রামে নিঃশর্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ভারতের মুক্তি বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করবে।[১৩৩]

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তার বিষয়ে যেমন কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা গ্রহণ করেননি, তেমনি ফ্যাসীবাদের উগ্র জাতীয়তাকে বর্জন করেছেন। বলেছেনঃ "আমি যখন মুক্তি সংগ্রাম লিখছিলাম তখন ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে লিপ্ত হয়নি এবং মনে হয়েছিল তা একপ্রকার প্রবল জাতীয়তাবাদ।"[১৩৪] আবার টোকিয়ো ভাষণে বলেছেন, "...তা (অর্থাৎ ফ্যাসীবাদ) ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি।" ঐ ভাষণের অন্যত্র বলেনঃ "কমিউনিজম যেখানে দুর্বল তা হচ্ছে—কমিউনিজম জাতীয় প্রবণতার কোন মূল্যে দেয় না। আমরা ভারতবর্ষে চাই একটি প্রগতি-শীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়; জার্মানীতে ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্টরা যে জিনিসটি অর্জন করতে পারেনি। ...ভারতবর্ষ...রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবে।" সুভাষচন্দ্র তাঁর **Indian Struggle** নামক পুস্তকেও প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সম্ভব বলে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং ইতিহাসের পরবর্তী ধাপে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার কথা লিখেছেন।[১৩৫]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজম থেকে স্বতন্ত্র এক নূতন মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করেছে। সুভাষচন্দ্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছেনঃ "প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের

উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে।...আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।"... আমরা পূর্বেই দেখেছি সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকও যুক্ত হয়ে তা ভারতবর্ষের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অখণ্ড প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। Hans Kohn বলছেন যে বর্তমান যুগে জাতি-রাষ্ট্রই আদর্শ সংগঠন বলে বিবেচিত হচ্ছে। ব্যক্তির ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার আর্থিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে জাতিরাষ্ট্রের গঠনে।... জাতিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে...অর্থনৈতিক দিকটি আধুনিক সংযোজন।[১৩৬]

যাই হোক জার্মানীর ন্যাশনাল সোস্যালিজমের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তার ধ্যানধারণার বিপুল পার্থক্য সুস্পষ্ট। জার্মানীর আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—জাতীয়তা সম্পর্কে পশ্চিমী পণ্ডিতদের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাঁদের অনেকে সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে ফ্যাসীবাদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। Sources of Indian Tradition নামক সংকলন গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তাঁর মৃত্যুতে* এবং বিশ্বে ফ্যাসীবাদের পরাজয়ে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল সোস্যালিজম সম্পর্কে এই স্বল্পকালীন আগ্রহের হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে।"[১৩৭] ঐতিহাসিক তথ্যে এরূপ অসাধু মন্তব্যের সমাপ্তি ঘটা প্রয়োজন। আশা করব পশ্চিমী পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সত্য ইতিহাস যাচাই করে যুদ্ধকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব বর্জন করবেন এবং তাঁদের তথ্যগত অতীত ভুল সংশোধন করে ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন।

সুভাষচন্দ্র পুণায় অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সভায় (৩-৫-২৮) জাতীয়তাবাদের উপর আক্রমণের জবাব দিয়ে বলেছেন: "একাধিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদের উপর যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, আমি সে সম্পর্কে আমার দেশবাসীদের এবং যুবক বন্ধুদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবাদকে কখনো কখনো সঙ্কীর্ণ, স্বার্থসন্ধ এবং আক্রমণাত্মক বলে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিকতার ক্রমোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ বলেও মনে করা হচ্ছে। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলতে চাই যে ভারতের জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর বা আগ্রাসী নয়। তা মানবজাতির সর্বোচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এই আদর্শ হল—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ আমাদের জীবনে সত্যবাদিতা, সাধুতা, পৌরুষ এবং ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জাগ্রত করে। ততোধিক জাতীয়তাবাদ আমাদের জনজীবনে সৃজনশীল

* এক ধরণের প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জনতা সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না।

প্রতিভা জাগ্রত করেছে, যা বহুশতাব্দী ধরে সুপ্ত ছিল; এর ফলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করছি।

'জাতীয়তাবাদের উপর আর এক আক্রমণ আসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই আক্রমণ শুধু অবিবেচনা প্রসূত নয় তা অজ্ঞাতসারে আমাদের বিদেশী শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষা করে। সাধারণ মানুষের কাছে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে আমরা সমাজবাদী বা অন্য যে-কোন নূতন ভিত্তিতে ভারতের সমাজ সংগঠন করতে সচেষ্ট হই না কেন, আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজে গড়ার অধিকার অর্জন করতে হবে। যতদিন ভারতবর্ষ বৃটেনের পদতলে থাকবে ততদিন আমরা সে অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবো।"[১৩৮]

সুভাষীয় মতের অনুসরণে বলা চলে বিশ্বে সমন্বয়ী আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণে ভারতীয় জাতীয়তা পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করবে। সুভাষচন্দ্র এ প্রত্যাশার রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন ভারতবাসীর উপর—যাঁরা বিশ্বাস করেন বিশ্বে ভারতকে তার বিশিষ্ট সভ্যতার অবদান রাখতে হবে।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু জাতীয়তার সংগঠনে আমরা বর্তমানের ভারতবাসী—যদি যুগের দাবীর ও অতীত আদর্শের সমকক্ষ হতে অক্ষম হই, তা হলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। ভারতে জাতীয়তার যে শক্তিশালী সাংগঠনিক উপাদানগুলি রয়েছে—তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাকামী নানা শক্তির বিষাক্ত উত্থান রোধ করতে সক্ষম না হলে ভারতবর্ষে মহান জাতীয়তার সংগঠন ব্যাহত হবে। ভারতবর্ষে নানা সামাজিক বৈষম্য ও বিশেষ করে ভাষা সংক্রান্ত বিভেদের সুযোগ নিয়ে নানা শক্তি আমাদের সংহত জাতীয়তার ভাবনায় আঘাত করছে। এদের স্বরূপ উপলব্ধি করে রোগ নিরাময়ের জন্য তৎপর হওয়া আমাদের আশু জাতীয় কর্তব্য।

ভাষা, আঞ্চলিকতা ও সামাজিক বৈষম্য

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা একদিন শিক্ষা, ভাব ও সাংস্কৃতিক সংহতির বাহন ছিল। এই ভাষাতেই শাস্ত্র, গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। আজও ভারতবর্ষে অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আন্দোলন তুলেছেন। আসমুদ্র হিমাচল এ ভাষার প্রতি ভারতবাসীর এক বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ভারতের সমস্ত ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। উত্তর ভারতের ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ থেকে ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতি

ঘটিয়েছে। জাতীয় সংহতিতে সে ভাষার অবদানকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে গভীর মনন ও পর্যালোচনার অভাব রয়েছে এবং সরকারী পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ অনীহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধার প্রাচীর তুলেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ভাষার কথা বলা হয়েছে যা হিন্দী-উর্দু মিশ্রিত এক ভাষা। অমিশ্র হিন্দী ভাষাভাষীর জনসমষ্টি ভারতের বিপুল জনসমষ্টির একটি অংশমাত্র (অর্ধেকের কম)। দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলাভাষী জনসংখ্যা এর থেকে ন্যূন ছিল না। উপরন্তু প্রাদেশিক ভাষাসমূহ অনেক উন্নত এবং জনশিক্ষার বাহন হিসাবে এদের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। স্বাধীনতার পর যথেষ্ট বিবেচনার অবকাশ না দিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়কে পাশে সরিয়ে রেখে অর্থপূর্ণ দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় ভাষার নির্দেশ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রাদেশিক অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীগত বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। ভবিষ্যতে হিন্দী ভাষাকে আন্তঃরাজ্য সম্পর্কের বিষয়ে একটি সুস্থ, সহজগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে গড়ে তোলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় নীতি একটি গোষ্ঠীগত মর্যাদার বিশেষ মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করার ফলে একপ্রকার সংহতি রোধক মনোভাবের লক্ষণও উঁকি দিয়েছে। কেন্দ্র যদি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মানসিকতার বাহন হয়ে দাঁড়ায়, আজ নয় কাল তা জাতির সংহতির পক্ষে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। ভাষা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নিদর্শন দেওয়া হয়, কিন্তু বুঝতে হবে রুশভাষা সেখানে অধিকাংশ জনসমষ্টির ভাষা। প্রান্তিকভাষাগুলিকে জারের আমলে উচ্ছেদের সর্বনাশা প্রচেষ্টা চলেছিল—তা বন্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্যা জটিলতর, এখানে কোন ভাষাই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা নয় এবং রাজ্যের ভাষাগুলিও বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী ও শক্তিশালী।

বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অনেক জাতি তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে আবার একই ভাষাভাষী জনগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। বর্তমান বিশ্বে ভাষার ভিন্নতাকে কোনো দেশের জাতীয় সত্তার অন্তরায় হিসাবে দেখলে চলবে না যেখানে জাতিসত্তার অন্যান্য উপাদানগুলি প্রবল এবং জাতিগঠনের স্বপক্ষে।

ভাষার বিষয়ে সকলে যথার্থ কারণেই সুইজারল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সুইসজাতির চারিটি ভাষার মধ্যে প্রধান তিনটি হল ফরাসী, জার্মান ও ইটালীয়। এ সব ভাষা ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালীতে ক্রমোন্নতি লাভ করছে এবং ভাষাগুলির আন্তর্জাতিক মর্যাদা রয়েছে। তবুও এই সব শক্তিশালী ভাষাভাষীর জনগণ একটি জাতিতে পরিণত হবার দৃঢ় মানসিকতা

গড়ে তুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্বার টানাপোড়েনের মধ্যেও নিজেদের সুইসজাতিসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এর কারণ হিসাবে Hans Kohn বলেছেন: 'সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই যে এর একমাত্র কারণ তা নয়, সর্বোপরি রয়েছে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা, সংযত আচরণ আর সদিচ্ছা।"[১৩৯] সুইস মানসিকতার আর একটি নিদর্শন রয়েছে Romansch ভাষার প্রতিষ্ঠায়। এই ভাষা জাতির শতকরা একভাগ লোকের ভাষা। আলপসের পার্বত্য উপত্যকায় এই Romansch ভাষী সম্প্রদায়ের কোন সংগঠিত ভাষা ছিল না। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে হয়েছিল এ ভাষা বুঝিবা লুপ্ত হয়ে গেল কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এ ভাষা তার সজীবতা ফিরে পেল... ভাষাগত জাতিসত্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নূতন উদ্যোগ এক আকর্ষণীয় উদাহরণ এবং তা সুইসজাতির দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।"[১৪০] জাতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করে ১৯৩৮ এর ২০শে ফেব্রুয়ারি জার্মান, ফরাসী, ইটালীয় ভাষার সঙ্গে Romansch ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দান করা হয়।

ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দিতে হবে। ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক জনসমষ্টি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আবার প্রতিটি প্রদেশ তাদের ভাষা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবদানকে মহাভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূর্ণতায় সাহায্য করেছে এবং সমস্ত প্রাদেশিক সত্তা ভারতসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারত পথিক সুভাষচন্দ্রের রংপুর ভাষণের (৩০-৩-২৯) উল্লেখ প্রয়োজন— যার মধ্যে তিনি বলেছেন: "বাংলার একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। বিশ্ব দরবারে শুনাইবার বাঙ্গালীর একটা চিরন্তন বাণী আছে।... বাংলার প্রাণ চায় সর্বদা—বৈচিত্র্যে সমন্বয় ও সাম্য।... রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র রামানুজম, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ কতদিক দিয়া বিশ্বসভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এইসব মহাপুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ সমগ্র ভারতীয় জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের একটা আদর্শ আছে। বাঁচিবার একটা উদ্দেশ্য আছে পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একটা মিশন আছে।" হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র প্রতিটি প্রদেশকে তাদের সাংস্কৃতিক সত্তা পূর্ণতর করে তোলার জন্য ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই স্বাধীনতা ভারতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেছেন: "জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ভাষা ও একটি সাধারণ লিপির প্রবর্তন করতে হবে।

"ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে আরও নৈকট্যের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং

একটি সাধারণ শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমগ্র জনতার মধ্যে এক ঐক্য চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

"রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আমি ভাবতে ইচ্ছা করি হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে পার্থক্য কৃত্রিম। এই দুইটি ভাষার মিশ্রণে একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রভাষা গড়ে উঠবে···এই সাধারণ ভাষা নাগরী বা উর্দু যে-কোনো লিপিতেই লেখা যেতে পারে।"

লিপির বিষয়ে এই ভাষণের মধ্যেই তাঁর মত ব্যক্ত করে বলছেন: "সম্ভবতঃ আমাদের দেশের অনেকে রোমানলিপি গ্রহণের বিষয় শুনে ভীতিবিহ্বল হবেন কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদেরকে এই সমস্যাটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব।···আমি স্বীকার করি এক সময়ে আমি একটি বিদেশী লিপি গ্রহণকে জাতীয়তা-বিরোধী···বলে ভাবতাম কিন্তু ১৯৩৪ সালে তুরস্কে ভ্রমণের পর আমার মত পরিবর্তিত হয়। আমি বুঝলাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমতুল একটি সাধারণ লিপি প্রবর্তনের কত সুবিধা রয়েছে।

···ভারতে শতকরা নব্বই জনেরই অক্ষরজ্ঞান নাই, তাঁরা কোনো লিপির সঙ্গেই পরিচিত নন। সেজন্য কোন লিপি আমরা প্রবর্তন করি সে বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ নাই। উপরন্তু রোমানলিপি একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতেও সাহায্য করবে।"

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসনে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছিল, যার মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও অন্যান্য শিক্ষা দেওয়া হত। প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত রোমান লিপিতে হিন্দুস্তানী ভাষায় সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।[১৪১]

ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাষাগুলির উৎস একটি প্রাচীন ভাষা হওয়ায় অল্পায়াসে সেগুলি বোধগম্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু লিপির স্বাতন্ত্র্য আঞ্চলিক ভাষাসমূহে প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কোনও একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে সে কাজ সহজতর হয়ে জাতীয় সংহতিতে সাহায্য করতে পারে। সুভাষচন্দ্র ভাষার গঠনে একটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মননের ভিত্তি রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের ভিতরে তা গড়ে তোলার সুযোগ ঘটেনি। ভাষার ব্যাপারে গোঁড়া মনোভাব ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তা ছাড়া এর সুযোগে ভাষাভিত্তিক জাতিতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে সুযোগসন্ধানীরা জাতীয় সংহতিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে বিবেচনা-প্রসূত পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে এর সমাধান খুঁজতে হবে যেখানে সঙ্কীর্ণ

আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাবোধের স্থান থাকবে না। একদিন ভারতের অতীত ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির বিপুল অবয়বের একটি ভাষাই ছিল এবং লিপির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে গভীর পারস্পরিকতা রয়েছে সে কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও দূরে থাকতে পারে না। আর বিশাল ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভাষা সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। বলপ্রয়োগ দুর্বলতার স্বাক্ষর বহন করে। জাতিগঠনের আলোচিত উপাদানগুলির গুরুত্ব, ভারতীয় ভাষা ও ঐতিহ্যের বিষয় এবং বর্তমান বিশ্বে ভাষা বিষয়ে জাতীয়তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বিবেচনা করলে ভারতের জাতিসত্তায় ভাষা সমস্যা দুর্লংঘ্য হবে না। জাতীয় ইচ্ছা, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং ইতিহাস চেতনার জাগৃতির মধ্যে সে সমাধানের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বভারতীয় আশা ও চেতনার দ্যোতক ভারতপুরুষের স্বর্ণপরশ পেলে জাতির সর্বাঙ্গীণ জাগৃতির মহাযজ্ঞের আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সমস্যার সমাধান ঘটত। চাকুরি-নীতির বৈষম্য ও হিন্দী ভাষার চাপের ভীতি থাকলে ভাষা সমস্যা জটিলতর হয়ে যাবে। আর একদল নির্বোধ আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠী স্বার্থের বিষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ক্ষিপ্ত করে ভাষাদাঙ্গার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপার নিয়ে জাতীয় সংহতিতে আঘাতের কারণ নাই। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শিক্ষা ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নীতির প্রবর্তন, রাষ্ট্রীয় শুভশক্তির সবল প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি সমবেত ইচ্ছার জাগরণ জাতীয় সত্তার পূর্ণরূপায়ণের প্রয়োজনীয় শর্ত। রাষ্ট্রীয় শক্তির সজাগদৃষ্টি, সবলতা, ন্যায়বিচারে কঠোরতা থাকলে ভাষাদাঙ্গার মতো জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক ঘটনার অবতারণা সম্ভব হবে না।

কিছুদিন আগে ভাষা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে একজন বিশিষ্ট সুভাষবাদী চিন্তাবিদ লিখিত ভাষণের মধ্যে বলেন : "...পরিস্থিতির গুরুত্ব এই অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে পেঁছে দেয় যে ভাষাগত প্রদেশ বিভাগ শুধু যে জাতীয় নেতৃত্বের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে বিচারশক্তির শোচনীয় অভাব সূচিত করে তাই নয়, তা দেশের ঐক্যেরও ক্ষতি সাধন করেছে...। ভাষাগত বিভাগের পরিবর্তে প্রশাসনগত বিভাগের উপর জোর দেওয়া উচিত, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত জীবনধারায় ভাষাকে নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত

স্থান দিতে হবে।"[১৪১] ভাষা জাতিসত্তার সংগঠনে সাহায্য করলেও তা জাতিগঠনের মুখ্য উপাদান নয়। সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "··সাধারণ মানুষের ভিতর শিক্ষা ও আচরণের মাধ্যমে এক-জাতিত্বের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য প্রভৃতি ঐক্যে সহায়তা করে কিন্তু তা ঐক্যসৃষ্টি করতে পারে না।"[১৪২]

সমাজের মধ্যে সামাজিক বিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং আর্থিক বৈষম্যও ভারতের জাতীয়তার পক্ষে বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ করবে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আর্থিকভাবে অনুন্নত শ্রেণীকে অধিকতর আর্থিক সুবিধা দিতে হবে, কিন্তু সামাজিক বিভেদগুলির সমাধান শুধুমাত্র অর্থ-নৈতিকভাবে করা যাবে না। এর জন্য ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ দান ও ন্যায়-নীতির উদার মানসিকতা সৃষ্টির জাতীয় আলোড়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জনতার স্বার্থ থাকবে দেশগঠকদের অন্তরে এবং এর প্রকাশই হবে আর্থিক, সামাজিক ব্যবধান দূর করা, দেশের মানুষকে সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন করা, যার মধ্য দিয়ে জাতীয়তার মূল হবে সুদৃঢ়, জাতীয়তা হবে গণইচ্ছার সংহতরূপ এবং তখনই তা স্বীয় উদ্দেশ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

উপসংহার

ভারতপথিকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি জীবন্ত সত্তা। ভারতীয় সত্তায় অনুসিক্ত বলেই সুভাষচন্দ্রের 'ব্যক্তিস্বরূপ'কে আশ্রয় করে দেশের 'আত্মস্বরূপ' গড়ে উঠুক এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ।[১৪৪]

ভারতবর্ষের অনন্য ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত সমন্বয়ী সত্তাকে সুভাষচন্দ্র কিভাবে দেখেছেন এবং গ্রহণ করেছেন, তা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি সেই ভারত-আত্মার প্রতীক যে-ভারতের অবস্থিতি বিশ্বমানবতার পূর্ণতায় বিশেষ অবদানের প্রতিশ্রুতি বহন করে। তাই তিনি বলেছেন: "ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগৎকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে।"[১৪৫] অন্যত্র বলেছেন: "অবর্ণনীয় দুঃখবেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ তাহার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে।"[১৪৬] একে রূপায়িত করার জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা ও পরে জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশগঠন। সেজন্য

সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আজাদহিন্দ সরকারের অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর ভিতরে বিপুল ফাটল ধরিয়ে দেন, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। জাতীয়তার ভিত্তিতে সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সাম্যভিত্তিক অখণ্ড জাতীয়তার উত্তরণে সুভাষ নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান আদর্শ রেখেছে। অতীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে দেশে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা সুভাষচন্দ্রের আশু লক্ষ্য। আর সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদের ভিত্তিই হল ভারতের জাতীয়তা-বাদ। 'নেতাজীর জীবনবাদ' পুস্তকের রচয়িতা বিদগ্ধ বিপ্লবী অনিল রায় লিখেছেন: "দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) সমাজব্যাখ্যায় অকাট্য সত্য।...ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মূলে রয়েছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। তাই সুভাষচন্দ্র বলেছেন, দেশ-প্রেমের অস্বীকৃতি মার্কসবাদের একটা মারাত্মক ত্রুটি। এই কারণে ভারতবর্ষে এর প্রভাব স্থায়ী হতে পারবে না।"[১৪৭]

ভারতের জাতীয়তাকে সুভাষচন্দ্র অখণ্ড সাম্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যে মণ্ডিত এক আদর্শনৈতিক সত্তা হিসাবে গড়ে তুলেছেন— যা পৃথিবীর কাছে নূতন সাম্য ও সংস্কৃতির আদর্শ তুলে ধরবে। ভারতবাসীকে সেই আদর্শ রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। ভারতবর্ষ হবে নূতন জাতীয়তাবাদের পীঠভূমি যে-জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়ে সাম্যের নূতন মূল্যবোধে অনুসিক্ত অখণ্ড স্বাধীন বিশ্বরচনায় পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

—

সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতা

অখণ্ড বিপ্লবের সংগ্রাম

মুক্ত ভারতের মিশনের যে স্বপ্ন সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন, তাকে রূপায়িত করে তোলার জন্য সেই নিরলস পথিক ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বিগ্ন পরিক্রমা করেছেন এবং অগণিত যুব-ছাত্র সমাবেশে, জনসভায় এবং কংগ্রেস মঞ্চ থেকে উদাত্ত বক্তৃতায়, নূতন দলের সংগঠনের ও কার্যধারার মাধ্যমে, নানা পত্র-পত্রিকায় এবং আত্মচরিত ও চিঠি-পত্রাদি লেখার মধ্যে তাঁর অখণ্ড সাম্যের চিন্তাধারার রূপ দিয়েছেন। ভারতের এই আত্মপুরুষের সে চিন্তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ

১. অবর্ণনীয় দুঃখ-বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে কারণ তার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। স্বাধীন ভারত জগতের শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতাকে দেবে তার নিজস্ব অতুলনীয় অবদান, তাই তার মুক্তিলাভের প্রয়োজন।[১] আর 'ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হবে মানবসমাজের মুক্তি।'[২]

২. রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই শেষ কথা নয়। চাই অখণ্ড স্বাধীনতা ঃ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি।[৩] লক্ষ্য হবে ঃ সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর ভারতবর্ষে এক নূতন সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠন। তা সম্ভব হবে একটি সাম্যবাদী অর্থাৎ সমন্বয়বাদী দলের মাধ্যমে, যে দল যুব-ছাত্র, নারী, শ্রমিক, কৃষাণ ও অনুন্নত শ্রেণীর ভিতরে ব্যাপক কাজ করবে।[৪] সমাজে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার এবং আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির প্রবর্তন করতে হবে।[৫]

৩. অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে ভারতের নূতন প্রগতির দর্শন। অতীতের ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।[৬] সেজন্য জাতীয়তাবাদের অনুশীলন প্রয়োজন, যে জাতীয়তাবাদ হবে আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপূরক। আমরা সত্য আন্তর্জাতিকতা ও মিথ্যা

আন্তর্জাতিকতার প্রভেদ বুঝি, আমরা জানি সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে না বরং জাতীয়তাবাদই যার ভিত্তি।[৭] ভারতবর্ষেই রচিত হবে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়, যা হবে বিশ্বের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ।[৮]

৪. কিন্তু এই আদর্শ রূপায়ণের পথে প্রথম বাধা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি। সেজন্য প্রয়োজন তার আশু অপসারণ। অহিংস উপায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে বিদূরিত করা যাবে না। তার জন্য চরম আঘাত হানতে হবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই ত্রিপুরী কংগ্রেসের ভাষণে তিনি বৃটিশকে চরম পত্র দেবার প্রস্তাব করেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের জনতা এক পতাকাতলে অপূর্ব অহিংস-অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে আঘাত দিতে পেরেছে। কিন্তু বৃটিশ শক্তিকে উচ্ছেদ করতে হলে এই অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে।[৯] কিন্তু বৃটিশের শ্যেনচক্ষুর অন্তরালে ভারতে ব্যাপক ও পূর্ণ সশস্ত্র সংগঠন সম্ভব নয়। সেজন্য বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনের মাধ্যমে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সৃষ্টি করে ভিতরের সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। ভিতরে বাইরে এভাবে আক্রান্ত হয়ে বৃটিশ ভারত ত্যাগে বাধ্য হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নেতাজীকে এই দ্বিতীয় ফ্রন্ট সৃষ্টির সুযোগ এনে দেয়। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরে নেতাজীর ৯ই জুলাই ('৪৩)-এর ভাষণ প্রণিধানযোগ্য। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে নেতাজী বলেন: "যদি ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের দ্বারা আদৌ স্বাধীনতালাভ সম্ভব হত তা হলে আমি এই বন্ধুর পথ বেছে নিতাম না। সংক্ষেপে বলতে পারি, আমার ভারত-ত্যাগের উদ্দেশ্য ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাইরে থেকে সাহায্য করা।

"স্বদেশবাসী ভারতীয়গণ দ্বিতীয় রণাঙ্গন কামনা করছেন। আপনারা সমগ্র ধনবল, জনবল আমার হাতে অর্পণ করুন আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করব—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"[১০]

আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের মাধ্যমে নেতাজী-পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাদ্ভূমিতে রয়েছে ভারতপথিকের অখণ্ড মুক্তির অর্থাৎ আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির দর্শন। ডঃ কে. কে. ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তকে বলেছেন:

"Indeed his leadership was many dimensional...the great-

ness of it lies in its rare ability to visualize a politico-economic ideology for the revolt while in the thick of the fight."[১১]

অবশ্যই তাঁর নেতৃত্ব ছিল বহুমাত্রিক… নিবিড় যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের একটি রাষ্ট্রিক আর্থিক দর্শন রচনার বিরল ক্ষমতার মধ্যে সেই নেতৃত্বের মহানতা নিহিত রয়েছে।

নেতাজীর সংগ্রাম এক আদর্শবাদী জীবন-বিপ্লবীর সংগ্রাম। এ সংগ্রাম যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তেমনি তা ভারতীয় ঐতিহ্যে মহীয়ান এক সাম্যবাদী আদর্শ রূপায়ণের সংগ্রাম যার ফলশ্রুতি হবে নূতন ভারতীয় সমাজ সংগঠন ও বিশ্বসভ্যতাকে ভারতীয় অবদানে মহত্তর করা। নেতাজীকে তাই শুধু বীর হিসাবে মাল্যদানের দ্বারা কর্তব্য সমাধা করলে তা হবে নিদারুণ জাতীয় প্রবঞ্চনা। এরূপ একপেশে খণ্ডিত মূল্যায়নে আমরা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করব এবং এক মহান এবং সামগ্রিক আদর্শের অনুশীলন থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিবৃত্ত রাখতে সাহায্য করা হবে। নেতাজীর আদর্শ অর্থাৎ ভারতের ঐতিহ্য-মণ্ডিত জাতীয়তার অখণ্ড সাম্যের দর্শন ধরেই ভারতবর্ষকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি সে পথে বাধার সৃষ্টি করি— ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের নির্বোধ বলে ধিক্কার জানাবে।

পন্থার দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বিপ্লবের দর্শনের সঙ্গে জাতির জনক গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বিভেদ ঘটে। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ পন্থা এক বৈপ্লবিক অবদান। গান্ধীজীর ডাকে এই অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতের শহরে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে এনে দেয় ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা। ভারতব্যাপী এই আন্দোলনগুলির ফলে মুক্তি-সংগ্রামের নূতন দিগন্ত রচিত হয়। ১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী বলেছিলেন: "ভারতের হাতে যদি আজ তলোয়ার থাকত, তবে সেই তলোয়ার হাতেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত।… অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব শুরু করা যখন বর্তমানে সম্ভব নয়, তখন আমাদের দেশের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ।"[১২]

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারলেও অস্ত্রবলে বলীয়ান বৃটিশ শক্তির বিতাড়নে সে পন্থার সীমাবদ্ধতা

ছিল। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন গণচেতনার উন্মেষের পরে এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু অহিংসা, জাতীয় কংগ্রেসের নীতি হলেও গান্ধীজীর জীবনে তা জীবনবেদের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯-এর মার্চে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করেন। তা অবশ্য মেনে নেওয়া হয়নি। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অতঃপর দীর্ঘ পত্রালাপ হয়। গান্ধীজী তাঁর ২রা এপ্রিল ('৩৯)-এর চিঠিতে বলেন ঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের কংগ্রেস কিছু করতে পারবে না ; বলার মতো কোনো প্রকার সত্যাগ্রহেও নামতে পারবে না।"[১৩] ১০-৪-৩৯ তারিখের চিঠিতেও বলেন ঃ "আমি আবার বলছি চারিদিকে হিংসার আবহাওয়া, অহিংস আন্দোলনের কোনো পরিবেশ দেখছি না।"[১৪] সুভাষচন্দ্র তাঁর ১৩-৪-৩৯-এর লেখা উত্তরে বললেনঃ "চরমপত্র এবং স্বরাজ আন্দোলনের জন্য আমার প্রধান প্রস্তাব ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে - তাতে আমি অভিযোগ করি না। গণতন্ত্রে এমন বিলম্ব অন্তর্নিহিত থাকে। আমি বিশ্বাস করি আমার প্রস্তাব সঠিক এবং কংগ্রেস একদিন তা বুঝবে। আমি আশা করব সে বোঝা যেন খুব দেরিতে না হয়।

'আমি মনে করি কংগ্রেসে দুর্নীতি বাড়লেও আমরা জাতীয় সংগ্রামে অসমর্থ নই।"[১৫]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের আকাশে তখন যুদ্ধের কালোমেঘ ঘনিয়ে আসছিল, সুভাষচন্দ্র তা বুঝেছিলেন এবং তার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি-কল্পে কংগ্রেসের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিলেন। গান্ধীজীকে লেখা সুভাষচন্দ্রের ২০ এপ্রিলের ('৩৯) চিঠিতে জানা যায় জওহরলালজীও তদানীন্তন পরিস্থিতির বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনান্তে সহমত পোষণ করছিলেন।[১৬] কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সুভাষচন্দ্রকে এপ্রিলের ('৩৯) শেষে পদত্যাগ করতে হয়। এই সময় গান্ধীজী, জওহরলালজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয় কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যবোধ হারাননি। তাঁর পদত্যাগের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে (সুভাষচন্দ্রকে) লেখেন ঃ "কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তুমি যে মর্যাদাবোধ এবং ধৈর্যের নিদর্শন রেখেছ তাতে তোমার নেতৃত্ব আমার প্রশংসা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। বাংলাকে তার আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ ত্রুটিহীন সৌজন্যবোধ এখনও রক্ষা করতে হবে যাতে তোমার আপাত পরাজয় স্থায়ী বিজয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।"[১৭]

মে মাসেই স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পথে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম হয়েছিল। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেসকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করা। আগস্ট '৩৯ এ দশবৎসর মেয়াদী রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ৩-৯-৩৯ তারিখে ফ্রান্স ও ইংলন্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিকক্ষেত্রে চিন্তার বিপুল পরিবর্তন ও নূতন মূল্যায়ন হতে থাকে। ১৭-১০-৩৯ এ ভাইসরয় বলেন ঃ "স্বায়ত্তশাসন দানই বৃটিশ নীতি কিন্তু বর্তমানের জন্য ১৯৩৫-এর আইনই বলবৎ থাকবে।"[১৮] ৮ই সেপ্টেম্বর ('৩৯) নেহরুজী চীনদেশ থেকে ফিরে বললেন ঃ "আমরা সমস্যাটিকে এমনভাবে দেখছি না যাতে বৃটিশের বিপদে সুযোগ নেওয়া যায়। .. একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে ফ্যাসীবাদ ও আক্রমণাত্মক সংগ্রামের মধ্যে অনিবার্য ভাবে আমাদের সহানুভূতি অবশ্যই থাকবে গণতন্ত্রের দিকে। .. আমি ইচ্ছা করি ভারত এতে তার পূর্ণ অংশ নিক এবং এই সংগ্রামে এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তার সমস্ত সম্পদ-শক্তি নিয়োগ করুক।"[১৯] কিন্তু এই উক্তি বিভ্রান্তিকর কারণ হরিপুরা (ফেব্রুয়ারি '৩৮) ও ত্রিপুরী (মার্চ '৩৯) কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে বৃটিশের বৈদেশিক নীতিকে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তার জন্য ভারতীয় জনশক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অক্টোবর '৩৯-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বললেন যে ভাইসরয়ের উক্তি পুরাতন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই পুনঃপ্রচার মাত্র এবং সেজন্য কমিটি গ্রেট বৃটেনকে সহায়তা করতে অক্ষম।[২০] ২২-১০-৩৯ তারিখে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে অধিষ্ঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানালে তাঁরা ১৫-১১-৩৯-এর মধ্যে পদত্যাগ করেন। আশা করা গিয়েছিল কংগ্রেস এরপর আন্দোলনে নামবে কিন্তু তা ঘটল না। সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের ফ্রন্ট গঠন করে আন্দোলনে উদ্যোগী হলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ মনোভাবের আশঙ্কায় অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি ফ্রন্ট থেকে সরে পড়ে। তারা কংগ্রেস-নিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হতে অস্বীকার করে এবং এরূপ আন্দোলন আরম্ভ হলে তাকে সরাসরি বাধা দেওয়ার ভয় দেখায়।[২১] সুভাষচন্দ্র তখন অদম্য দৃঢ়তায় ভারতবর্ষময় আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য দশ মাসের মধ্যে প্রায় এক হাজার সভায় বক্তৃতা করেন।[২২] মাদ্রাজের সমুদ্রসৈকতে দুলক্ষ লোকের এরূপ এক সমাবেশে যেদিন সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করছিলেন— সেদিন ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর ('৩৯), ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ

ঘোষণার দিন। কংগ্রেস ও তথাকথিত বাম-পন্থীদের বিরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র তাঁর সংগ্রামী অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সভা হল। এরপর ঐতিহাসিক রামগড়ের সভা (মার্চ ১৯৪০) যেখানে কংগ্রেস সভার পাশাপাশি স্বতন্ত্র সভায় সুভাষচন্দ্র আপসবিরোধী সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। সকলে অবগত আছেন আপসবিরোধী সভা কংগ্রেস সভার তুলনায় বিশালতর আকার ধারণ করেছিল। রামগড় কংগ্রেস মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে প্রস্তাব নেয়ঃ "পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে ন্যূনতর কিছু ভারতের জনগণ গ্রহণ করবে না।"[২৩] কিন্তু এই কংগ্রেসে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী রাখা হল না। কংগ্রেসের 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার সুযোগে বৃটিশ সরকার তার যুদ্ধ প্রয়াসে ভারতের শোষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ৬ই এপ্রিল '৪০ থেকে সারা ভারত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের অনেক নেতা ও কর্মী বন্দী হন। সুভাষচন্দ্র আবার মহাত্মাজীকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। জুন '৪০-এ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মাজীর অনেক আলাপ-আলোচনা হয়— তিনি তখনও বলেন সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নয়, এবং তাড়াহুড়া করে কিছু করলে তা দেশের পক্ষে শুভ হবে না। সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ "যাহা হউক দীর্ঘ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার শেষে তিনি লেখককে (সুভাষচন্দ্রকে) বলেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহার (লেখকের) প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে তাঁহার (গান্ধীজীর) অভিনন্দন তার-বার্তাই তিনি প্রথমে লাভ করিবেন।"[২৪] জুলাই '৪০ এ কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চরমে উঠলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনেক সহকর্মীকে বন্দী করা হয়। ১০ মে ('৪০) চার্চিল বৃটেনে প্রধানমন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন। ২০মে ('৪০) তারিখে নেহরুজী এক বিবৃতিতে বলেনঃ "বৃটেন যখন মরণপণ সংগ্রামে রত সেইসময় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হবে।"[২৫] অনুরূপভাবে মহাত্মাজী বলেনঃ "বৃটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীনতা চাহি না। উহা অহিংসার পথ নহে।"[২৬] ২২ জুলাই ('৪০) তিনি হিটলারের কাছে চিঠিতে তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন এবং বৃটিশ জনগণের উদ্দেশে দুটি চিঠিতে আত্মিকশক্তি দিয়ে হিটলারের প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানান। এই সময় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটে। আজাদ বলেনঃ "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শান্তিবাদী প্রতিষ্ঠান নয়, এর উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা

অর্জন।...অনন্যোপায় হলে ভারতবাসীদের তলোয়ার হাতে নেবার অধিকার আছে।"[২৭] কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এও ছিল কথার কথা। কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর অন্য বিষয়েও মতপার্থক্য ছিল— তাঁরা শর্তসাপেক্ষে মন্ত্রীসভায় যোগদানে সম্মত ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন এর বিরুদ্ধে। ২৭শে জুলাই ('৪০) পুণায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজী যোগদান করেন নি। এই সভায় কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করে, শর্ত— স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে হবে বৃটেনকে। কিন্তু যেহেতু কোন যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করাও অহিংসার পথ নয়, সেইহেতু মহাত্মাজীর পক্ষে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো পক্ষাবলম্বন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। অহিংসার প্রতি সত্যনিষ্ঠার তাগিদে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবের ব্যাপারে বড়লাটের ৮-৮-৪০ এর উত্তরে কিছুই মিলল না।[২৮]

জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র যখন বন্দী হলেন, দেশে তখন আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। অশান্ত যুবসমাজ আন্দোলন চাইছেন। কংগ্রেস তখন (১৫ই সেপ্টেম্বর '৪০) বৃটিশকে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে মহাত্মাজীকে আবার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। ১৭-১০-৪০ থেকে প্রতি-নিধিমূলক সত্যাগ্রহ শুরু হয়। কিন্তু তার ব্যাপকতা ছিল সীমাবদ্ধ। যাই হোক, গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গে প্রায় ৬০০ জন কর্মী ও নেতা বন্দী হলে দেশে আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টি হতে থাকে কিন্তু ১৭-১২-৪০ তারিখে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেন। ৫-১-৪১ তারিখে আবার সত্যাগ্রহ শুরু হয় এবং প্রায় ২০,০০০ ব্যক্তির কারাদণ্ড হয়। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "১৯৪১ সাল-ব্যাপী চলিল আইন অমান্য আন্দোলন। কিন্তু গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষ হইতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেল না। মহাত্মার ধারণা ছিল যে নরমনীতি অনুসরণ করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত আপসের দরজা উন্মুক্ত করিবেন কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন। তাঁর ভালোমানুষী দুর্বলতা বলিয়া ভুল করা হইল এবং বৃটিশ গভর্নমেন্ট যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়া চলিল।"[২৯] কয়েকজন বামপন্থী নেতার আচরণও বৃটিশকে ভারত শোষণে সহায়তা করেছিল।[৩০] ওদিকে জেলে বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র নানা চিন্তাভাবনায় সিদ্ধান্ত নিলেন— বৃটিশ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা অর্পণ করবে না, সেজন্য এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া উচিত। তিনি জেলের বাইরে

আসার জন্য সরকারকে চরমপত্র দিয়ে আমরণ অনশন শুরু করলে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। তিনি সেখানে প্রায় ৪০ দিন অবস্থানের সময় অন্তর্ধানের প্রস্তুতি করছিলেন। ১৭ই জানুয়ারি ('৪১) পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে বৃটিশ পুলিসের পাহারা ফাঁকি দিয়ে গৃহত্যাগ করেন। সমস্তপ্রকার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি কলকাতা থেকে গোমো হয়ে পেশোয়ারে পেঁছান, সেখান থেকে জামরুদ অতিক্রম করে আসেন গারহিতে এবং পায়ে হেঁটে ভারতের সীমান্ত পার হয়ে কাবুলে উপনীত হন। তার পর একটি ইটালীয় পাসপোর্টের সাহায্যে মস্কো হয়ে ২৮শে মার্চ ১৯৪১, বার্লিনের দিকে যাত্রা করেন। জাপান তখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি।

প্রথম অন্তর্ধানোত্তর পরিস্থিতি

সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পেঁছুলে রিবেনট্রপ তাঁকে সংবর্ধনা জানান। সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে তাঁর সংগ্রামী আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। ২২-৬-৪১ তারিখে জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করে। সুভাষচন্দ্র এর বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।[৩১] যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

আগস্ট '৪১-এ বৃটিশ ও আমেরিকা আটলান্টিক চার্টারে ঘোষণা করে: "প্রত্যেক জাতির স্ব-নির্বাচিত সরকার গঠনের অধিকারের প্রতি তাঁদের স্বীকৃতি আছে।··· তাঁরা ইচ্ছা করেন যে-সব জাতিকে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং স্বাধীন সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদেরকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।"[৩১]

৯ই আগস্ট ('৪১) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হাউস অব কমন্সে বলেন যে আটলান্টিক চার্টার ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কংগ্রেস তখন বলতে লাগল— বৃটিশের অসাধুতা এখন খুব প্রকট হয়ে উঠেছে।[৩৩]

নভেম্বরে দূর প্রাচ্যে তখন যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ডিসেম্বর '৪১-এ বৃটিশ সরকার গান্ধীপন্থীদের জেল থেকে মুক্তি দেয় কিন্তু শরৎ বসু, শার্দুল সিংহ প্রমুখ জাতীয় বামপন্থী নেতাদের কারারুদ্ধ করে। সরকার সম্ভবত ভাবল, বামপন্থীদের গ্রেপ্তার ও গান্ধীপন্থীদের মুক্তিদান— এই দ্বৈতনীতি অবলম্বন করে কংগ্রেসের সঙ্গে তারা একটা আপস মীমাংসায় উপনীত হবে।[৩৪]

৭ই ডিসেম্বর '৪১-এ জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। এই

মাসেই আমেরিকাও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলি এই সময় বলতে শুরু করে—পাকিস্তানই তাদের বাঁচার পথ—সেজন্য পাকিস্তানই তাদের লক্ষ্য— ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা অর্জিত হবে।

১৫-২-৪২-এ সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। রুজভেল্ট, চিয়াং কাইশেক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৃটিশকে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা রফা করার কথা বলেন।

চার্চিল উত্তরে বলেন যে সৈন্যবাহিনীর ও স্বেচ্ছাসেবীদের ৭৫% মুসলিম, মাত্র ১২% কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল। সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক মিলছে কারণ ভারতে ১০ কোটি মুসলিম, ৩।৪ কোটি অস্পৃশ্য এবং রাজন্য-বর্গের অধীনে আরও ৮ কোটি লোক রয়েছে। এদের সকলের স্বার্থই দেখতে হবে। সেজন্য ভারতে এখন কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা উচিত হবে না।[৫৫] ৭-৩-৪২ এ রেঙ্গুনের পতন ঘটল। ওদিকে বার্লিন থেকে নেতাজীর উদাত্ত আহ্বান শোনা গেল। ১১-৩-৪২ তারিখে চার্চিল ক্রিপ্‌স মিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন।

এ সময় সুভাষপন্থীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও রায়পন্থীরা প্রচারপত্র এঁটে দেন 'Shoot them': বৃটিশরাজের পৃষ্ঠপোষক তখনকার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ১৩ই মার্চ '৪২-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'Fascists in India'তে কমিউনিস্টদের প্রশংসা করে, সুভাষপন্থীদের 'Fascist' আখ্যা দেয় এবং তাদেরকে বন্দী করে হত্যা করার জন্য সরকারকে প্ররোচিত করে। অবশ্য 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদিকা লীলা রায় এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন 'We Shall Not Stand It' প্রবন্ধে যা 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় ১৯ থেকে ২১শে মার্চ ('৪২) প্রকাশিত হয়।[৫৬]

২৮ থেকে ৩০ মার্চ ('৪২) টোকিয়োতে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নেতাজীকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু জার্মানী থেকে হঠাৎ টোকিয়ো আসা সম্ভব ছিল না। এদিকে ক্রিপ্‌স-দৌত্য ব্যর্থ হলে গান্ধীজীর মতের পরিবর্তন ঘটে। ১৯-৪-৪২ তারিখে গান্ধীজী 'হরিজনে' এই মর্মে লেখেন যে বৃটেন ও ভারত উভয়ের স্বার্থে বৃটিশের ভারত ত্যাগ করা উচিত। সে ক্ষেত্রে জাপান আর ভারত আক্রমণ করবে না। জওহরলালজী ব্যতিরেকে কংগ্রেসের অনেক নেতাও এই মত পোষণ করতে লাগলেন। নেহরুজীর মতে ভারতের উচিত ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সহযোগিতা করা।[৫৭]

জুন '৪২এ গান্ধীজী মৌলানা আজাদকে বলেন: "জাপানী সৈন্য যদি

আদৌ ভারতে প্রবেশ করে তবে তারা আমাদের শত্রু হিসাবে নয়, বৃটিশের শত্রু হিসাবেই প্রবেশ করবে।"[৩৮] তিনি আরো বলেন যে যদি বৃটিশ এখনই ভারত ত্যাগ করে তা হলে তাঁর বিশ্বাস জাপানীদের ভারত আক্রমণের কোন কারণ থাকবে না।[৩৯] বৃটিশের চাতুর্যে বিড়ম্বিত হয়ে ৭ই জুন ('৪২) গান্ধীজী বললেন : "আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমাকে এইভাবে অপেক্ষা করতে হলে সম্ভবতঃ অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।"[৪০]

১৫ থেকে ২৩ জুন('৪২) রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দী প্রতিনিধিগণ ব্যাঙ্কক কনফারেন্সে মিলিত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ (Indian Independence League) ও আই. এন. এ. (Indian National Army) গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আই. এন. এ. সংগঠিত হয়।[৪১] ১৪-৭-৪২ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজী এই সময় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি সাক্ষাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ২২-৭-৪২ এ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে সরকার মুক্তিদান করেন। ৮ই আগস্ট সারাভারত কংগ্রেস কমিটি (A I C C) কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং ৯ই আগস্ট '৪২ আন্দোলন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী, নেহরুজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বন্দী হন। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং তা দ্রুত হিংসাত্মক রূপ নেয়। এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ সহিংস আন্দোলনের কর্মপন্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন এবং সমাজতন্ত্রী অনেক নেতা ও কর্মী নেপাল থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। জয়প্রকাশজী কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কমিটি গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। কমিটি বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে এবং নেপালে 'আজাদ দস্তা' বা গেরিলা দল গঠন করে। ১৯৪৩-এর মে মাসে জয়প্রকাশজী হনুমাননগর জেলে বন্দী হলে একদল বিদ্রোহী জেল ভেঙে তাঁকে ও অন্যান্য ৬ জনকে মুক্ত করেন। তিনি অতঃপর কলকাতার দিকে রওনা হন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন কিন্তু ১৮ই ডিসেম্বর ('৪৩)-এ ধৃত হন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী হবার অব্যবহিত পরেই জিন্না একটি বিবৃতিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মুসলিম জনতাকে আগস্ট বিপ্লবের সম্পূর্ণ বাইরে থাকতে অনুরোধ জানান।[৪২]

পূর্ব দিগন্তে ঊষার অরুণিমা

দেশ যখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন নেতাজী তখন অশেষ অধীরতায় ৮-২-৪৩এ জার্মান ইউ বোটে জার্মানী ত্যাগ করেন ও পরে জাপানী সাবমেরিনে শত্রু-অধ্যুষিত ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সুমাত্রায় পৌঁছান। সেখান থেকে জাপান হয়ে ২-৭-৪৩ সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেন। ৪ঠা জুলাই ('৪৩) রাসবিহারী বসু ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সমস্ত ভার তাঁর হাতে অর্পণ করেন। মোহন সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত আই. এন. এ. তখন ভেঙে গিয়েছিল। নেতাজী নূতন করে আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করলেন। অতি দ্রুত আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঝাঁসির রানী বাহিনী, বালসেনা, আত্মঘাতী স্কোয়াড সংগঠিত হল। ২১শে অক্টোবর '৪৩ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে নয়টি রাষ্ট্র সেই নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ২৩শে অক্টোবর ('৪৩) তারিখেই আজাদ হিন্দ সরকার বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই সরকারের পরিচালনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ফেব্রুয়ারির ('৪৪) মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। নেতাজী তখন ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে জোরদার অন্তর্বিপ্লব চালিয়ে যাবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। বৃটিশ-বিতাড়নের জন্য এই ছিল নেতাজীর পরিকল্পিত পন্থা। ১৮ই মার্চ ('৪৪) আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং এই মাসেই কোহিমা অধিকার করে। এপ্রিল মাসে ('৪৪) ফৌজ ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হয়; নাগারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। ৬ই জুলাই ('৪৪) নেতাজী বেতার ভাষণের মাধ্যমে গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। দেশে তখন আন্দোলন স্তিমিতপ্রায়। বর্ষার আগমন ও অন্যান্য নানা কারণে জুলাই-এর শেষ থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে হয়। তখন বর্মার অভ্যন্তরে রণাঙ্গন স্থানান্তরিত হয়।

নভেম্বর ('৪৪)-এ নেতাজী জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য টোকিয়ো যান। তদানীন্তন জাপানী প্রধানমন্ত্রী কাইসো ঘোষণা করেন: 'ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর জাপানের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই এবং প্রতিদানেও জাপান কিছু চায় না। জাপানের সংস্কৃতির জন্য ভারতের কাছে তাঁরা যুগ যুগ ধরে ঋণী।"[৪৫]

এই সময়ে (নভেম্বর '৪৪) টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাজী একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের মধ্যে তিনি বলেন: "মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসীর এমন কি গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা

মৃত নয়-- বর্তমানেও তা সজীব। অতীত ভারত বেঁচে আছে, বর্তমানে ভবিষ্যতেও থাকবে।

"...অতীত পটভূমি থাকা সত্ত্বেও আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম।

"বর্তমান ভারত... তার প্রাচীন ইতিহাস বৃটিশ-বিরোধী অবিরাম জাতীয় সংগ্রাম ও অন্যান্য বৈদেশিক প্রভাবের মিলিত ফলশ্রুতি।

"...আমরা চাই এক আধুনিক ভারত, অবশ্য অতীতের উপর যার ভিত্তি থাকবে।

"...ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব থেকে বড় কাজ হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংগঠন। সেজন্য আমাদের আধুনিক যুদ্ধোপযোগী শিল্প গড়ে তুলতে হবে ; এর অর্থ হল শিল্পোন্নয়নের জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ।

"আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটলে পরবর্তী জরুরি কাজ হবে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান।

"স্বাধীন ভারতের তৃতীয় কাজ হবে শিক্ষাবিস্তার।

"ভারতের জনমত কোনো প্রকার সমাজবাদী পন্থার পক্ষে।... সরকারই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।"

নেতাজী আরও বলেন : "যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বলা বোকামি হবে— কোনো একটি পদ্ধতি মানবপ্রগতির শেষ ধাপ। দর্শনের ছাত্র হিসাবে আপনারা স্বীকার করবেন যে মানবপ্রগতি কখনও থামতে পারে না এবং পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নূতন পদ্ধতি তৈরি করব। সেজন্য আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সাধন করে তাদের ভালো দিকগুলি তাতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব।

"ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি বিধানে সক্ষম হলেও তা ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে পারে নি।

"অন্যদিকে কমিউনিজমের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত পদ্ধতি পরীক্ষা করা যাক। আপনারা এতে এক বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করবেন, তা হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজম যেখানে দুর্বল তা হচ্ছে— কমিউনিজম জাতীয় প্রবণতার কোন মূল্য দেয় না। আমরা ভারতবর্ষে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে

জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়, আজকের জার্মানীতে ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্টরা যে জিনিসটি অর্জন করতে পারে নি।

"...সেজন্য ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবার চেষ্টা করবে।"[৭১]

নভেম্বর '৪৪-এর শেষেই নেতাজী জাপান থেকে সাংহাই, তাইহোকু হয়ে এলেন সাইগনে। সেখানে এক জনসভায় বলেন: "আপনারা হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান যাই হন, বৃটিশভারতের বা ফরাসীভারতের অধিবাসীই হন— সকলে আপনারা ভারতীয়। ভারত স্বাধীন হবার পর এসব বিভেদ আর থাকবে না।"[৭২]

জানুয়ারি '৪৫-এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নেতাজী রেঙ্গুনে উপনীত হলেন।

লাঞ্ছিত প্রত্যাশা

২৭শে জুলাই ('৪৪)-এ গান্ধীজী ভাইসরয়ের কাছে আবার প্রস্তাব পাঠান-- তিনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দিতে পারেন - সরকার যদি স্বাধীনতার ঘোষণা জারী করেন এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ভাইসরয় এই প্রস্তাব যথারীতি প্রত্যাখ্যান করেন। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গান্ধীজীর সম্মতি নিয়ে জিন্নার সঙ্গে পাকিস্তান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন যাতে একটা আপসে পৌঁছানো যায়। কিন্তু জিন্না তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন 'পঙ্গু' এবং 'পোকা-খাওয়া' পাকিস্তান তিনি চান না। তবুও গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে স্বীকৃত হন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "গান্ধী-জিন্না আলোচনা ৯ই সেপ্টেম্বর '৪৪-এ শুরু হয়ে ২৭ তারিখ পর্যন্ত চলে কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারেন নি। গান্ধীজী হিন্দুস্থান, পাকিস্তান বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে '৪৭-এ গৃহীত পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল না। মতভেদের প্রধান বিষয় ছিল এই যে মুসলমানগণ ভারতের স্বতন্ত্রজাতি ও সেজন্য তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র চাই— গান্ধীজী জিন্নার সে মত মেনে নিতে পারেননি। গান্ধী-জিন্না আলোচনার ফল হল দুটি: প্রথমতঃ এতে জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি হল যা তাঁরা সে সময় আকাঙ্ক্ষা করছিলেন।...দ্বিতীয়তঃ ভাইসরয় বুঝলেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মীমাংসা সম্ভব নয়। এর ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামো তৈরি করতে সচেষ্টা হন।"[৪৬]

শেষ উপায়ের ইঙ্গিত

৭ই মে ('৪৫) জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। ১৪ই জুন লর্ড ওয়াভেল সিমলা কনফারেন্সের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৫ই জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। নেতাজী ইতিমধ্যে বর্মা ত্যাগ করে মালয়ে নাগরের নেতৃত্বে গঠিত তৃতীয় ডিভিসন ফৌজী সংগঠন পরিদর্শনে যান। বর্মা ত্যাগের সময় স্থানীয় আজাদ হিন্দ ফৌজকে বলেন : "ইম্ফল ও বর্মায় মুক্তিসংগ্রামে প্রথম রাউন্ডের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে কিন্তু এটা প্রথম রাউন্ড মাত্র, আমাদের এখনও অনেক রাউন্ড যুদ্ধ করতে হবে।

"...মন্ত্রীমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের পরামর্শে আমি বর্মা ত্যাগ করছি যাতে অন্যত্র মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি।

"...আমি আবেদন করছি আমার মতো আশাবাদ পোষণ করুন আর বিশ্বাস করুন— উষার আগে আসে ঘনতম তমিস্রা, ভারতবর্ষ মুক্ত হবে, শীঘ্রই হবে। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।"[৭৭]

ওয়াভেল-প্রস্তাবে গভর্নর জেনারেলের অধীনে একটি এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল (Executive Council) গঠনের উল্লেখ ছিল। সকল দলের সঙ্গে আপসে গঠিত এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ছিল, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা ও নূতন সংবিধান রচনা সাপেক্ষে বৃটিশ-ভারতীয় সরকারের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কার্যাবলীতে সাহায্য করা এবং সংবিধান রচনার উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করা।

নেতাজী ১৮ই থেকে ২১শে জুন ('৪৫) সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন জানিয়ে ওয়াভেল-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বলেন এবং জনগণের প্রতি আবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করার আহ্বান জানান। তাঁর উক্ত বেতার ভাষণগুলিতে বলেন: "লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা আমি শুনেছি।...বৃটিশ চায়—দূর প্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের যুদ্ধের জন্য ভারতীয় রক্ত ও অর্থ এবং এর জন্য একটা নূতন পরিকল্পনা যার মধ্য দিয়ে ভারতের সহযতা পাওয়া যেতে পারে।... ওয়াভেল-প্রস্তাব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সেরই প্রস্তাব— একটু অন্যভাবে সাজানো। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের রক্ত ও সম্পদ বিনষ্টিতে সাহায্য করা হবে। এতে পাঁচলক্ষ ভারতীয় প্রাণ বলি দিতে হবে। ...ভারতের কোনো জাতীয়তাবাদী এ প্রস্তাব গ্রহণের কথা ভাবতে পারেন বলে আমি কিছুতেই ধারণা করতে পারি না।... বৃটিশ সরকার আলোচনার জন্য

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিয়েছে কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত না হলে '৪২-এর আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হবে না।… এই যুদ্ধে বৃটিশ আমেরিকার কাছে তাদের যুদ্ধপূর্ব বাজার হারিয়েছে সেজন্য শিল্পসংস্থা চালনার জন্য তাদের জনবল প্রয়োজন। কিন্তু দূরপ্রাচ্যে দীর্ঘযুদ্ধ পরিচালনা এবং নিজের দেশে শান্তি-কালীন শিল্পোৎপাদন বাড়ানো—এই দুই কাজ একসঙ্গে করা যায় না।… আমরা যেন ভুলে না যাই—যে মুহূর্তে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে আপস ঘটবে সেই মুহূর্ত থেকেই ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।…সোভিয়েত রাশিয়া বা অন্য কোনো বৈদেশিক শক্তির পক্ষে ভারতের জন্য কোনোরূপ সাহায্য করা সম্ভব হবে না।…আপসের কথা চিন্তা করবেন না।… ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজনীতিতে যাই ঘটুক ভারতের জয়লাভ সুনিশ্চিত।… এই সন্ধিক্ষণে কোনো ভুলপথে পরিচালিত হয়ে ভারতবর্ষের ক্ষতি সাধন করবেন না…।

"ভারতবাসী ভ্রাতা, ভগিনীগণ! এই সন্ধিক্ষণে ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের উপর নির্ভর করছে। এখনই আপনাদের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করার সময়। এই আন্দোলন হলে আপসের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে।"[৪৮]

২৫শে জুন ('৪৫) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সিমলা বৈঠকে যোগ দেন। গান্ধীজী এই বৈঠকে যোগ দেন নি সেজন্য নেতাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। জিন্না দাবি করছিলেন, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে সমস্ত মুসলিম সদস্যরাই হবে মুসলিম লীগের। এ দাবির মীমাংসা না হওয়ায় বৈঠক পণ্ড হয়। কিন্তু লীগের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

২৬শে জুন ('৪৫) বেতার ভাষণে নেতাজী বলেন: "আমি জেনেছি… কিছু সংখ্যক নেতা আপসের বিরোধিতার জন্য আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ‥এই নেতারাই জাপানের সাহায্য গ্রহণের জন্য আমায় গালিগালাজ করেন। জাপানের সাহায্য গ্রহণে আমার লজ্জার কিছু নাই। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকারই আমার সঙ্গে জাপানের সহযোগিতার ভিত্তি। তারা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু যাঁরা এখন বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতে চান তাঁরা ভারতে বৃটিশ ভাইসরয়ের অধীনে কয়েকটি পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত।" এই ভাষণে নেতাজী আরো বলেন: "…আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রশিক্ষণ দেয় ভারতীয়রা এবং ভারতীয় ভাষায়। এই ফৌজ ভারতের পতাকা বহন করে, এবং জাতীয় শ্লোগান উচ্চারণ করে। এই সৈন্যদলের প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়

পরিচালনা করেন ভারতীয়রা। ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বেই তারা যুদ্ধ চালায়। এই অফিসারদের অনেকেই এখন জেনারেল পদে সমাসীন।…এই ফৌজী সংগঠনকে নয়, বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদলকেই 'পাপেট-আরমি' বলা উচিত— কারণ সে সৈন্যদল বৃটিশ অফিসারদের অধীনে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অংশীদার। বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর পঁচিশ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে একজন ভারতীয় কি পাওয়া গেল না যিনি জেনারেল হওয়ার যোগ্য !

"বন্ধুগণ, আমি বলেছি, জাপানের সাহায্য নিতে আমার লজ্জা নাই। আমি একধাপ এগিয়ে বলতে চাই সর্বশক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে, তা হলে আমাদের মতো দাসত্ব শৃংখলে বন্ধ, অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে বন্ধুদের সাহায্যগ্রহণ অন্যায় হবে কেন ! আজ আমরা জাপানের সাহায্য গ্রহণ করছি, আগামীকাল আমরা সম্ভব হলে অন্যশক্তিরও সাহায্য গ্রহণ করব যদি তা ভারতের স্বার্থের অনুকূল হয়। কোনোপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ সম্ভব হলে আমার থেকে বেশি আনন্দিত কেউ হবে না। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি যেখানে দাসত্ব নিগড়ে বন্ধ একটি জাতি কোনোপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকেই মুক্তি অর্জন করতে পেরেছে।"[৪৯]

১৫ই জুলাই '৪৫-এর বেতার ভাষণে তিনি বলেন : "আমার মতে সিমলা বৈঠকের শিক্ষা নিলে কংগ্রেসের পক্ষে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার সময় অন্যান্য দলকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়।

"শান্তি বৈঠক হয় দুটি বিবদমান পক্ষে। ভারতের সেই পক্ষ কে · নিশ্চয়ই মুসলিম লীগ নয়। তাদের গুরুত্ব কৃত্রিম— এ গুরুত্ব সৃষ্ট হয়েছে প্রথমতঃ বৃটিশ সরকারের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের দ্বারা ·· যাঁরা মুসলিম লীগের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলিম লীগ যদি আইন অমান্যের মতো একটি আন্দোলনে অংশ নিয়ে বৃটিশের অকথ্য অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তা হলে তাদের কি অবশিষ্ট থাকে দেখতে চাই। যে আন্দোলন কোটিপতি, জমিদার ও পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত তা গণআন্দোলন নয়।

"শান্তির পরে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পৌঁছবার আগেই যদি কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে শান্তির প্রচেষ্টা করে তবে আমরা শান্তির পরিবর্তে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব। আমি সমস্ত বামপন্থীদের ও সমস্ত বামপন্থী দলগুলির প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন জনগণের মধ্যে প্রচার করেন যে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁরাই ভারতীয় জনতার পক্ষে কথা বলার

জন্য বৃটিশের সঙ্গে বৈঠকে বসার অধিকারী। এইভাবে আমরা শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট ও সযত্নে পুষ্ট ধর্মীয় বিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারব।"[৫০]

সিমলা বৈঠক পন্ডের পরে ওয়াভেল গেলেন লন্ডনে এবং আবার ফিরলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর ('৪৫) তারিখে। বৃটেনে তখন শ্রমিকদলের সরকার। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯ সেপ্টেম্বর ('৪৫) এক বেতার ভাষণে ভারতীয়দের সকল দলের ও গোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনার আবেদন জানান।

ইতিমধ্যে নেতাজী জুলাই মাসে ('৪৫) সিঙ্গাপুরে শহীদবেদী স্থাপন করেন - পরবর্তীকালে বৃটিশ সেই বেদী ধ্বংস করে। ৬ই আগস্ট ('৪৫) আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় আণবিক বোমা বর্ষণ করে এবং আগস্ট মাসেই জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যুদ্ধ-পরিস্থিতি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। নেতাজী শেষ পর্যন্ত মালয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন স্থির করেন কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীগণ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধানগণ তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অন্যত্র চলে যেতে আবেদন করেন। ১৮ই আগস্ট ('৪৫) নেতাজী বিমান দুর্ঘটনার অন্তরালে একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার অন্তর্ধান করেন।

আজাদী সৈন্যগণ ও অফিসাররা বন্দী হয়ে ভারতবর্ষে নীত হন এবং দিল্লীর লালকেল্লায় শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলনের বিচারের শুনানী আরম্ভ হয়।

ওয়াভেল-প্রস্তাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে ২১-৬-৪৫ এর বেতার ভাষণে নেতাজী বলেছিলেন: 'ভারতের অভ্যন্তরে ভারতবাসীগণ যদি বৃটিশকে বাধাদানে বিরত না হন তা হলে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, পূর্ব এশিয়ায় সশস্ত্র অভিযান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী নীতি অবলম্বন— এই তিনের সম্মিলিত শক্তিতে এই যুদ্ধের অবসানে ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু আমাদের এই মুক্তি অর্জন করতে হলে ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশ শক্তিকে বাধাদান অবশ্যকর্তব্য।

"...বর্তমান যুদ্ধকালে স্বাধীনতালাভ না হলেও যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতালাভের আরো একটি সুযোগ আমরা পাব।

"যুদ্ধবিরতির পর সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র একটা অস্থির অবস্থা চলবে। সেই সময়ে বিজয়ী শক্তিগুলিকেও বহু অসুবিধায় পড়তে হয় কারণ তখন তাদের দরকার বিশ্রাম। এইজন্যই তুরস্ক ও আয়র্ল্যান্ডের বিপ্লব—প্রথম যুদ্ধের সময় ব্যর্থ হলেও যুদ্ধশেষে সফলতা অর্জন করে।"[৫১]

যুদ্ধোত্তর বৈপ্লবিক পরিস্থিতি

৫ই নভেম্বর '৪৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৪৫ পর্যন্ত দিল্লীর লালকেল্লায় সর্বসমক্ষে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি. এস. ধীলন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল পি. কে. সাইগল, এবং মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের বিচার প্রহসন চলে। এঁদের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ বা হত্যায় সাহায্যের অভিযোগ আনা হয়। বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষের অভিপ্রায় ছিল সর্বসমক্ষে এই বিচারের কঠোরতা ভারতবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলুক। বিচারে এঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সেজন্য এঁদের বরখাস্ত করে বেতন ও ভাতা বাতিল করা হয়। কিন্তু এঁদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করতে হয়। ইতিপূর্বে সকল প্রকার আজাদী সৈনিকের শাস্তিদান করা হবে এমন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল।

সরকারী নীতির পরিবর্তনের মূলে ছিল ভারতবর্ষব্যাপী গণআন্দোলন। আই. এন. এ. বা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচল জনজাগরণ ইতিহাসে এক অপূর্ব এবং বিরল ঘটনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে কংগ্রেসের আই. এন. এ নীতি এক উল্লেখযোগ্য মোড় নেয়। কংগ্রেস-নীতি হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন। আই. এন. এ.-র স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি-প্রয়োগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী এবং জওহরলাল জীর মধ্যে আই. এন. এ. সম্বন্ধে মতানৈক্য ছিল। নেহরুজী স্বাধীনতা অর্জনে জাপানের সাহায্য গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৬ই আগস্ট ('৪৫) এক সাক্ষাৎকারে নেহরুজী বলেনঃ "যদিও তিনি জানতেন বোস বিচ্ছুতেই জাপানের ক্রীড়নক ছিলেন না এবং তিনি তাঁর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন তবুও সুভাষ বোস ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে তিনি তার প্রতিরোধ করতেন।"[৫২]

১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে এ. আই. সি. সি.-তে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "কংগ্রেসসেবীদের এ কথা ভুললে চলবে না, আই. এন. এ.-র প্রতি তাদের সমর্থন ও সহৃদয়তার অর্থ এই নয় যে কংগ্রেস তাদের শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের নীতি থেকে কোনো প্রকারে বিচ্যুত হয়েছে।"[৫৩]

জুলাই '৪৫-এর নির্বাচনে বৃটেনে শ্রমিকদল সরকারে আসেন যাঁদের নাকি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে কিছু সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তাঁরাও স্বাধীনতার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব দেন যা ক্রিপ্‌স প্রস্তাবেরই অনুরূপ। সেপ্টেম্বরে ('৪৫) এ. আই. সি. সি.-র এক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "যুদ্ধের অবসান বা বৃটেনে

সরকারের পরিবর্তন কোনোটাই বৃটেনের ভারত নীতিতে প্রকৃত কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি…।"[৫৪]

তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আজাদ বলেছেন যে গান্ধীজী-সহ অধিকাংশ সদস্য এই মত পোষণ করতে লাগলেন যে তাঁদের এখন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত কারণ তাঁদের বিশ্বাস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ আশার কিছু নাই।[৫৫] আজাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অবশ্য আশাবাদ পোষণ করতেন। আজাদ ভেবেছিলেন, '৪৬-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটবে। কিন্তু নির্বাচন যতই এগিয়ে আসতে লাগল নেতৃবৃন্দ ততই জনগণের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু সে সময় জনগণের সমক্ষে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু ছিল না। নেতৃবৃন্দ যখন জেল থেকে মুক্তি পেলেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন জলুস ছিল না। '৪২-এর আন্দোলনে ধৃত বন্দীরা ক্রমশ মুক্তি পেতে থাকলেন সেজন্য তা নিয়ে আর আন্দোলন করা গেল না। নেতৃবৃন্দ ভাবলেন আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসাই এখন একটা সর্বভারতীয় বিষয়—যাকে অবলম্বন করে জনচেতনা আবার জাগ্রত করে তোলা যেতে পারে। কংগ্রেসের আই. এন. এ. সম্পর্কে নূতন নীতি গ্রহণের আর-একটি কারণ—কংগ্রেস যে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তা প্রমাণিত করা। আই. এন. এ. ছিল একটি আদর্শ অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। কংগ্রেস আই. এন. এ.-র বিচারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে জনসমক্ষে প্রসারিত করতে চাইলেন। গান্ধীজী আই. এন. এ সম্বন্ধে বলেছেনঃ "আই. এন. এ. যদিও তার আশু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি তথাপি অনেক গর্বের বস্তু তারা অর্জন করেছে। এর মধ্যে বড় অর্জন হল এই যে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির জনগণকে এক পতাকাতলে সমবেত করেছে এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণতার মনোভাবকে নির্মূল করে সকলের মনে জাগিয়েছে ঐক্য ও একাত্মতা। এই আদর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।"[৫৬]

কংগ্রেস নেতৃত্ব আই. এন. এ. সৈনিক ও অফিসারদের মুক্তির বিষয়ে প্রবল নৈতিক চাপও অনুভব করে থাকবেন। যাই হোক, কংগ্রেসের সহায় সূচক মনোভাবকে আই. এন. এ. সৈনিক ও অফিসারবৃন্দ স্বাগত জানালেন। আই. এন. এ. পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হল, এতে সদস্য হলেন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, ডঃ কে. এন.

কাটজু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, রঘুনন্দন সরণ, ও আসফ আলি। ২৫-১০-৪৫ এর কংগ্রেস সার্কুলারে বলা হয়ঃ "জগতে সব মুক্তি যুদ্ধে দেশ-প্রেমিকরা বৈদেশিক জোয়াল থেকে তাদের স্বদেশের মুক্তির জন্য বাইরের সাহায্য চেয়েছে। …ভারতে যতদিন বৈদেশিক শাসন থাকবে… দেশপ্রেমিকরা বৈদেশিক সাহায্য চাইবেনই।"[৭]

এতে পরোক্ষভাবে আই. এন. এ-র বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ স্বীকৃতি লাভ করল।… মুসলিম লীগও আই. এন. এ-র পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এল কারণ আই. এন. এ. অফিসারদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য দলও সমর্থন জানাল। একমাত্র সি.পি.আই. এর বিরুদ্ধে ছিল; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য থাকায় ভারতবর্ষে তাদের মনোভাব কোনো বিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। এই সময় জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে আই. এন. এ.-র সত্যকাহিনী প্রচারিত হতে থাকে। তাঁরা জাপান কর্তৃক আই. এন. এ.-র মারফৎ ভারতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব স্থাপনের সম্ভাবনাকে খারিজ করে দেন এবং ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতার বিষয়ে আই. এন. এ.-র লক্ষ্য সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি দাবি করেন। দিল্লীর লালকেল্লায় বিচার বসলে আই.এন.এ -র ঐতিহাসিক পটভূমি ও নেতাজীর লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের ডাক বৃটিশের বিরুদ্ধে এক নূতন ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। ভারতের রাজ-নৈতিক আবহাওয়ায় বৈপ্লবিক ছোঁয়া লাগে। ৫ই নভেম্বর ('৪৫) আই. এন. এ-র বিচার শুরু হলে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মাদুরায় পুলিসের গুলি চলে। ৬ই নভেম্বর দুই সপ্তাহের জন্য বিচার মুলতুবী রাখা হয়। নারী সংগঠন, ছাত্র, শিক্ষক,শ্রমিক সকলে সরকারী নীতির প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ২১শে নভেম্বর ('৪৫) যখন আবার বিচার শুরু হয় দেশ তখন বড় ধরনের হিংসাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। ২১ থেকে ২৪ নভেম্বরের মধ্যে কলকাতা, বোম্বাই, করাচী, পাটনা, এলাহাবাদ, বেনারস, রাওয়ালপিণ্ডি ও অন্যান্য স্থানে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। কলকাতায় বৃটিশ ও আমেরিকার সামরিক অবস্থানগুলি আক্রান্ত হয়।

বৃটেনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আজাদী সৈনিবদের মুক্তি সমর্থন করেন এবং সেখানকার বিচারকগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অন্যায় নয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করেন। ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক (Auchinleck) লিখেছেন: "আমি বিশ্বাস করি দুজন আই. এন. এ. অফিসারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলে তাদের

শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং কংগ্রেস আই. এন. এ.-র বিচার উপলক্ষে যে বৃটিশ-বিরোধী তিক্ত মনোভাব ও জাতিবৈরীতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা আরও তীক্ষ্ণতর করে তুলতে সাহায্য করা হবে।"[৭৮] উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসারদের কাছে এক গোপন বার্তায় তিনি বলেন, "এই বিচার ভারতে এক হিংসাশ্রয়ী আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সৃষ্টি করবে।"[৭৯]

সরকার শেষে আই. এন. এ.-র স্বাদেশিকতার মূল্যায়ণ মেনে নিয়ে আজাদী সৈনিকদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে দেখেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ তুলে নেওয়া হলে অধিকাংশ আই. এন. এ. সৈনিক মুক্তি লাভ করেন। ৩-১-৪৬-এ অকিনলেক তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনজন আই. এন. এ. অফিসারের মুক্তি ঘোষণা করেন। এই মুক্তি জনতার মনে জয়ের আনন্দ নিয়ে আসে এবং তাঁরা সমবেত দাবির ক্ষমতা উপলব্ধি করেন। নেহরুজীও বলেন, "...স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।"[৮০] এমনিভাবে আই. এন এ.-র বিচারপর্ব ভারতে এক নূতন বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দেয়।

১৯৪৬-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন রসিদের সাত বৎসর কারাদণ্ড হলে মুসলিম লীগ রসিদ আলি দিবসের ডাক দেয়। ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বোম্বাই, দিল্লীতে হিংসাত্মক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এতে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে অংশ গ্রহণ করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা আই এন. এ.-র নামে শ্লোগান দিতে দিতে লরী, ট্রাম ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করে। ইউরোপীয়দের বাড়ি, রেলের বুকিং অফিস এবং বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্য আক্রান্ত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ('৪৬) 'নিউইয়র্ক টাইমস' লেখে: "দুটি বিবদমান সম্প্রদায়ের আপসহীন দ্বন্দ্ব সত্বেও ১৯২১-এর পরে এই গত সপ্তাহে হিন্দু মুসলমান জনতা একত্রে দিল্লী, বোম্বাই ও কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। এই ঘটনার পশ্চাতের অনুপ্রেরণা হল·· সুভাষ বোসের আই. এন. এ.।"[৮১]

লালকেল্লার বিচার প্রহসনে আসামী পক্ষের সওয়ালের মধ্যে বলা হয়, আজাদ হিন্দ সরকার আন্তর্জাতিক আইনানুসারে স্বীকৃত বাস্তব সরকার। আই. এন. এ. এই সরকারের পরিচালিত একটি সৈন্যদল। ভারতবাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদের ভাই, ভগ্নী ও বন্ধুদের সমরকৌশল ও যুদ্ধে আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শুনলেন। আই. এন. এ.-কে ফ্যাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে জড়ানোর যুদ্ধকালীন দেশী ও বিদেশী প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে গেল। হাজার হাজার আজাদী সৈনিক মুক্তি লাভ করে বীরের মর্যাদায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে

পড়লেন। ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে জনগণ অবাক বিস্ময়ে, আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাঁদের কাছে আই. এন. এ-র কাহিনী আর নেতাজীর মহান নেতৃত্বের কথা শুনলেন। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এ কাহিনী বিপুলভাবে ছড়িয়ে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেল করে তুলল। নেহরুজী অকিনলেককে লেখা এক চিঠিতে বলেন: "বিচার পর্বের আগেই তিনি আই. এন. এ.-র জনপ্রিয়তার কথা জানতেন কিন্তু বাস্তবে তার 'গভীরতা ও ব্যাপ্তি' আশ্চর্যজনক।" গান্ধীজী হরিজনে লিখলেন, "আই. এন. এ.-এর সম্মোহনী প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে।" পট্টভি সীতারামাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে লিখেছেন: "কিছু সময়ের জন্য অবশ্য মনে হল কর্নেল শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলনের নাম ভারতের জাতীয় নেতাদের নামের গৌরব ম্লান করে দিয়েছে। মনে হল আই. এন. এ. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে এবং ভারতের বাইরে তাদের যুদ্ধ ও সহিংস কার্যকলাপ ভারতের অভ্যন্তরে অহিংসার বিজয়গুলিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।"[৬১]

ইতিমধ্যে ডিসেম্বর '৪৫-এ কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের ফল বের হলে দেখা গেল কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ হয়েছে। মুসলিম আসনগুলিতে অবশ্য লীগ-পন্থীরাই জয়ী হলেন যদিও কোন প্রদেশেই তাঁরা একক গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলেন না। '৪৬-এর জানুয়ারিতে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে জিন্না ও নেহরুজীর কথাবার্তা হয়। জিন্না সংবিধান রচনার জন্য দুটি পৃথক সংস্থা গঠনের দাবি জানান তবে পাঞ্জাবের আম্বালা বিভাগের মতো প্রধানতঃ অমুসলিম এলাকাগুলির পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি চান নি। নেহরুজী আলোচনায় স্বীকার করেন বৃটিশ সরকারকে পাকিস্তান গঠনের কথা ঘোষণা করতে হতে পারে—সে ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকাগুলিতে তা সমর্থনের জন্য গণভোট গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে সারাদেশে তখন আই. এন. এ.-র প্রভাবে জাতীয়তার জাগরণ চলেছে। এমনকি নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: "...আই. এন. এ.-র বিচারের সময় জনতার উদ্বেলতার জোয়ারই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট জয়ের কারণ তাতে সন্দেহ নাই।"[৬৩]

সশস্ত্র বাহিনীগুলিতে জাতীয়তার উন্মেষ

নেতাজীর বিপ্লবী সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীগুলির মধ্যেও বিপ্লবী চেতনার প্রসার সাধন করা। সিঙ্গাপুরে ৯ই জুলাই ('৪৩)-এর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন: "পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী

ভারতীয়গণ একটি সংগ্রামী বাহিনী গঠন করতে চলেছেন যা বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীকে আক্রমণের স্পর্ধা রাখে, আমরা যখন এই আক্রমণ পরিচালনা করব তখন যে বিপ্লব শুরু হবে তা শুধু দেশের অসামরিক জনগণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে না, বৃটিশ বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়বে। বৃটিশ সরকার এইভাবে ভিতরে বাইরে আক্রান্ত হয়ে ধ্বসে পড়বে এবং ভারতবাসী অর্জন করবে মুক্তি।"

যুদ্ধকালীন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, জাতীয় নেতৃত্বের অবহেলা, স্বদেশী-বিদেশী অপপ্রচারের অভিযান—বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষে বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে অবস্থা ভিন্ন আকার ধারণ করে। ১৯৪৫ সাল থেকেই তিন বাহিনীতে (স্থল, বিমান ও নৌ) প্রবল অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। যুদ্ধের পর বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আই. এন. এ.-র গভীর যোগাযোগ ঘটেছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর শ্যাম, বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ গোপনে বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের কাছে আই.এন. এ.-র ছবি-সংবলিত অ্যালবাম ও প্রচার-পুস্তিকা পাঠাতে শুরু করেন। হিউ টয় (Hugh Toye) বলেছেন: "ভারতীয় স্থল, নৌ, ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে রেঙ্গুনে আই. এন. এ. বাহিনীর যোগাযোগের পর গত এগারো মাসে এদের উভয়ের মধ্যে ব্যাপক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে… এর ফলে ভারতীয় বাহিনীগুলিতে অভুতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়।"[৬৪]

বৃটিশ সরকার ১৯৪৭-এর এপ্রিলের মধ্যে পনেরো লক্ষেরও বেশী সৈনিককে সৈন্যবাহিনী থেকে অপসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অফিসারবৃন্দ দ্রুত আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন। উপরন্তু দেশের মধ্যে আই. এন. এ.-র মর্যাদা দেখে তাঁরা নিজেদের ভাড়াটিয়া অবস্থায় নীচতা অনুভব করেন। ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং বলেছেন: "…আই. এন. এ. সৈনিকদের সম্বন্ধে দেশে যে প্রচার চলছিল তাতে বৃটিশ-ভারতীয় সৈনিকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। সেই সৈনিকেরা (বৃটিশ-ভারতীয়) আই. এন. এ.-র সমকক্ষ-মর্যাদার প্রমূল্য লাভ করতে চাইলেন এবং অজ্ঞাতসারে ভারতের স্বাধীনতার সৈনিক হয়ে পড়লেন।"[৬৫]

এইভাবে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনী জাতীয়তার জোয়ারে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং জাতীয় কংগ্রেস আই. এন. এ.-র মুক্তির জন্য এগিয়ে এলে

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ঘটেছিল। আজাদ লিখেছেনঃ "আমি যখন করাচী গেলাম তখন একদল নৌবাহিনীর অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁরা কংগ্রেসনীতির প্রশংসা করে আমাকে নিশ্চিত কথা দিলেন কংগ্রেস থেকে আদেশ পেলেই তাঁরা আমাদের দিকে চলে আসবেন। যদি কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতসরকারের সংঘাত ঘটে, তবে তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়াবেন— সরকারের পক্ষে নয়। বম্বেতে অবস্থিত নৌবাহিনীর শতশত অফিসার একই মনোভাব ব্যক্ত করলেন।… শুধু অফিসারদের মধ্যে নয়, নৌবাহিনীর সমস্ত স্তরে একই মনোভাবের পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল।"[৬৬]

কলকাতাস্থিত বিমান বাহিনীর লোকেরা আই. এন. এ.-র বীর যোদ্ধাদের বিচারের সময় আসামী পক্ষের আর্থিক প্রয়োজনের জন্য চাঁদা তুলে পাঠান। তদানীন্তন পূর্বাঞ্চল কম্যান্ডের জি. ও. সি. লেফটেন্যান্ট জেনারেল টাকার (Lt. Genl. Tukur) বলেছেন ঃ "আই. এন. এ.-র ঘটনাবলী…ভারতীয় বাহিনীর সামগ্রিক কাঠামোই ভেঙে ফেলতে চলেছে।"[৬৭] অকিনলেক বলেছেন যে ভারতীয় অফিসাররা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে— বিচারের রায়ে শাস্তিদানের উদ্যোগ করলে সারা ভারতে আলোড়নের সৃষ্টি হত। সম্ভবতঃ সৈন্য-বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটত এবং বিক্ষোভের জোয়ারে সমগ্র বাহিনীই ভেঙে পড়ত।

১৯৪৬-এ বিমানবাহিনীতে ধর্মঘট হয়। আই. এন. এ.-র অফিসার ও সৈনিকদের মুক্তির জন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু নৌবাহিনীতে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হতে থাকে। বোম্বাইতে বিদ্রোহী সাত হাজার ভারতীয় নৌসেনা ধর্মঘটে যোগ দেয়।[৬৮] আই. এন. এ.-র বিচারপর্বে দেশের অভ্যন্তরে যে বৈপ্লবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, নৌবিদ্রোহে তার অবদানই ছিল ব্যাপক। প্রায় সমগ্র বাহিনীই এতে যুক্ত হয়। নৌবাহিনীর ৭৮টি জাহাজ এবং তীরবর্তী ঘাটিগুলির লোকজনও বিদ্রোহে যোগদান করেন। মাত্র ২টি তীরবর্তী ঘাটি ও ১০টি জাহাজ যোগদানে বিরত থাকে। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ, কলকাতা, কোচিন, বিশাখাপত্তনম, আন্দামান ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্রোহ বেশীদিন স্থায়ী হয় নি কারণ তার পরিকল্পনার জন্য জাতীয় নেতাদের কেউ এগিয়ে আসেন নি। আই. এন. এ.-র বিচার-পর্বোত্তর সময়ে সমস্ত বিদ্রোহ রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল। অন্যান্য দাবির মধ্যে তাঁরা আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী সৈনিকদের মুক্তিও দাবি করেছিলেন। তাঁরা নৌবাহিনীর

নামকরণ করেছিলেন Indian National Navy এবং যুদ্ধ জাহাজে তারা কংগ্রেস ও লীগের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৬৯]

প্রতারিত বিপ্লব

আই. এন. এ.-র প্রভাবে ভারতে বিপ্লবাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে বারুদের স্তূপ জমে উঠেছিল। আই. এন. এ.-র বিচারপর্বে আসামী পক্ষকে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস নূতন মর্যাদা লাভ করে। নেতাজীর 'জয় হিন্দ' বাণী সভায় সভায় ধ্বনিত হতে লাগল এবং মুখে মুখে তা জাতীয় অভিবাদনের বাণী হয়ে উঠল। কিন্তু কংগ্রেসের অহিংস নীতি বিপ্লবাত্মক জাতীয় চেতনার রূপায়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ভারতে সে সময় আই. এন. এ.-র প্রভাবের জোয়ারে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভরাডুবি ঘটেছিল এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের পায়ের তলার মাটি ছিল না। এই সময় কোন বিপ্লবাত্মক আন্দোলন জাতীয় নেতৃত্বের হাত শক্ত করত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে দেশবিভাগের কাজে লাগাতে সক্ষম হত না। কিন্তু ভারতে বিপ্লবী নেতৃত্বের দুর্বলতা ও জাতীয় কংগ্রেসের দুঃখদায়ক অনীহার জন্য ভারতের জনগণ এরূপ এক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। জাতীয় নেতৃত্ব দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে তা দমনের জন্য সচেষ্ট হলেন, এতে বৃটিশ সরকারের সুবিধা হয়ে গেল। ডঃ কে. কে. ঘোষ তাঁর 'Indian National Army' শীর্ষক গবেষণা পুস্তকে সিদ্ধান্ত-গুলির মধ্যে বলেছেন: "কংগ্রেস ভারতে যে বিপ্লবাত্মক জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করল তাতে নেতৃত্ব দেবার অনিচ্ছা ও সম্ভবতঃ অক্ষমতার দরুন তারা সেই অবস্থা দমনে বৃটিশের মতোই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল।"[৭০]

২২শে ফেব্রুয়ারি ('৪৬) সর্দার প্যাটেল বিদ্রোহী নৌবাহিনীকে উপদেশ দিলেন: "অস্ত্র বর্জন কর এবং আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হও।" কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন কোন প্রকার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা ভাবছিলেন না, এবং বিভিন্ন জনসভায় জনতার হিংসাত্মক আন্দোলনের নিন্দা করলেন। ১৯৪৬-এর মার্চে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করল যে এ সময় বিপ্লবাত্মক ঘটনা কংগ্রেসের পথের বাধাস্বরূপ। কিন্তু বৃটিশ-বিরোধী উত্তপ্ত আন্দোলন দমিত হলেও ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বৃটিশের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটল। বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের রক্ষণশীল সদস্য বিগ্রেডিয়ার লো পার্লামেন্টে বলেন:

"ভারতে যে আবহাওয়া হয়েছে তা বিপদসঙ্কুল— যে-কোনো দুষ্ট লোক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে দিতে পারেন।"[৭১]

উক্ত প্রতিনিধি সম্ভবতঃ জানতেন না ভারতবর্ষের মানুষ তখন একজন 'দুষ্ট ব্যক্তির'ই নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছিলেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরা বুঝলেন বর্তমান অবস্থায় অহিংসার প্রভাবকে খর্ব করে ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। বৃটেনেও তখন প্রচণ্ড খাদ্যসংকট এবং 'আধুনিক ইতিহাসের চরমতম খাদ্যসংকট।'[৭২]

বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সোরেনসেন (Sorensen) বলেছেন যে ১৮৫৭ সালে··· বৃটেন আর্থিক চাপ সহ্য করতে পেরেছে কিন্তু আজকের সমস্যার চাপে ফেটে পড়বে।[৭৩] এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার আর ভারতীয় সমস্যা জিইয়ে রাখতে পারছিল না। ১৯-২-৪৬-এ লর্ড প্যাথিক লরেন্সের (·Secretary of State for India) নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার কথা ঘোষিত হল। বৃটিশ তখন কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের অজুহাতে ভারতে তাদের নীতি পরিবর্তন করে নিজেরাই সে সমস্যার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এল এবং তার দ্রুত নিষ্পত্তি চাইল। ইস্টার্ন কম্যান্ডের লেঃ জেনারেল টাকার সৈন্য বিভাগের জেনারেল হেড কোয়াটার্সে লিখিত একটি বিবৃতিতে বললেন: "পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ভারতে এলেন··· তাঁরা ভারতকে সরাসরি স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন···এবং শ্রমিক দলেরও তাই মত ছিল কারণ তারা ভয় করছিল ভারতীয়রা তাদের দূর করে দেবে।"[৭৪] টাকার অবশ্য '৪৫ সালেই ভারত বিভাগ করতে হবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।[৭৫] ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজী জানিয়েছিলেন যে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে তিনি ঘৃণা করেন— তাঁর মতে খুব কমসংখ্যক ব্যতিরেকে ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতীয় বংশোদ্ভব এবং তিনি দুটি সংবিধান রচনাকারী সংস্থারও বিরোধী। জিন্না পাকিস্তানের সপক্ষে বলেন: "ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, ইউরোপীয় দেশগুলির বিরোধ অপেক্ষা অধিকতর গভীর এবং তা মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র; এমন কি আয়র্ল্যান্ডের তুলনাও অচল···। ভারতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি সভ্যতা পাশাপাশি রয়েছে··· এর সমাধান হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে।"[৭৬] ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদার লিখেছেন: "যদি কানাডা ইংরেজ ও ফরাসী দুটি বিবদমান জাতি নিয়ে, এবং সুইজারল্যান্ড যা তিনটি জাতি নিয়ে গঠিত,— রাজনৈতিক ভাবে একীভূত থাকার সূত্র বের করতে পারে, তা হলে

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিমগণের ক্ষেত্রে তা কি…অসম্ভব ? তাঁরা তো ভারতের প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে সাতশো বছরেরও অধিক একত্রে বসবাস করেছেন। জিন্না এবং গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর মতো উপরের স্তরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।"[৭৭]

এই সময় তপশীলভুক্ত জাতির পক্ষ থেকে ডঃ আম্বেদকর সংবিধান সংস্থা গঠনের বিরোধিতা করলেন, কারণ তা বর্ণহিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। গিয়ানী কর্তার সিং শিখদের জন্য সার্বভৌম শিখরাষ্ট্রের দাবি তুললেন। বিচ্ছিন্নবাদিতার বিষে ভারতের রাষ্ট্রদেহ জর্জরিত হয়ে উঠল। সি. পি. আই. সংগঠনও দীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম জাতির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচার চালিয়ে আসছিল।[৭৮]

ক্যাবিনেট মিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব দিল। সংখ্যালঘু সমস্যা ও দেশ বিভাগ সম্বন্ধে তাঁদের কিছু মতামত বেশ প্রণিধানযোগ্য।

তারা বলল : "ছয়টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা যে প্রচুর, নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যায় :-

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	মুসলমান	অমুসলমান
(পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ,		
সিন্ধু ও বৃটিশ বেলুচিস্তান)	২,২৬,৫৩,২৯৪	১,৩৮,৪০,২৩১
	৬২·০৭%	৩৭·৯৩%
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল	৩,৬৪,৪৭,৯১৩	৩,৪০,৬৩,৩৪৫
(বাংলা ও আসাম)	৫১·৬৯%	৪৮·৩১%

"বৃটিশ ভারতে ১৮·৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ২ কোটি মুসলমান সংখ্যালঘু থাকবে।

"উক্ত সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় পাকিস্তান বাস্তবায়িত হলে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না, এবং প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মধ্যে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করারও কোনো যুক্তি নাই।… তার উপর এতে শিখদের অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়বে।"

ক্যাবিনেট মিশন আরও বলল : "আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের যে-কোনো পরিকল্পনা সেখানকার বিশাল-সংখ্যক জনসমষ্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। বাংলা ও পাঞ্জাবে জনগণের নিজেদের সাধারণ ভাষা রয়েছে আর আছে তাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আমরা

সেজন্য এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে বাধ্য হচ্ছি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বড় বা ছোট ধরনের সার্বভৌম পাকিস্তান সৃষ্টি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব নয়।

"তা ছাড়া প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সামরিক সংগঠনের দিক থেকেও এই প্রস্তাবের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে।... সংযুক্ত সামরিক সংগঠনের সপক্ষে যুক্তি আরও জোরদার। ভারতীয় বাহিনী সারা ভারতবর্ষ রক্ষার মতো করে গঠিত— তাকে দুভাগে বিভক্ত করলে তার উচ্চধরনের ঐতিহ্য ও দক্ষতা নষ্ট হবে এবং গভীরতম বিপদের সৃষ্টি হবে। ভারতীয় নৌ ও বিমান বাহিনী তাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দুই অংশ ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকে দুই দুর্বল সীমান্ত সৃষ্টি করবে এবং প্রতিরক্ষার সফলতার কথা বিবেচনা করলে পাকিস্তানের আঞ্চলিক-গভীরতা অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়বে।

"তার উপর ভারতীয় রাজন্য-শাসিত অঞ্চলগুলি বিভক্ত ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যাপারে অসুবিধা বোধ করবে।

..."ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের দুই খণ্ডের ব্যবধান হবে ৭০০ মাইল এবং যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করবে।"[৭৯]

ক্যাবিনেট মিশন ভারত বিভাগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। কংগ্রেসের ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনাও প্রশাসনিক দিক থেকে অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে এই বলে তারা তাও অগ্রাহ্য করল। তারা তাদের প্রস্তাবে রাজ্য ও কেন্দ্রের সাংগঠনিক প্রকৃতির বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন: "প্রদেশগুলি কয়েকটি মিলে একটি গ্রুপ করে কোন কোন বিষয় তাদের সাধারণ ক্ষমতার মধ্যে আনা হবে সে সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।... কেন্দ্র এবং গ্রুপগুলির গঠনতন্ত্রে সেরূপ ব্যবস্থা থাকবে...যে-কোন প্রদেশ প্রতি দশ বৎসর অন্তর বিধানসভার সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন নিয়ে গঠনতন্ত্র পুনর্বিবেচনার দাবি জানাতে পারবে।" তারা কেমন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে তাও বলল।... তাদের কর্তৃত্বগিরি ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কংগ্রেস ও লীগ কোন পক্ষেরই ছিল না— তারা কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সমালোচনা করতে লাগল। জুনের ('৪৬) শেষে ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বিদায় নিল।

ইতিমধ্যে ওয়াভেল তাঁর চাতুর্যের মহড়া দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার

গঠনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য জাতি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দাবার খেলা শুরু করলেন। ২২শে জুন ('৪৬) তিনি জিন্নাকে লিখলেন, অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো মুসলিম প্রতিনিধি তিনি গ্রহণ করবেন না। কংগ্রেস অতঃপর ওয়াভেল-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হল। আপসের জটাজালে কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন বিপুলভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন। ভারতে আই.এন.এ.-র প্রভাবে উদ্বেল পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ আপসহীন আন্দোলন চলতে থাকলে অসংগ্রামী মুসলিম লীগ মাথা তোলাব সুযোগ লাভ করতে পারত না, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু বৃটিশের সঙ্গে কুটিল দর-কষাকষিতে অক্ষম নেতৃত্ব সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়ে দিলেন। এ.আই.সি.সি.-র ৬ ও ৭ই জুলাই-এর ('৪৬) বোম্বাই বৈঠকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ২০৫-৫১ ভোটে গৃহীত হল। এই সময়ে নেহরুজী (তখন কংগ্রেস সভাপতি) বললেন: 'আমি সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, পরিশেষে গ্রুপিং বলে কিছু থাকবে না।."[৮০]

জিন্না এতে ভীত হয়ে ভাবলেন কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তা কাজে পরিণত করবে না। জিন্নার মতে এই গ্রুপিং প্রস্তাবই নাকি ছিল ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য। নেহরুজীর জীবনীলেখক Michael Brecher নেহরুজীর উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন: "কংগ্রেস (ক্যাবিনেট মিশন) প্রস্তাবে যে অসুখী ছিল ১০ জুলাই নেহরুর বক্তৃতায় তা পরিস্ফুট হল। সেই বিবৃতি তাঁর চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা অগ্নিবর্ষী ও উত্তেজনাকর বিবৃতিগুলির অন্যতম।

"বাস্তবিক পক্ষে তাঁর বক্তৃতা ক্যাবিনেট মিশনের সম্পূর্ণ বিফলতার সূচনা করল।"[৮১] আজাদ বলেছেন যে জিন্না ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কারণ আর কোন উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু জওহরলালের বিবৃতি তাঁর কাছে বোমা বিস্ফোরণের মতো মনে হল।"[৮২] ২৭শে জুলাই লীগের বোম্বাই বৈঠকে জিন্না ও তাঁর মুসলীম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। জিন্না বললেন: "ইতিহাসে লীগ গঠনতান্ত্রিক উপায়··· ভিন্ন অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করে নি। ···আজ আমরা গঠনতান্ত্রিক উপায়কে বিদায় জানাচ্ছি··· আজ পিস্তল তৈরি করেছি এবং আমরা তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত।"[৮৩]

১৬ই আগস্ট '৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল। সেদিন বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা ছুটি ঘোষণা করলেন। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ল। আজাদ লিখছেন: "···আমি দেখলাম (দমদমে)

ট্রাকভর্তি মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম কেন তাঁরা আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছেন না। উত্তরে তাঁরা বললেন, তাঁরা আদেশমত দাঁড়িয়ে আছেন, কোনোরূপ ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। সারা কলকাতায় মিলিটারী ও পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর নিরপরাধ স্ত্রী-পুরুষ খুন হতে লাগল।"[৮৪] বৃটিশ তখনও ভারতের প্রশাসনে সমাসীন। ফ্রেডারিক বারোজ (Frederick Burrows) তখন বাংলার গভর্ণর। ১৬ই আগষ্ট থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রায় ৬,০০০ লোক নিহত এবং প্রায় ২০,০০০ লোক নানাভাবে আহত হন।[৮৫]

বৃটিশ ও লীগ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকে প্রমাণ করল যেন এই জিনিসটিই তারা চাইছিল। পরে হত্যাকাণ্ড উভয় পক্ষে ছড়িয়ে পড়লে মিলিটারী ডাকা হয়। নেহরুজী তখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। ২. ৯. ৪৬ তারিখে নেহরুজীর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে লীগ ১৩ অক্টোবর ('৪৬) অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে সম্মতি জানায়। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। ১৯. ১০. ৪৬ তারিখে গজনফার আলি খাঁ (অন্তর্বর্তী সরকারে অন্যতম মনোনীত লীগ সদস্য) ঘোষণা করেনঃ "আমবা সরকারে যাচ্ছি যাতে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের শক্তি অর্জন করা যায়। আমি নিশ্চিত বলতে পারি পাকিস্তান আমরা অর্জন করবই।"[৮৬]

ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই দ্রুততালে এগিয়ে যেতে লাগল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি শীঘ্র একটা মীমাংসা চাইলেন এবং ওয়াভেলের স্থলে মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় নিযুক্ত করে পাঠালেন।

এদিকে আসাম ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা বেধে উঠল। হিংসাত্মক ঘটনায় নাজেহাল কংগ্রেস কমিটি ৮. ৩. ৪৭ তারিখে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করল। নেতৃবৃন্দ একে একে দেশভাগের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগলেন। সর্দার প্যাটেল বললেন ঃ "আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ভারতে দুই জাতি রয়েছে। আমি এখন আর বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু মুসলমান একত্রে একটি জাতিতে সংগঠিত হতে পারে।"[৮৭] গান্ধীজী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেবলমাত্র মুসলমান সদস্যদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক অবশ্য সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেন। দেশবিভাগ সম্পর্কে আজাদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ "এমন প্রশ্ন কি হতে পারে? কংগ্রেস দেশ বিভাগ গ্রহণ করলে তা আমার মৃত-

দেহের উপরেই করবে। আমি যতদিন জীবিত থাকব, দেশভাগে কখনই সম্মতি জানাব না।"[৮৮]

কিন্তু পরে চাপে পড়ে গান্ধীজী এতটা দৃঢ় থাকতে পারেন নি। আজাদ বলেছেন: "গান্ধীজীর সঙ্গে যখন আবার সাক্ষাৎ করলাম— তখন জীবনের কঠিনতম আঘাত পেলাম, দেখলাম তাঁর মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি সরাসরি দেশবিভাগের পক্ষে কথা বলছিলেন না, কিন্তু এর বিরুদ্ধেও আর কঠিন মনোভাব ব্যক্ত করলেন না।[৮৯]

১৪-১৫ জুন ('৪৭) কংগ্রেস এ.আই.সি.সি. বৈঠকে দেশ ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করল। মৌলানা আজাদও প্রকারান্তরে তা সমর্থন করলেন।[৯০] দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হল এবং বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হল। ১৫ই আগস্ট '৪৭-এ খণ্ডিত স্বাধীনতা নিয়ে দুটি দেশের জন্ম হল: ভারত ও পাকিস্তান।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সংখ্যালঘু সমস্যার কথা বিবেচিত হল না। দেশময় বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে রক্তের বন্যা বইতে লাগল। আপসের স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দিতে হল অসংখ্য নিরপরাধ হিন্দু-মুসলমান নরনারী ও শিশুকে। Mosley লিখেছেন: "ছয় লক্ষ লোক মারা গেল, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ হল গৃহহারা। উভয় পক্ষেরই এক লক্ষ যুবতী অপহৃতা হয়ে বাহুবলে ধর্মান্তরিতা কিংবা নিলামে বিক্রিতা হল।

"মানুষ হয়ে গেল পশু। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তাঞ্চলের বাতাস এ কালের মতো অহেতুক বিষিয়ে গেল।"[৯১]

Michael Edwardes বলেছেন, "শুধু পাঞ্জাবেই ছয় লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন।"[৯২]

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করল হিন্দু-মুসলমানের রক্তধারার উপর দিয়ে। বাধ্য হয়েই তাকে ভারত ত্যাগ করতে হল, কিন্তু ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘকালের জন্য পঙ্গু করে রাখার চক্রান্ত কার্যকরী করেই সে বিদায় গ্রহণ করেছে। আমাদের অক্ষম নেতৃত্ব তার শিকার হয়েছেন। দেশ বিভাগের শেষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মনোভাবের কিছু প্রতিফলন মেলে ১৯৬০ সালে নেহরুজীর সঙ্গে Mosley-এর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণী থেকে। নেহরুজী এ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন: "সত্য বলতে

কি আমরা তখন ছিলাম ক্লান্ত এবং আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ আর কারাবরণের কথা ভাবছিলেন না, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অখণ্ড ভারতের জন্য দৃঢ় হয়ে থাকলে স্বভাবতঃই কারাবরণ করতে হত। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছিল— প্রতিদিন হত্যার সংবাদ আসছিল। ভারত বিভাগের পরিকল্পনা একটা উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিল ; আমরা তাই গ্রহণ করলাম।"[৯৩]

কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে উদ্ধার আমরা পাই নি বরং আমরা দেশ-ভাগের পরিণতিতে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। নেতাজী ভারত বিভা-গের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেনঃ "দেশ বিভক্ত হলে তার রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক বিপর্যয় ঘটে··· ।

"আমার ঐশী মাতৃভূমির খণ্ডন কোরো না।"[৯৪]

দেশের নেতৃত্ব তাতে কর্ণপাত করেন নি।

ইতিহাসের নিরিখে

বৃটিশের ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে হিউ টয় Hugh Toye লিখেছেনঃ "এতে সন্দেহ নাই যে আজাদ হিন্দ বাহিনী তার বজ্র-ঝঞ্ঝাতুল্য ভাঙনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল।"[৯৫]

সুভাষচন্দ্র বসু ও আই. এন. এ. সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেনঃ "বৃটিশ বুঝতে পারল তারা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বসে আছে, যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুদ্গীরণ ঘটতে পারে। বৃটিশের ভারত ত্যাগের অন্তিম সিদ্ধান্তে সম্ভবতঃ এই বিবেচনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল···।"[৯৬]

নেতাজী ভারতবর্ষে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাঁর বিদ্রোহী জীবনে আপসহীন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে সে নেতৃত্বের মর্যাদা রাখে নি। অবশেষে একাকী বিপ্লবের দায়িত্ব নিয়ে বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটিশ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারতে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত বৃটিশ বিতাড়ন। নেতাজী বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। '৪২এ অবশ্য আন্দোলন হল কিন্তু গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সহিংস পরিণতির দায়িত্ব মেনে নেন নি। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ মারফৎ যখন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুললেন

তখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লব স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভারতে আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় বিপ্লব ঘটল না। আপসের আফিমে দেশের নেতৃত্ব ঝিমিয়ে পড়লেন। নেতাজী বলেছিলেন, বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেও বিপ্লবাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। আই. এন. এ.-র বিচারপর্বে ব্যাপকভাবে তাই ঘটেছিল। নেতাজী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সুযোগ নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আই. এন. এ.-র প্রভাবে বিমান, স্থল ও নৌ বাহিনীতে দারুণ বিদ্রোহাত্মক ঘটনা ঘটে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিত হয়েছে। জাতীয়তার জোয়াবে সাম্প্রদায়িকতাও ভেসে গিয়েছিল। 'ভারত ছাড়ো'র মতো কোন আন্দোলনের ঢেউ সামলাবার ক্ষমতা তখন বৃটিশের ছিল না ; ছিল না নূতন করে যুদ্ধ ঘটাবার সামর্থ্য। তাদের বেতন-ভোগী বাহিনী তখন জাতীয় বাহিনীতে পরিণতি লাভ করতে চলেছে। কিন্তু আমাদের স্বপ্নালু মোহজর্জরিত নেতৃত্বের অক্ষমতার সুযোগে কয়েকটি মাসের মধ্যে সমগ্র দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আই. এন. এ.-র এবং শতসহস্র শহীদদের রক্ত দিয়ে অর্জিত প্রমূল্যের বিসর্জন ঘটল। পলায়মান শত্রু বৃটিশের দর-কষাকষির ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তারা তাদের শাণিত ছুরির আঘাতে ভারতের শাশ্বত সত্তাকে যেন ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত করে দিয়ে গেল।

আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক দেশ ভাগের মধ্যে মিথ্যা ও মূঢ়তা একদিন ক্ষমতালোভী অদূরদর্শী ভারতীয় নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির নূতন নেতৃত্ব ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যায়নের পুনর্বিচার করে নূতন ঐক্যের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার সার্বিক মুক্তির পথে বিশ্বকে আহ্বান জানাবেন কিনা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করবে।

—

আর্থিক মননে সুভাষচন্দ্র

ভাবনার পটভূমি : অখণ্ড সাম্যবোধ

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব বহুমাত্রিক (multi-dimensional) এবং তা অখণ্ড (integral)। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, দার্শনিক ও সামরিক প্রভৃতি বিষয়ে সুভাষ জীবনের ঘটনাবলী এক অনন্য অবদানের এবং বিশ্বের চিন্তাভাণ্ডারে এক নূতন দিকদর্শনের স্বাক্ষর রেখেছে। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক নানা অবরোধের মধ্যে সে মহাজীবনের বিশ্লেষণী সমীক্ষা হয় নি আজও। মানবাত্মার মুক্তির পূজারী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জীবনভূমিতে বিশ্বদর্শনের সমন্বয় সাধন করে মানবপ্রেমের আত্মিক বোধের মধ্যে রচনা করেছেন তাঁর সাম্য-দর্শনের বনিয়াদ। বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সামাজিক, আর্থিক পরিবর্তন ঘটিয়ে অতীত ভারতের পটভূমিতে এ দেশে এক আদর্শ নূতন সমাজ গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ভারতের আত্মিকবোধের মধ্যেই বিশ্ববোধ নিহিত— তাই ভারতের শাশ্বত-বাণী··· 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' সে বাণীকে রূপ দিতে চেয়েছেন সুভাষচন্দ্র তিলে তিলে রক্তক্ষয়ী জীবন সাধনার-মধ্য দিয়ে। ঋষি কবি তাঁর উদ্দেশে একদিন বলেছেন, "তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক দেশের আত্মস্বরূপ।" আরও বলেছেন : "গীতায় বলেন সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।" সুভাষচন্দ্রকে তিনি তারপর দেশের 'স্বাভাবিক প্রতিনিধি' হিসাবে 'দেশনায়ক' পদে বরণ করে আশীর্বাদ জানিয়েছেন : "দেশের দুঃখকে তুমি আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"[১]

ভারত-আত্মার সেই স্বরূপসাধক সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো ভাষণে বলেছেন, "অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে— ভবিষ্যতেও থাকবে।" বলছেন : "অনেক মৃত্যু জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে কারণ ভারতের একটা mission আছে— ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।

"ভারতের এই মিশনে যার বিশ্বাস আছে সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে

আছে।"[২]

"ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য, এসব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না করে কি মরতে পারি ?"[৩]

সুভাষচন্দ্র বার বার এই মিশনের কথা, ভারতীয় জাতির মহান উদ্দেশ্যের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[৪] এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নেতাজী চেয়েছেন প্রকৃত জাতীয়তার অনুশীলন। এই জাতীয়তাই হবে আন্তর্জাতিকতার মূল উপাদান।[৫]

"প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়।"[৬]

"সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে।"[৭]

ভারতবর্ষের লক্ষ্য হবে অখণ্ড জীবনবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে ভারতীয় সমন্বয়ী-সাম্য দর্শনে উত্তরণ, ভারতে নূতন জাতিগঠনের ভিত্তি রচনা।[৮] স্বামীজীর জীবনেরও মূলমন্ত্র ছিল— ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনাপূত 'সমন্বয়' যা হবে ভারতের জাতীয়তাবোধের ভিত্তি।[৯] ভারতের জাতীয়তায় অনুবিদ্ধ নূতন সমাজ সংগঠিত হলে বিশ্বে সমাজবিবর্তনে ভারতবর্ষ নূতন আদর্শের অবদান রাখতে সমর্থ হবে। ভারতের জাতীয়তার মধ্যেই রয়েছে অখণ্ড জীবনবোধের সাধনা— সমষ্টিগতভাবে তার রূপায়ণের সাধনাই বর্তমানের সাধনা।[১০] এই অখণ্ড জীবনবোধের অধিরাজ্যেই পূর্ণসাম্যের আবাসভূমি।

সুভাষ-দর্শনে অখণ্ড সাম্যভাবনা উৎসারিত হয়েছে আত্মিক প্রেমের ভূমি থেকে। বলছেন: "আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং তা মানবজীবনের মূলনীতি।"[১১] এই প্রেমের দৃষ্টিতেই সুভাষচন্দ্র মানুষের দুঃখকে আপন দুঃখের মতো অনুভব করেছেন। এটি ভারতীয় দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ যোগীর যোগলব্ধ বস্তু।[১২] ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে ঋষি অরবিন্দের যোগ-সমন্বয়ের প্রতি আকর্ষণ আমরা লক্ষ্য করেছি।[১৩] পরবর্তীকালে এই সাধনার বিকাশ মানুষের দুঃখে আপন দুঃখবোধ— ঋষি-কবির দৃষ্টি এড়ায় নি।

মানুষের প্রতি সমমমত্বের ঐকান্তিক জীবনবোধ থেকেই সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড সাম্যদর্শনের— আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক সাম্যের সমন্বয়ী আদর্শের রূপায়ণ, সুভাষচন্দ্র নিজেই যার নামকরণ করেছেন— সাম্যবাদ বা সমন্বয়বাদ। সুভাষ-দর্শনে স্বাধীনতা ও সাম্যভিত্তিক আদর্শ সমাজ সংগঠন সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আর্থিক সাম্য ও অখণ্ড স্বাধীনতার সুষ্ঠু সমন্বয়ী মৈত্রীতে গড়ে উঠেছে নেতাজীর আর্থিক মতের দর্শন।

স্বাধীনতা ও সাম্য-সমাজ

বর্তমান পৃথিবী আমাদের সামনে রেখেছে দুটি প্রধান বিতর্কমূলক আর্থিক-সামাজিক কাঠামো। একটি liberal বা স্বাধীন অর্থনীতি যা ধনবাদী অর্থনীতির নামে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে, অন্যটি communist বা সমষ্টিবাদী অর্থনীতি যা রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। এ যুগে liberal বা স্বাধীন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বহুল পরিমাণে। কমিউনিস্ট অর্থনীতিতেও নানাভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা incentive যুগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। উভয় প্রকার অর্থনীতির গোঁড়া কাঠামো আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না— মানুষের ব্যক্তিক স্বাধীনতার চাপে আর অধিকতর উৎপাদনের স্বার্থে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী অর্থনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মিশ্র-অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে— রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন বড়শিল্প ও রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত মালিকানায় মুখ্যতঃ মাঝারি ও ছোটশিল্পের মাধ্যমে। কৃষিক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানা রাখা হচ্ছে ভূমির উচ্চসীমা নির্ধারিত করে দিয়ে। কয়েকটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও সীমিত ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্রীয় খবরদারির মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। উপরোক্ত সব সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক কাঠামো বিশিষ্ট অর্থনীতিগুলিকে ধরে রেখেছে।

আমরা দেখেছি বিশ্বের আর্থিক কাঠামোগুলির মধ্যে সাবলীলতার অভাব। তারা অসংখ্য সংঘাতের (friction) মধ্য দিয়ে উৎপাদনমুখিনতাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রিক-সংগঠন বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদনের মাত্রা ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যাদি তুলে ধরে রাষ্ট্রিক-আর্থিক কাঠামোর যথার্থতা প্রমাণ করার ঝোঁক বর্তমান বিশ্ব-মনীষাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উৎপাদন অবশ্যই চাই কিন্তু আর্থিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে মানুষের স্বাধীনসত্তার সাবলীল জীবন যে সমভাবেই প্রয়োজন— এই ন্যায় বিচারের কথা মূল্য পায় না। এর অনিবার্য ফল-

শ্রুতি হিসাবে বর্তমানের রাষ্ট্রিক-আর্থিক কাঠামোগুলির আমূলে রূপান্তরের প্রশ্ন বিপ্লবী মনকে আলোড়িত করছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের মৈত্রীতে গড়ে উঠুক শোষণহীন নূতন অর্থনীতি ও নূতন সভ্যতা। তার সাবলীল ছন্দ দীর্ঘ জীবন লাভ করুক— ক্লিষ্ট মানুষের এই আত্মিক ইচ্ছা রূপলাভ করবে সমাজ বিবর্তনেব নিয়মে। ভারতবর্ষের আর্থিক-রাষ্ট্রিক কাঠামো হোক সেই নব-রূপায়ণের অগ্রদূত— তাই চেয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তিনি তাই বলেছেন : "পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অবদান ভাবতবর্ষকেই রাখতে হবে।"[১৪]

আর্থিক সংগঠনের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা হল অনিবার্য পূর্বশর্ত। তাই তিনি লিখেছেন : "যেহেতু রাজনীতি এবং অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং ভাবতবর্ষে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্বই নয়, অধিকন্তু অর্থনৈতিক শোষণও— সেজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই অপরিহার্য।"[১৫] স্বাধীন সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে অমরাবতী ভাষণে (১-১২-২৯) সুভাষচন্দ্র বলেছেন : "এই স্বাধীনতার নীতি মোটের উপর সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আব কিছুই নয।'[১৬] লাহোর ভাষণে (১৯-১০-২৯) বলেন : "শুধু ইহা (স্বাধীনতা) রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে ইহা অর্থেব সমান বিভাগ, জাতি-ভেদও সামাজিক অবিচারের নিরাকবণ ·।

" সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্যও সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি।··· অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাউক।"[১৭]

সুভাষচন্দ্র এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের ঋত্বিক— তাঁর বিপ্লব খণ্ড নয়, পূর্ণ। জীবনের পূর্ণ পরিবর্তন চাই। বলছেন : "· বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কারমূলক। এই-সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়— জীবনের রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না, মূলগত রূপান্তরই চাই।"[১৮] এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে নূতন জাতি, নূতন সমাজ।

মেদিনীপুর ভাষণে (২৯-১২-২৯) বলেছেন : "আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না··· যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না··· যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির হাত হইতে সর্ববিষয়ে মুক্ত হইবে সর্বোপরি

যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে…।"[১৯]

প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন অমরাবতী ভাষণে : "সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে— সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে— ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না। আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে— সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্যের উপর সকলের সমান অধিকার…।

"আমি চাই এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।"[২০]

সুভাষচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা কতকগুলি মূল বিষয়ে উপনীত হতে পারি যেগুলি তাঁর আর্থিক চিন্তার সম্পর্কেও ভিত্তিগত ধারণা। এগুলি হল : ১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। ২. বৈষম্যহীন এক সমাজ গঠনই লক্ষ্য যেখানে সমাজের চাপে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিষ্পিষ্ট হবে না ৩. সাম্যভিত্তিক আর্থিক বণ্টন ও সমান অধিকারের পত্তন। ৪. এর ভিত্তিতে ভারতে বৈদেশিক প্রতিপত্তিমুক্ত এক নূতন জাতি, নূতন সমাজ গঠন— যা পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় হবে। ৫. এ-সবের মূলে আছে বৈপ্লবিক রূপান্তরের স্বপ্ন— যার উৎস হল মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

এরূপ আদর্শ সমন্বিত একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। নূতন এই সমাজ গঠনে অতীতের ও বর্তমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই সমাজকে ধরে রাখার মতো একটি রাষ্ট্রিক সংগঠনও দরকার। এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা, সাধনা ও নির্দেশ আমরা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ— যেখানকার ঋষিদের ধ্যান-ধারণা বিশ্বের চিন্তাজগতে এক বিপুল অবদান। সুভাষচন্দ্র রংপুর ভাষণে (৩০-৩-২৯) বলেছিলেন, "(সমাজতান্ত্রিক) চিন্তার মূল নিহিত রয়েছে ভারতের চিন্তা সংস্কৃতির মধ্যে।"[২১] দীর্ঘদিনের চলমান সভ্যতা হিসাবে অতীতের অনেক সত্য চিন্তার; সাম্যচিন্তার ঐতিহ্য নিয়ে বর্তমান ভারত বেঁচে রয়েছে। ইতিহাসের কোনো পুরাতন সভ্যতা আর এভাবে বেঁচে নাই। ভারতীয় সমাজের এই বেঁচে থাকা প্রমাণ করে তার সংস্কৃতি ঐতিহ্যের

বলিষ্ঠতা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তাই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। ভারতবর্ষ নূতন সমন্বয়ী সমাজের, সাম্য-সমাজের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে গড়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে। এ-প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি বক্তব্য স্মরণীয়।

অমরাবতী ভাষণে (১-১২-২৯) তিনি বলেন: "একটা জাতিকে উন্নতিশীল করিতে হইলে যে-সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় তৎসমস্ত উপাদানই ভারতের আছে। কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক কোনও রূপে উপাদানেরই অভাব এখানে নাই। ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি সে মরে নাই; এখনও ভারতবর্ষ জীবিত আছে।...জগৎকে মহত্তর ও বৃহত্তর কিছু দান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে।

"একবার এই ঘুমন্তজাতির নিদ্রাভঙ্গ হইলে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতিসমূহকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারি।"[২২]

টোকিয়ো বক্তৃতায় (নভেম্বর '৪৪) বলেছেন: "...মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসীয় এমন-কি গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মতো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা মৃত নয়, বর্তমানেও তা সজীব। আমরা আজকের ভারতীয়রা আমাদের ২০০০ থেকে ৩০০০ বছরের পূর্বপুরুষদের মতোই মূলতঃ একইভাবে ভাবি, অনুভব করি এবং একই আদর্শ ধরে চলি। অর্থাৎ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পারম্পর্য বিদ্যমান।

"...তথাপি আমরা পরিবর্তিত হয়েছি এবং সময়ের সাথে চলেছি।

"আমি বিশ্বাস করি... স্বাধীন মানুষ হিসাবে বাঁচার আর একটি জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার মতো প্রাণ-সম্পদ আমাদের রয়েছে।"[২৩]

এই ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির পরীক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতীয় পরিবেশের অনুকূল একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ রেখেছেন সুভাষচন্দ্র। বলেছেন: "প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।"[২৪]

অতীত ভারতের শিক্ষা

অতীত ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা স্বভাবতঃ তার আত্মিক ঐতিহ্যের কথা ভাবি, কিন্তু এর সঙ্গে তার ঐহিক সাধনারও প্রসার ঘটেছে।

আত্মিক সাধনা সব জীবনসাধনার ভিত্তি। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের যোগলব্ধ 'প্রেম'ই সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের মূল— সেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে মানুষের প্রতি সমমমত্ব বোধ— তাঁর সাম্যদর্শনের বনিয়াদ। ভারতবর্ষ শুধু অধ্যাত্ম-সাধনায় থেমে যায় নি ঐহিক জীবনের সাফল্যেও সে পিছিয়ে থাকে নি। সুভাষচন্দ্র বলছেন: "ধর্মে, কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, যুদ্ধবিগ্রহে— ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত।"[১৫]

সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle পুস্তকের ভূমিকায় ভারতীয় 'পলিটি' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন: ভারতের ইতিহাস আলোচনা করতে হয় দশ বা শত বৎসরে নয়, হাজার হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতে। তার দীর্ঘকালের ইতিহাসে বিশাল ভারতবর্ষ ভাগ্যের বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে।

" ভারতীয় সভ্যতা অন্ততঃ পক্ষে ৩০০০ বছরের পুরাতন এবং সেকাল থেকে লক্ষণীয়রূপে মোটামুটি একই ধারায় তার সংস্কৃতি সভ্যতা প্রবাহিত। এই প্রবাহ ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বকালীন বৈদিক গ্রন্থাদিতে রাজা-বিহীন শাসনব্যবস্থার পরিচয় মেলে।"[১৬]

সুভাষচন্দ্র আরও বলেছেন যে সেই প্রাচীন যুগে উপজাতীয় গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল— যেখানে 'গ্রাম' সবচেয়ে ছোট এবং 'জন' ছিল সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠন। মহাভারতেও রিপাবলিক ধরনের রাষ্ট্রিক কাঠামোর কথা আছে। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রায় সমসাময়িক শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক রিপাবলিক ছিল— উদাহরণস্বরূপ মালব, ক্ষুদ্রক, লিচ্ছবি রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রিক কাঠামো ছিল রিপাবলিক ধরনের। 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের কথা বৈদিক গ্রন্থরাজিতে পাওয়া যায়— 'সভা' ছিল কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির ও 'সমিতি' ছিল সমগ্র সমাজের প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধ, জাতীয় বিপর্যয় এমন-কি রাজ-অভিষেকের সময়ে এই সমিতির বৈঠক বসত।[১৭]

সুভাষচন্দ্র পাবনা যুব সম্মিলনীর ভাষণে (২৭ মাঘ ১৩৫৩ সাল) বলেছেন: " ..অনেকের ধারণা আছে যে Socialism বা Republicanism বুঝি-বা পাশ্চাত্য সামগ্রী কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism বা Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না এমন-কি বর্তমান যুগেও ভারতের কোনো কোনো নিভৃতপ্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।"[২৮]

এই ধরনের মন্তব্য রেখেছেন পুনায় মহারাষ্ট্র প্রদেশিক সভার ভাষণে (৩-৫-২৮)। বলেছেন, "অতীত ভারতের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।'[২৯] সুভাষচন্দ্র নিজেই খাসি পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ একটি সমাজ-কাঠামো লক্ষ্য করেছেন।[৩০] দেখা যায় প্রাচীন ভারতের রিপাবলিকগুলির বিশেষত্ব সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং এগুলি তাঁর চিন্তাবৈভবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রাচীন রিপাবলিক

প্রাচীন ভারতে রিপাবলিকের সংখ্যা সঠিক নির্ণীত হয় নি। শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর Hindu Polity নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে ৮২টি রিপাবলিকের নামোল্লেখ করেছেন।[৩১] এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. উপরোক্ত সমিতিগুলি একটি উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। সেখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পূর্ণ অধিকার ছিল এবং আলোচনাকারী অন্য সকলকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করতেন। 'সমিতি'র একজন সভাপতি থাকতেন। সমিতিগুলির প্রতিনিধিত্বও নানাধরনের ছিল। শিল্প-সংগঠক এবং গ্রামের কর্তাও (গ্রামিনি) সমিতিতে উপস্থিত থাকতেন। মনে হয় প্রথম দিকে না হলেও অন্ততঃ পরবর্তীকালে গ্রামগুলিই ছিল 'সমিতি' সংগঠনের ভিত্তি।[৩২] সমিতিকে প্রজাপতির কন্যা বলা হত এবং ঋগ্বেদের যুগ থেকে খৃষ্টপূর্ব ছয়-শত বৎসর পর্যন্ত এই সমিতিগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সমিতিগুলিকে 'গণ' এই নামেও অভিহিত করা হত। ভোট প্রথার ও প্রচলন ছিল।

২. রাষ্ট্র অভিহিত হত সঙ্ঘ নামে। সমস্ত বর্ণের (caste) মানুষই সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন। পাণিনি অনেক সঙ্ঘের নাম উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা গণসভায় অনুষ্ঠিত হত। কৌটিল্যও এইরূপ রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন।

রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র নির্ধারিত হত রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনমতো ও রাষ্ট্রের গণস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে দ্বিতীয় সভার ও (Second House) ব্যবস্থা ছিল, যেখানে নির্বাচিত বয়স্করা প্রতিনিধিত্ব করতেন। ভোটভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল পাশাপাশি— যাকে গ্রীকরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসাবে নির্দেশ করেছেন। এরূপ অনেক সঙ্ঘে সৈন্যাধ্যক্ষও নির্বাচিত হতেন— প্রমাণ আছে ক্ষুদ্রক, মালব সঙ্ঘগুলি শান্তি-চুক্তির জন্য একজন নয়, ১০০ থেকে ১৫০ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা কোথাও এককেন্দ্রিক ছিল না। গ্রীকরা লক্ষ্য করেছেন কোনো কোনো গণ সংসদে (Parliament) ৫০০০ প্রতিনিধি রয়েছেন— লিচ্ছবি রিপাবলিকের রাজধানী বৈশালীতে যে সংসদ বসত তার প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৭৭০৭।[৩৩] ব্যালট ভোটের প্রচলন ছিল এবং অধিক সংখ্যকের মতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত।[৩৪]

৩. প্রতিটি সঙ্ঘের মানুষ ছিল স্বাধীন ও সমান অধিকারের অধিকারী এবং এই অধিকার ছিল জন্মগত। প্রতিটি সংসার ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলক সংগঠন।[৩৫]

৪. কতকগুলি সঙ্ঘ মিলিত হয়ে সংযুক্ত-সঙ্ঘ গড়ে তুলত। এই সঙ্ঘগুলি সামরিক শক্তিতে ছিল প্রায় অজেয়— চাণক্য সে কথা স্বীকার করেছেন। গুপ্তযুগে শক্তিশালী পুষ্যমিত্র সঙ্ঘ প্রথম কুমারগুপ্তের যুগে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল। সঙ্ঘগুলির ছিল নাগরিক সৈন্য-বাহিনী। রাজতন্ত্রের ভাড়াটে সৈনিকদের থেকে এদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং নৈতিক মান ছিল অনেক উন্নত। রাষ্ট্রগুলি বিপুল রাষ্ট্রিক-সামরিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।[৩৬]

৫. 'সঙ্ঘ' বা রিপাবলিকগুলি ধনশালী ছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ছিল স্বভাবতঃই ব্যাপক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক-ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান। সঙ্ঘগুলির রাষ্ট্রকোষ কখনো শূন্য থাকত না এবং তারা আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। রিপাবলিকগুলি শক্তিশালী শিল্প সংগঠনও গড়ে তুলেছিল— যা কৌটিল্যও লক্ষ্য করেছেন। তারা বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতিতে যত্নবান ছিল, সেজন্য রাষ্ট্র আর্থিক-সংগঠনেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ বিষয়গুলির পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু আইন-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।[৩৭]

৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগ রিপাবলিকগুলির প্রথম গঠনকাল ধরলে উত্তরমদ্র বা পাণিনিরমদ্র সংঘগুলি ১৩০০ বৎসর বেঁচে ছিল বলে অনুমিত হয়। সুভাষচন্দ্র ক্ষুদ্রক, মালব, লিচ্ছবি নামক যে রিপাবলিকগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলির স্থিতিকাল ছিল প্রায় একহাজার বছব। এই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাই প্রমাণ করে এই বিপাবলিকগুলিব সাংগঠনিক সবলতা—জনগণ সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই রিপাবলিকগুলিতে সম্ভবতঃ 'Social Contıact' বা সামাজিক চুক্তি চালু ছিল।[৩৮] পরবর্তীকালে বিপুলতর সামরিক শক্তির অধিকারী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুত্থান ও রিপাবলিকগুলির অন্তর্বিরোধের ফলে রিপাবলিক ব্যবস্থার পতন ঘটে।

দুর্ভাগ্যক্রমে রিপাবলিকগুলির বিপুল আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠনের সব ইতিহাস আমাদের জানা নাই। অনেক বিকৃত ইতিহাসও বিদেশীরা রচনা করেছেন। দুঃখের বিষয, এ সম্পর্কে সন্তোষজনক গবেষণার ব্যাপারে জাতীয় সরকাবের প্রচেষ্টার কথাও আমাদের বিদিত নয়।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে পববর্তী বাজতন্ত্রেব যুগেও জনগণের স্বাধিকার বিশেষ বিঘ্নিত হয় নি।

প্রাচীন রাজতন্ত্রের প্রকৃতি

বৃটিশরা প্রচার করত তাদের সময়েই নাকি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্য সাধিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো বক্তৃতায় বলেছেন, "এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন।" সুভাষচন্দ্র উদাহরণস্বরূপ বলেছেন যে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় ভারতবর্ষ একত্রে সংগঠিত হয়েছিল। তার পর তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে ভারতবর্ষ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেছেন। দেশের তৎকালীন সামাজিক কাঠামোগুলি রাজারাও ভাঙতে পারেন নি। বস্তুতঃ তাঁবা ছিলেন 'Constıtutional Monaıch' অর্থাৎ সংবিধানসম্মত রাজা।[৩৯]

বর্ণাশ্রমধর্মী গণতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক-আর্থিক সংগঠনের পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল গ্রাম বা জনপদগুলির হাতে। শহরে ছিল 'পৌর' সংগঠন এবং গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হত পঞ্চায়েতের অধীনে।[৪০]

রাজতন্ত্রের যুগ এখন ইতিহাসের গভীরে। তবু বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক বা সাম্যতান্ত্রিক কাঠামোগুলিতে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক ভয়াবহ একনায়কী প্রশাসন ও তার কুফলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রেরও নিম্নলিখিত চারিত্রিক দিক লক্ষণীয় :

১. রাজার বেতন কেমন হবে তা স্থিরীকৃত হত রাষ্ট্রের আয়ের উপর (অর্থশাস্ত্র)। রানী, রাজপুত্রের খরচও ছিল স্থিরীকৃত। তেমনি ছিল রাজ-বাড়িতে বিবাহের যৌতুকের পরিমাণ।[৪১]

২. রাজা কোনো প্রজার শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অপরাধীর শাসক। পৌর জনপদের সাংগঠনিক বিধান অনুসারেই রাজাকে চলতে হত। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সেবক বা দাস। রাষ্ট্রের চেয়ে রাজার ব্যক্তিত্ব বড় ছিল না। কৌটিল্য— যিনি রিপাবলিকগুলির বন্ধু ছিলেন না— যাঁকে বলা হত হিন্দু Hobbes, তিনিও রাজতন্ত্রের রাজাকে খুশিমতো চলতে দিতে নারাজ ছিলেন। কৌটিল্য বলেছেন, রাজার কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাই, প্রজার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতেহিতম্। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাংতু প্রিয়ং হিতম্।'[৪২] প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার হিতেই রাজার হিত। রাজার নিজের কাছে যা প্রিয় তা তার পক্ষে হিতকর নয়। প্রজার কাছে যা প্রিয় তাই তার পক্ষে হিতকর। ভীষ্ম বলেছেন, রাজার জীবন হবে ত্যাগের জীবন। প্রজা পালন ক্ষত্রিয়ের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'সর্বধর্ম-পরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্।[৪৩] হিন্দুরাজাকে শাস্ত্র এইভাবেই দেখতে চেয়েছে।

৩. অতীতের রাজতন্ত্রের মধ্যেও গণতন্ত্রের স্থান ছিল। সামরিক কর্তারা বা অধ্যক্ষরা কোনো অসামরিক সংগঠনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না, সে ক্ষমতা সমাজ তাদের দেয় নি। সামরিক অধ্যক্ষ বা সেনাপতিরা রাজাকে গদীচ্যুত করেছেন— এ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় না।[৪৪]

৪. রাজারা পররাজ্যলোভী হতে পারতেন না। তাঁদের রাষ্ট্রিক-আর্থিক সামাজিক সংগঠন ও দেশের আত্মিক ভাবধারা— পররাজ্য বিজয়ের পথে বাধা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ— চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মৌর্য রাজতন্ত্রের অধীনে সৈন্য-সংখ্যা ছিল বিপুল— সাত লক্ষের বেশি। পারস্যে তখন রাষ্ট্রশক্তি ছিল দুর্বল কিন্তু মৌর্যরাজারা রাজ্য জয়ে মন দিতে পারেন নি। একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেনঃ "ন্যায়ের ভাব থেকেই ভারতীয় নৃপতিরা তখন ভারতের বাইরে রাজ্য বিজয়ে যান নি।[৪৫]

৫. রাজার পরিবর্তনে প্রজার অধিকার খর্ব হত না। নূতন রাজা পেতেন পুরাতন রাজার বাড়ি ও তাঁর নিজস্ব জমি-জায়গা আর আসবাবপত্র। রাজার পরিবর্তনে সামাজিক কাঠামো ভাঙে নি কখনও।

৬. রাষ্ট্র শিল্প-সংগঠনও করত। ব্যক্তিগত শিল্প-সংগঠনের বাইরেই এরূপ রাষ্ট্রচালিত বৃহৎ শিল্প সংগঠিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্র ও মানব-ধর্মশাস্ত্রে খনিশিল্প ও উৎপাদক শিল্পেব জন্য সরকারী দপ্তরের উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থা আয়ত্ত করত এবং ঐ শিল্প-গুলি থেকে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রকোষের ক্ষমতাবৃদ্ধি করত।[৪৬]

৭. হিন্দু রাজনীতিবিদরা প্রত্যক্ষ কর পছন্দ করতেন না। উৎপাদন কর ব্যতিরেকে বাস্তবিক কোনো প্রত্যক্ষ কর ছিল না। এমন-কি আমদানী করও ছিল পরোক্ষ। আমাদেব বর্তমান করনীতির সঙ্গে এর বিপুল পার্থক্য লক্ষণীয়।[৪৭]

৮. অনেক বিদেশী ঐতিহাসিক দৃঢ়ভাবে বলতে চান রাজ্যের ভূমি-সম্পত্তি রাজার অধিকারেই থাকত কিন্তু এব বিপরীতই ছিল সত্য।[৪৮] ঐ-সব ঐতিহাসিকবা তাঁদেব দেশেব ঐতিহাসিক রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিন্দু বাজতন্ত্রে যোগ করে দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায়। জৈমিনির মীমাংসা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, রাষ্ট্রের ভূ-সম্পত্তিতে বাজাব কোনো অধিকাব নাই, বাজ্য বিজয়দ্বারাও তা অর্জিত হয় না। ভূ-সম্পত্তি সকলের জন্য তাব থেকে শ্রমের মাধ্যমে সকলে ফসল অর্জন করবে। "ন ভূমি, স্যাৎ সর্বান প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ।" [Land (of a country) is not transferred (by a king) for it equally belongs to all.][৪৯] মীমাংসার উপর প্রামাণ্য টীকা ভট্টদীপিকাও এই কথা বলেছেন।[৫০]

৯. বাণিজ্য ও শিল্পে রাষ্ট্র সহায়তা করত ও উৎসাহ দান করত কারণ তারা রাষ্ট্রেব শক্তি বৃদ্ধি করে। আর্থিক ব্যবস্থার শত্রু হল জুয়া-খেলার সংগঠনগুলি এবং জুয়া খেলে যারা। রাষ্ট্রে ভিক্ষুক, চোর ও কুশী-জীবীদের স্থান থাকবে না। সমস্ত প্রকার পরজীবী থেকে কৃষিকে (বিশেষ করে) রক্ষা করতে হবে। মুনি, সন্ন্যাসী, নয় এমন অলস ভবঘুরেরা সমাজে স্থান পাবে না।[৫১]

সুভাষচন্দ্রও এই অলস ও নিষ্কর্মাদের তাঁর স্বপ্নের সমাজে কোনো স্থান দেন নি।[৫২]

উপরিউক্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় প্রাচীন ভারতের গ্রামভিত্তিক সামাজিক আর্থিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক চরিত্র রাজতন্ত্রের মধ্যেও বিশেষ বিঘ্নিত হয় নি।

সুভাষচন্দ্র বলছেন যে মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্রগুলি এবং

অসংখ্য সুপ্রাচীন পুস্তকাদি রাষ্ট্র সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে বিপুল জ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধ।[৫৩]

সেযুগের পরবর্তীকালে মোগল সম্রাটদের অধীনে বিশেষ করে আকবরের সময় রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত হয়— এই সময়ে ভারতে আকবর মুসলিম সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন।[৫৪] মুসলিম শাসকরা ভারতবাসী হয়ে গেলেন। তাঁরাও স্থানীয় শাসনে কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করেছেন।[৫৫]

বৃটিশ কিন্তু ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করে তাকে ইংলন্ডের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানীর দেশ হিসাবে গড়ে তুলে ঔপনিবেশিক শাসন চালাতে লাগল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের প্রাণসত্তাকেও শোষণ করতে চেয়েছে ; নানা-ভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতার চোখ-ঝলসানো প্রভাব আমাদের দেশের একশ্রেণীর মানুষকে দেশের ঐতিহ্যের বিরোধী করে তুলেছে এবং আধুনিকতার নামে নানা বিকৃতিও সমাজদেহে নানা দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তার উপর ভারতবর্ষে নানা প্রকার মতবাদ বৃটিশ সরকারের আনুকূল্য লাভ করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছে। আবার নূতন নূতন মতবাদের শুভ দিকগুলি নূতন যুগের সঙ্গে ভারতের নূতন পরিচয়ও ঘটিয়ে দিয়েছে। শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এ যুগের শিল্প সভ্যতা ও মানুষের চিন্তা-জগতে এক নূতন আলোড়নের সূচনা করেছে।

মতবাদের ধূম্রজাল

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রচলিত মতবাদগুলি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়নের মৌলিকতা লক্ষণীয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের পট-ভূমিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মতবাদগুলিকে বিচার করেছেন। ভারতবর্ষে পশ্চিমের মতবাদগুলি বিশেষ করে মার্কসীয় মতবাদ যখন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের মনে আলোড়ন তুলছিল এবং তাঁদের অনেকের বিচারবুদ্ধিকে গোঁড়ামির জালে জড়িয়ে ফেলছিল— কালটা তখন বিশ দশকের শেষ ও ত্রিশ দশকের প্রথম দিক। সেই সময় থেকেই সুভাষ-চন্দ্র তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নিখিল বঙ্গীয় যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে (১৩৩৪, ১লা পৌষ

তিনি বলেন : "বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বসিয়াছি…।

"সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানাপ্রকার মতের ও কর্মপ্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় : Socialism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy; Aristocracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchy,, Dictatorship ইত্যাদি। এই-সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে ২।১টি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাদন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্যদেশে রোপন করিলে সুফল না ফলিতেও পারে।

"আপনারা জানেন যে Marxism-এর তরঙ্গ এদেশে আসিয়া পেঁছিয়াছে ; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা রুশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন কিন্তু আপনার হয়তো জানেন যে রুশিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— তার সহিত Marxian Socialism এর মিল যতটা আছে— পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়।… আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে রুশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে— কারণ মনে হয় Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই-ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।… আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।"[৫৬]

অন্যত্র বলেছেন : "ভারতবর্ষ রাশিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়া বলিতে পারি, ইউরোপ আমেরিকার আধুনিক সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পরীক্ষা ভারতের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে।"[৫৭]

ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজম সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছেন : "যতক্ষণ না আমরা নির্বাচন পদ্ধতির চরমে পৌঁছাই কিংবা উহাকে একেবারে অস্বীকার করি ততক্ষণ এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে দুটি বিকল্পের মধ্যেই আমাদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ। হেগেল কিংবা বার্গসনের অথবা বিবর্তনের অন্য যে কোনো মতেই বিশ্বাস করি না কেন— কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা করিয়া লওয়া উচিত নয় যে সৃষ্টি চরম অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে।"[৫৮]

টোকিয়ো বক্তৃতায় (নভেম্বর '৪৪) বলেছেন : "যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা বলা বোকামি হবে যে কোনো একটি পদ্ধতি মানব-প্রগতির শেষ কথা। দর্শনের ছাত্র হিসাবে আপনারা স্বীকার করবেন যে মানব-প্রগতি কখনো থামতে পারে না এবং পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নূতন পদ্ধতি তৈরি করব। সেজন্য আমরা ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতি-গুলির সমন্বয় সাধন করব এবং তাদের ভালো দিকগুলি তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করব।"[৫৯]

টোরীদলের প্রচারের প্রতিবাদে জেনেভা থেকে সুভাষচন্দ্র বলেছেন : "আমার নিজের মত হল আধুনিক যুগের বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনের মধ্যে যা-কিছু ভালো ও দরকারী পাওয়া যাবে সে-সবের সমন্বয় সাধন করাই ভারতবর্ষের কাজ।... কোনো পূর্বকল্পিত প্রবণতা বা পক্ষপাতহেতু কোনো আন্দোলনকে অবহেলা করলে আমাদের আহাম্মুকী হবে।"[৬০] কারণ সমস্ত মনীষীদের চিন্তাই পৃথিবীর সম্পদ।[৬১] ভারতবর্ষে অতীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নূতন নূতন মতবাদের শ্রেষ্ঠ অংশের সমন্বয়েই সুভাষচন্দ্র তাঁর সাম্য-সমন্বয়ের মতবাদ গড়ে তুলেছেন।

সুভাষচন্দ্র সমাজের আর্থিক সংগঠনের ব্যাপারে গান্ধীজীর মতা-মতকে কমিউনিজমের বিকল্প মনে করেন নি। বলেছেন : "মহাত্মা ভারত-বর্ষকে তথা বিশ্বকে দিয়েছেন একটি নূতন পদ্ধতি; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যা-গ্রহ কিংবা অহিংস অসহযোগের পদ্ধতি।... সমাজ পুনর্গঠনের আর একটি মতই কমিউনিজমের বিকল্প হতে পারে।"[৬২] একটি সুসংগঠিত আদর্শবাদী ভারতীয় দলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারতের সামাজিক পুনর্গঠনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।[৬৩] কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ধ্যানধারণা সুবিদিত। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রবন্ধে পরে আলোচিত হবে। সুভাষচন্দ্র তাঁর নানা বক্তৃতায়, রাজনৈতিক দলের

প্রোগ্রামের মাধ্যমে অন্যান্য মতবাদের আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে তাঁর সমাজ সংগঠনের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রংপুর ভাষণে (৩০-৩-১৯২৬) সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ "এই সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের পুঁথিতে জন্ম নেয় নি এবং এর উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষেরই চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে।"[৬৪]

জাতীয়তা, ধর্মনীতি, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমের সঙ্গে তাঁর মতের ভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। তার পর কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে সেগুলি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে কিন্তু সবদিকে নয়। বলেছেন ঃ "অর্থনীতিব ক্ষেত্রে এই মতবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান (যথা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নীতি) থাকিলে ও অন্যান্য বিষয়ে তা জোরালো নয়। যেমন, মুদ্রা-বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে এর নূতন কোনো অবদান নাই। এ-বিষয়ে এই মতবাদ চিরাচরিত অর্থনীতিই অনুসরণ করে চলেছে। যাই হোক তা সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পৃথিবীব মুদ্রা-বিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনো নিকটবর্তী নয়।"[৬৫]

তিনি Currency, Exchange ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ-কাল থেকেই নূতন তত্ত্ব ও নীতির সন্ধান করছিলেন এবং কংগ্রেসের এ বিষয়ে কোনো বিশিষ্ট নীতি নাই বলে মার্চ ১৯২১ সালে সমালোচনা করেছিলেন।[৬৬] মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তার কাঙ্ক্ষিত মুদ্রানীতির সন্ধান পান নি। বর্তমান মুদ্রানীতি সাম্যপন্থী নূতন আর্থিক সংগঠনের পথে অপ্রতুল। সেজন্য সুভাষচন্দ্র তীক্ষ্ণভাবে নূতন মুদ্রানীতির অনুসন্ধান করেছেন, যা হবে নূতন আর্থিক সংগঠনের অন্যতম চালকশক্তি।

গোঁড়া মার্কসপন্থীরা নূতনচিন্তার প্রতি একটি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করে থাকেন কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে স্বীকার করতে হবে মার্কস একজন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বগুলির মতোই তাঁর তত্ত্বগুলির ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অর্থনীতিবিদ Oskar Lange বলছেন ঃ "...not unlike Ricardo...he was unable to find a clear functional expression of the law of demand. The limitations of Marx and Engels are those of the classical economists."[৬৭]

রিকার্ডোর মতোই তিনি চাহিদার সূত্রের সুস্পষ্ট কার্যকরী ব্যাখ্যা

খুঁজে পান নি। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌দের মতো মার্কস ও এঙ্গেলসের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র মার্কসের মুদ্রাতত্ত্ব গ্রহণ করেন নি। মুদ্রার স্বরূপ সম্পর্কে মার্কসীয় অর্থনীতি নূতন কোনো দিক্‌-দর্শন দিতে পারে নি। সুভাষচন্দ্র অর্থতত্ত্বে পৃথিবীর গবেষণাগুলির ভিতর থেকে সন্তোষজনক মুদ্রা-তত্ত্বের অন্বেষণ করছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর তাঁর গঠিতব্য নূতন দলের নূতন কার্যক্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন: "আমার নিজের মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক চিন্তাধারার ও নব নব পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে নতুবা আমরা সাফল্য অর্জন করিতে পারিব না। স্বাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। শিল্প, কৃষি, ভূমিস্বত্ব, অর্থ, বিনিময়, কারেন্সি, শিক্ষা, কারাশাসন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও নূতন পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে সোভিয়েত রাশিয়াতে সে দেশের ঘটনাবলী ও অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া একটি নূতন জাতীয় (বা রাজনৈতিক) অর্থনীতির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিবে। আমাদের অর্থনৈ-তিক সমস্যা সমাধানে পিগু ও মার্শাল বিশেষ কাজে আসিবে না।

"ইউরোপ ও ইংলন্ডে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরাতন মতবাদ দ্বন্দ্বের সম্মু-খীন হইতেছে এবং পুরাতন মতবাদের স্থলে নূতন মতবাদ আসন গ্রহণ করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায়, সিলভিও গেসেলের উদ্ভাবিত নূতন "ফ্রি-মানি"-মতবাদ জার্মানীর ছোট একটি জনপদে প্রবর্তন করা হইয়াছিল এবং তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জমিদার, পুঁজিপতি ও উচ্চবর্ণদের দেশরূপে পরিগণিত হইবে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[৬৮]

অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল গোঁড়া অর্থতত্ত্বের চিন্তাবিদ গোষ্ঠীর অন্যতম অগ্র-দূত। একটি স্থিতিশীল আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণের জন্যই তাঁরা অধিক সময় নিয়োজিত করেছেন, যেখানে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। এর ফলে প্রতিষ্ঠান-গত ব্যাপারের দিকে তাঁরা মনোযোগ দেননি বলেই চলে। পিগুকে বলা হয় মার্শালের ঐতিহ্যের প্রতীক যদিও তিনি স্বীকার করছেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতি সম্ভব কিন্তু আর প্রতিষ্ঠা অস্বাভাবিক কঠিন।[৬৯]

সুভাষচন্দ্রের কল্পিত ভারতীয় সমাজের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নীতির ও পদ্ধতির উদ্ভব হবে এবং পৃথিবীর নূতন গবেষণার ভালোদিকগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হবে। বর্তমান প্রগতির দিকে অর্থনীতির নূতন নূতন পরীক্ষার আত্যন্তিক প্রয়োজনে পুরাতন চিন্তাবিদদের অনেক তত্ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে সময়ের বিচারে মার্কসও একজন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ। অর্থনৈতিক তত্ত্বে নূতন নূতন চিন্তার প্রবাহ এগিয়ে চলেছে। গেসেলের মুদ্রাতত্ত্ব সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) আর্থিক চিন্তা সম্পর্কে ধারণার সুবিধার জন্য গেসেলের তত্ত্বের কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

গেসেলের ফ্রি-মানি তত্ত্ব

মুদ্রার শোষণ ক্ষমতা এবং তার থেকে উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে সিলভিও গেসেল (১৮৬২-১৯৩০) একটি নূতন তত্ত্ব দিয়ে গেছেন যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত রচনা হল 'The Natural Economic Order' যার মধ্যে তিনি তাঁর 'Free Money' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের নিম্নোক্ত মন্তব্য এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে: "We have no use of the teachings of the former generation regarding land tenure and money. New teachings on money-interest have come to the forefront, as those evolved by Silvio Gesell etc." (undated quotation from Freedom & Plenty, Los Angeles).১০ অর্থাৎ ভূমিস্বত্বের নীতি ও মুদ্রাতত্ত্বের বিষয়ে পূর্বতন যুগের নীতির আর প্রয়োজন নাই। অর্থের সুদ সম্পর্কে নূতন চিন্তাবাজি উপস্থাপিত হয়েছে— যেমন সিলভিও গেসেলের তত্ত্ব।

এই পুস্তক সম্পর্কে আরও দু-একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হল:—

জন মেনার্ড কীনস বলছেন: "বলা যেতে পারে মার্কসের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই এই পুস্তকের লক্ষ্য। এটি স্বাধীন বাণিজ্যতত্ত্বের প্রতিক্রিয়া কিন্তু তা মার্কসের তত্ত্বগত ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ…গেসেলের তত্ত্ব আর্থিকক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার উচ্ছেদের উপর নয়। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বংশধরেরা মার্কস অপেক্ষা গেসেলের চিন্তাধারা থেকেই বেশী শিক্ষালাভ করবে।… আমার মনে হয় মার্কসবাদের উত্তর 'The Natural Economic Order' পুস্তকের ভূমিকায় বর্ণিত বক্তব্য অনুসারেই পাওয়া যাবে… ।১১

"স্ট্যাম্পযুক্ত মুদ্রার বিষয়ে গেসেলের চিন্তার বলিষ্ঠতা স্বীকার্য।"[৭২]

মহম্মদ আবু সৈয়দ (মরক্কো সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা; আরব লীগের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) বলেছেন ঃ

"সিলভিও গেসেলকে দীর্ঘদিন স্বীকৃতি জানানো হয় নি। কিন্তু তাঁর মতো বিরাট সামাজিক-আর্থিক সংগঠনতত্ত্বের অন্য কোন গবেষকের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয় নি। তাঁর মুখ্য গ্রন্থ 'The Natural Economic Order' আর্থিক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি এবং তা ধনতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী।··· গেসেলের সুদতত্ত্ব কোরানের শিক্ষার অনুরূপ···।"[৭৩]

গেসেল বলেছেন যে তিনি প্রুঁধোর পুঁজির প্রকৃতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন কিন্তু প্রুঁধো যেখানে Exchange Bank-এর মাধ্যমে সমাধান চেয়েছেন, যা সফল হয় নি— তিনি সেখানে একটি তাত্ত্বিক সমাধান দিয়েছেন। তাঁর 'ফ্রি-মানি' তত্ত্ব বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়ে সুফল দিয়েছে। আর ন্যাচারাল ইকনমিক অর্ডার চালু হলে সমস্ত বিশেষ অধিকার বন্ধ হবে।[৭৪]

বর্তমান বিশ্বে শ্রমবিভাজনবিন্ধ অর্থনৈতিক সমাজে মুদ্রা ব্যতিরেকে চলে না। Barter (দ্রব্যবিনিময়) খুব সীমাবদ্ধভাবে চলতে পারে মাত্র। মুদ্রা আর্থিক লেনদেনের নিয়ন্তা। উৎপাদকেরা বাধ্য হন বাজারে পণ্যবিক্রয়ের জন্য মুদ্রার দারস্থ হতে। কারণ শ্রমবিভাগের ফলে লেনদেনের একটি মাধ্যম অপরিহার্য। এখন বাজারে পণ্য এল কিন্তু মুদ্রার অধিকারী পণ্য কিনতেও পারে, নাও পারে কারণ মুদ্রার ক্ষয় নাই, কিন্তু পণ্যের অধিকারীর পক্ষে পণ্যরাজি মুদ্রার মতো দীর্ঘ সময় ধরে রাখা সম্ভব নয়। মুদ্রা ও পণ্যের বিনিময়ে মুদ্রার কৌলীন্য যুগ যুগ ধরে অর্থবানকে সমাজে বিপুল আধিপত্য দান করেছে। বর্তমান মুদ্রাতত্ত্বের জন্য মুদ্রার অধিকারী পণ্যের অধিকারী থেকে বিনিময়ের শর্তে বেশী শক্তিশালী হয়ে শোষণকারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মুদ্রার অধিকারীর খেয়ালখুশিতে পণ্য অধিকারীর বিপর্যয় ঘটছে অহরহ। ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা ঘটানোর মূলে রয়েছে মুদ্রার অনিশ্চিত আচরণ। কিন্তু মুদ্রার মাধ্যম ব্যতিরেকে উৎপাদনকারীর পণ্য, ব্যবহারকারীর (ভোক্তার) কাছে পেঁছিতে পারে না। বাজারের মূল্য স্থিরীকৃত হয় চাহিদা-যোগানের সূত্রে; কিন্তু মুদ্রার বর্তমান কৌলীন্যের জরে আমরা বাজারে যে মূল্যমানের সম্মুখীন হই তা প্রকৃত মূল্য নয়। চাহিদা-যোগানের স্বাভাবিক সম্পর্কে মূল্য এখন স্থিরীকৃত হয় না। এটি তখনই সম্ভব যখন মুদ্রার মান পণ্যের মানের পর্যায়ে

রূপান্তরিত হয়। তা করতে হলে মুদ্রার সুদ দাবি করার ক্ষমতা রোধ করতেই হবে এবং ক্রমক্ষীয়মান নোট-মুদ্রা চালু হলেই তা সম্ভব।

গেসেল তাই 'Stamped Money' বা স্ট্যাম্প-যুক্ত নোট-মুদ্রার সুপারিশ করেছেন যার মূল্যে হ্রাস হবে, ধরুন বছরে শতকরা পাঁচভাগ। প্রতি সপ্তাহ বা মাসে আনুপাতিক হারে দাম কমবে, তখন নূতন স্ট্যাম্প যোগ করে সেই নোট-মুদ্রাকে তার প্রারম্ভিক মূল্যে উন্নীত করতে হবে। উদাহরণের সুবিধার জন্য, ধরুন বছরে ৫.২% হারে নোট মুদ্রার দাম হ্রাস করল রাষ্ট্র। তা হলে ১০০ টাকার নোটের মূল্য কমে দাঁড়াবে ৯৪.৮০ টাকায়। প্রতি সপ্তাহে আনুপাতিক হারে দাম কমবে অর্থাৎ ৫২ সপ্তাহে বছর ধরলে সপ্তাহ-প্রতি ১০ পয়সা ও মাস-প্রতি (৪ সপ্তাহে মাস ধরলে) ৪০ পয়সা কমবে। মুদ্রার অধিকারীকে প্রতি সপ্তাহের শেষে ১০ পয়সা বা মাসের শেষে ৪০ পয়সার স্ট্যাম্প এঁটে দিতে হবে প্রতি ১০০ টাকার নোটে (তাতে স্ট্যাম্প এঁটে দেবার ব্যবস্থা থাকবে)। বছরের শেষ পর্যন্ত (৫২ সপ্তাহে) ৫টাকা ২০ পয়সার স্ট্যাম্প যুক্ত হবে, তবেই তার মূল্য তখন ১০০ টাকায় থাকবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হলে ব্যাঙ্ক নোটের উপর— সেই তারিখ পর্যন্ত স্ট্যাম্প দেওয়া আছে— কথাটি উল্লেখ করে দেবে। নোট-অধিকারী যতদিন নোট কাছে রাখবেন ততদিন উপরোক্ত হারে স্ট্যাম্প যুক্ত করে যাবেন।[৭৫]

সঞ্চয়কারী এখন নোট-মুদ্রা ধরে রাখতে উৎসাহিত হবে না— কারণ নোটের মূল্য কমতে থাকবে লোহার সিন্দুকের মধ্যেই। মুদ্রা-অধিকারী মুদ্রা দিয়ে বাজারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে ফেলতে তৎপর হবে ; পণ্য-উৎপাদনকারী যেমন পণ্য নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় পণ্য দ্রুত বিক্রয় করে ফেলতে আগ্রহান্বিত হয়। মুদ্রা এখন বাজারে পণ্যের চেয়ে বেশী মর্যাদা দাবি করতে পারবে না।

ফ্রি-মানির উদ্দেশ্য হল মুদ্রার অন্যায় অধিকার ভেঙে দেওয়া। [The purpose of Free Money is to break the unfair privilege enjoyed by money.][৭৬]

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে মুদ্রার ক্ষীয়মানতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, সেজন্য ব্যাঙ্কের কাছে সুদের দাবি থাকবে না। 'ফ্রি-মানি' সাবলীল ভাবে চালু হয়ে গেলে সুদের অবসান ঘটবে। সুদ আর্থিক সংগঠনের স্বাভাবিকতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাই সুদের উচ্ছেদ অপরিহার্য। যাই হোক, উপরোক্ত মুদ্রা (স্ট্যাম্প-যুক্ত মুদ্রা) এখন আর পুঁজির মতো কাজ করতে পারবে না— পূর্বে যেমন

করছ। পণ্য বিনিময়ে সুদের বিলোপ ঘটবে— কারণ মুদ্রার সুদ দাবি করার ক্ষমতা লুপ্ত হবে।[৭৭]

'ফ্রি-মানি' পণ্য-উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে— পণ্য বিনিময়ে আর ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। অবশ্য মুদ্রার মূল্য কি পরিমাণ হ্রাস করা হবে বা অন্য কোনো উপায়ে মুদ্রার ক্ষীয়মানতা চালু করা যায় কিনা-- তা নির্ভর করবে রাষ্ট্রের পরীক্ষার উপর।

এখন কি পরিমাণ অর্থ বাজারে ছাড়া হবে -- তা স্থিরীকৃত হবে রাষ্ট্রের কারেন্সি অফিসের বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। বাজারে মূল্যমানের সূচকই মুদ্রার পরিমাণ কত হবে, তার নির্দেশ দেবে। গেসেল তাই বলছেন: "Free money is a stabilised paper-money currency; the currency notes being issued or withdrawn in accordance with index number of prices, with the aim of stabilising the general level of prices."[৭৮]

ফ্রি-মানি হচ্ছে স্থিতিশীল কাগজী-মুদ্রা—মূল্যমানের সূচক-অনুসারে যা বাজারে ছাড়া হবে কিংবা বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে ; লক্ষ্য হবে, মূল্যমানের সমতা-রক্ষা।

সেই মুদ্রা ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, টাকার হতে পারে, তখন স্ট্যাম্পও ১, ২, ৫, ১০, ২০, বা ৫০ পয়সার পাওয়া যাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে ৫·২% হারে নোটের মূল্য হ্রাস হবে-— স্ট্যাম্প যোগ করে তা পূরণ করতে হবে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে। বছরের শেষে পুরো স্ট্যাম্প অর্থাৎ ১০০ টাকার নোটে ৫ টাকা ২০ পয়সার স্ট্যাম্প বা ১০ টাকার নোটে ৫২ পয়সার স্ট্যাম্প দেওয়া নোটের বদলে নূতন নোট দেওয়া হবে। প্রয়োজনমতো বছরে দুবারও বদল করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 'ফ্রি-মানি' চালু হলে মুদ্রা-অধিকারীর যে-মুদ্রার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা নাই, তা ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা তাতে বেড়ে যাবে এবং ব্যাঙ্ক সামান্য সুদের বিনিময়ে দাদন ছাড়লে বাজারে ধার গ্রহীতার অভাব হবে না।[৭৯] স্বভাবতঃই অর্থের বিনিয়োগ যাবে বেড়ে এবং বেকার সমস্যারও সুরাহা হবে। (cf. Keynes) *।

* scale of investment is promoted by a *low* rate of interest... Thus it is to our best advantage to reduce rate of interest... at which there is full employment. (Chapt. 24. Concluding Notes on the Social Philosophy towards which The General Theory might lead—Keynes : The General Theory of Employment, p.375)

গেসেল তাই বলছেন : "(ফ্রি-মানি অর্থনীতিতে) যে-কোনো প্রকারেই মুদ্রার বিনিয়োগ হোক-না কেন তা তৎক্ষণাৎ চাহিদা সৃষ্টি করবে। মুদ্রার অধিকারী প্রত্যক্ষভাবে পণ্য কিনবে কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে ধার দেবে— সেজন্য তার অধিকারে যে অর্থ রয়েছে তার সবটাই বাজারে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করবে।

"চাহিদা তখন, ১. স্টেট কর্তৃক বাজারে যে মুদ্রা ছাড়া হয়েছে তার এবং ২. বর্তমান বাজারের কাঠামোর মধ্যে মুদ্রা-পণ্য বিনিময়-গতির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ হারের (maximum velocity of circulation) গুণফলের সমান হবে।

"বাজারে অর্থের চাহিদা - মুদ্রা-অধিকারীর ইচ্ছা, মধ্যবিত্তের ভীতি, জুয়া-প্রেমিকের কল্পনা এবং ফাটকা বাজারীর মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করবে না…।

"বাজারের গতি-প্রকৃতি কারেন্সি অফিসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসার ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বেকারীর সমস্যা থাকবে না।"[৮০]

মূল্য-মানের স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।[৮১]

'ফ্রি-মানি' অর্থনীতিতে গচ্ছিতকারীর অর্থ সুদখোরের টাকা, গৃহে গৃহে সাবধানী গৃহস্থের এবং ব্যবসায়ীর অলস-জমা— বাজারে বেরিয়ে পড়বে।[৮২]

বাজারে ছাড়া সমস্ত অর্থ ও বাজারের চাহিদা হবে সমান ও সমার্থক ; সেখানে কোনো বিঘ্ন ঘটতে পারবে না।[৮৩]

সুদের অবলুপ্তির পরে অনর্জিত আয় বন্ধ হবে, মূলধনের উপর সুদ না থাকায় বা কমে যাওয়ায় এবং মন্দার অবসান ঘটায় শ্রমিকেরও আয় যাবে কয়েক-গুণ বেড়ে ; শ্রমিক তার ব্যক্তিগত উৎপাদন-দক্ষতার মূল্য পাবে।[৮৪]

উপরের আলোচনায় দেখা গেল মুদ্রার (কাগজী মুদ্রার) নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্রের কারেন্সি অফিসের হাতে। গেসেলের মতে স্বর্ণমানের অবসান ঘটাতে হবে— ঘটছেও।. নিয়ন্ত্রিত কাগজী-মুদ্রা তার স্থান স্বভাবতঃই দখল করে নিচ্ছে। মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণের শক্তিই তো রাষ্ট্রের শক্তি। বলছেন গেসেল : "Money requires a State ; without a State money is not possible ; indeed the foundation of State may be said to date from the introduction of money."[৮৫] মুদ্রার জন্য রাষ্ট্র চাই ; রাষ্ট্রব্যতিরেকে মুদ্রা থাকা সম্ভব নয় ; বস্তুতঃ বলা যেতে পারে, মুদ্রার প্রচলন হল যখন, তখনই হল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

গেসেল মার্কসের Surplus Value Theory (উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব) গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে এই তত্ত্ব বা Theory of Exploitation ত্রুটি (যে নামে

সমাজতন্ত্রীরা Surplus Value Theoryকে অভিহিত করে থাকেন) বিনিময়ের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

সুদের সমস্যাটিও মার্কস এড়িয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে গেসেল পূর্ব-জার্মান এস্টেটগুলিতে বেতন বৃদ্ধি (১৯০৭ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত) এবং জাপানে অল্পকালের ব্যবধানে ৩০০% বেতন বৃদ্ধির উল্লেখ করে শ্রমিককে ন্যূনতম খাওয়া-পরা (cost of breeding) দেওয়া হয় মাত্র— বেতনের এই আলোচনার পদ্ধতিকেও সমালোচনার করে বলেছেন যে সর্বহারার জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মার্কসের ব্যাখ্যা যুক্তিভিত্তিক নয়।[৮৬] গেসেলের মতে প্রচলিত মুদ্রাতত্ত্বই সর্বহারাদল সৃষ্টির জন্য দায়ী। গেসেল বলছেন : "Our traditional form of money is capable unaided of reducing the mass of the population to the condition of a proletariat....

"...Our traditional form of money has produced the proletarian masses."[৮৭]

আমাদের প্রচলিত প্রকারের মুদ্রা জনসমষ্টিকে সর্বহারার অবস্থায় পরিণত করতে এককভাবে সক্ষম…।

…আমাদের প্রচলিত মুদ্রা সর্বহারার দল সৃষ্টি করেছে।

অর্থের interest বা সুদ অর্জনের জন্য সর্বহারা সৃষ্টির প্রয়োজন। "...indispensibility of money must produce the proletariat necessary for interest upon real capital and for the circulation of money."[৮৮]

মুদ্রার অপরিহার্যতা অবশ্যই সর্বহারা সৃষ্টি করবে কারণ প্রকৃত পুঁজির উপর সুদ অর্জনের ও মুদ্রার চলাচলের জন্য সর্বহারা প্রয়োজন।

'ফ্রি-মানি' অর্থনীতিতে সুদ থাকছে না— সর্বহারাও থাকবে না।

গেসেলের 'ফ্রি-মানি' তত্ত্বের সার্বিক প্রয়োগ সমাজে এখনো ঘটে নি কিন্তু আর্থিক বিপর্যয় রোধ করবার জন্য বিভিন্নদেশে তার সাময়িক প্রয়োগ ঘটেছে। সুভাষচন্দ্র জার্মানীর একটি অংশে এর সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন। গেসেলের জীবদ্দশাতেই Hans Timm কর্তৃক জার্মানীতে ; পরে ১৯৩২এ উর্গলের মেয়র কর্তৃক অস্ট্রিয়াতে এবং মন্দার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রয়োগ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালে Bankhead—Pettengill বিলে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারীকে এক ডলার নোটে সপ্তাহে দু' সেন্ট স্ট্যাম্প যোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে

এক বছরেই ডলার-মুদ্রার দাম ১০০%ই হ্রাস পায়। ব্যাপক ঋণদাননীতি গ্রহণ সত্ত্বেও যখন কারেন্সির গতির মন্দাভাব কাটল না— তখনই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৮৯]

আমেরিকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Irving Fisher ও স্ট্যাম্পযুক্ত মুদ্রার কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছেন।[৯০]

১৯৪৮ সালে সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল পার্লামেন্টে সুইস ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক চার্টারের সংশোধনীর (Bernoulli-Schmid) মাধ্যমে গেসেলের 'ফ্রি-মানি' নীতি গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়; যাতে মুদ্রা-পণ্য বিনিময়ের গতির হার বাড়িয়ে দেশের আর্থিক মন্দা কাটিয়ে ওঠা যায়। প্রস্তাবে মুদ্রা-মূল্যের ক্ষীয়মানতার হার রাখা হয়— বৎসরে অনধিক ৬%।[৯১]

ভূমিস্বত্ব ও গেসেল

গেসেলের মতে সম্পত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বে কমিউনিস্টরা চরম-দক্ষিণপন্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেজন্য তাদের পন্থা প্রতিক্রিয়াশীল; কিন্তু তাঁর বর্ণিত তত্ত্ব চরম বামপন্থার নির্দেশ দেয়। কমিউনিস্টরা ভূ-সম্পত্তি সমষ্টিকরণের কথা বলেন কিন্তু বেতন একত্র করে সমবন্টনের কথা বলেন না।[৯২]

গেসেল বলছেন: "জমির উপর সর্বময় অধিকার কারো নাই, কেউই তার উপর থেকে কোনো বিশিষ্ট সুবিধা আদায় করতে পারবে না।" [No private individual, no State no society may retain any kind of privileges over the land, for we are all natives of the earth.][৯৩]
গেসেলের এই চিন্তাধারা প্রাচীন-ভারতের ভূমিনীতির সঙ্গে তুলনীয়।

গেসেল তাঁর ভূমি-তত্ত্বে এই জমির নাম দিয়েছেন 'ফ্রি-ল্যান্ড'। সরকার জমি দেবেন 'লীজ' হিসাবে— আদায়ীকৃত rent (জমি থেকে অনর্জিত আয়) রাষ্ট্রের ভান্ডার থেকে প্রতিমাসে মাতৃকুলের মধ্যে বিতরিত হবে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে।[৯৪]

জমির পরিমাণ যা লীজ হিসাবে দেয়— তা কৃষকের প্রয়োজনভিত্তিক হারে বণ্টিত হবে। [The parcelling of land is governed entirely by the needs of the cultivators. That is small lots for small families, large lots for large families.][৯৫]

রাষ্ট্র সব জমি নিয়ে তা নিলামে বিলি করতে পারেন, ১, ৫, ১০ বৎসর বা যাবজ্জীবনের জন্য; তাতে শর্ত থাকবে— জমির উৎপাদন-ক্ষমতা যেন নষ্ট করা না হয়; আর কৃষক জমিতে সার দেবেন যথোপযুক্তভাবে—গোময় ও

খড় এতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এগুলি কৃষক বিক্রয় করে ফেলবেন না। রাষ্ট্রও শর্ত পালন করবে, যেমন কৃষককে উচ্ছেদ করা যাবে না— তিনি যদি শর্ত পালন করেন। আর দুর্ঘটনা, বন্যা, অসুস্থতার জন্য তাঁর জীবনবীমার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। এতে হবে rent থেকে ব্যক্তিগত লাভের অবসান, জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রথার বিলোপ, ও জমি খণ্ডীকরণ রোধ। থাকবে না কোনো জমিদার, থাকবে না কোনো ভূমিদাস।[৯৬]

গেসেলের 'ফিন্‌-মানি' তত্ত্ব (ফিন্‌-ল্যান্ড তত্ত্বও) সমাজে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বহন করছে।[৯৭] একটি বিপ্লবী মানসিকতা ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাগুলি তাদের স্ব স্ব অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্থিতস্বার্থ ভাঙতে চায় না— বা তাতে অপারগ। তার ওপর আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাধ্য-বাধকতা এবং বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমানের অস্তিত্বও 'ফিন্‌-মানি' তত্ত্ব প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করবে।

স্থিতস্বার্থের সমাজ, সে কমিউনিস্ট বা লিবারেল যে-নামেই অভিহিত হোক, ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়াশীলতার বাহন হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজবিবর্তনের নিয়মে একদিন তা অনিবার্যভাবেই ভাঙবে। সাবলীলতত্ত্বের সন্ধানে তখন নূতন নূতন গবেষণা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। নূতন পথের বিপ্লবী দিশারীরা মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী এক স্বাধীন গতিশীল সমাজ-সংগঠনের পথনির্দেশ দেবেন। শোষণহীন সমাজ-সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীন-সত্তার বিকাশ ঘটানোই হবে তাঁদের লক্ষ্য। সাম্যপন্থী নূতন অর্থনীতির প্রয়োগ সেই সমাজের বাস্তব ভিত্তি রচনা করে পৃথিবীতে এনে দেবে নূতন আদর্শ সমাজের দিক্‌দর্শন। সুভাষ মননে ও স্বপ্নে এরূপ আদর্শ সমাজ-সংগঠনের আহ্বান রয়েছে ভারতবাসীর কাছে— যে সমাজ বিশ্বের কাছেও আদর্শ সৃষ্টি করবে।

অখণ্ড স্বাধীনতা ও সাম্যের পূজারী সুভাষচন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে গেসেলের চিন্তাধারা লক্ষ্য করেছেন; গেসেলের 'ফিন্‌-মানি' তত্ত্বের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রের বিনাশসাধন ও নূতন এক সাম্যতন্ত্রী স্বাধীন আর্থিক সমাজ সংগঠন। গেসেল তাঁর মুদ্রাতত্ত্বের সাহায্যে অর্থনৈতিক উৎপাদনে স্বাভাবিক এবং সংঘাত-মুক্ত গতিবেগ এনে দিতে চেয়েছেন— যার মাধ্যম হবে সুদ-মুক্ত ফিন্‌-মানি

(আর ফি-ল্যান্ড)। এটি কোন ধনবাদী, রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদী বা মিশ্র অর্থনীতি নয়। এর বৈশিষ্ট্য স্বকীয় এবং কমিউনিস্ট ও ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প।

সুভাষচন্দ্র স্বর্ণমান (gold standard) গ্রহণ করেন নি এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে পণ্য-বিনিময়ের (barter) নীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার কথা বলেছেন।[৯৮] কারণ শুধু বিনিময়হারের খুশিমতো তারতম্য করে বৃটেন ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছে।[৯৯]

নেতাজীর সাম্যবাদ বা সমন্বয়বাদে নূতন ও সাহসিক পরীক্ষাগুলির সফল অংশসমূহ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে, অবশ্য ভারতীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার এবং দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখেই গ্রহণ-বর্জন করতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা স্বভাবতঃই বহুবাদী (pluralistic); তা কোন স্থিতিশীল dogma বা গোঁড়া-মতবাদ নয় যদিও তার অচঞ্চল লক্ষ্য সাম্য ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "ফরোয়ার্ড ব্লক একটি প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সংগঠন। সেইজন্য ইহা মুখস্থ করা নীতিবাক্য এবং রাজনীতির পাঠ্য-পুস্তকগুলির বাঁধাবুলি বলে না। ইহা বহির্জগৎ থেকে প্রাপ্য সমস্ত জ্ঞান আহরণ করিতে ও অন্যান্য প্রগতিশীল জাতিসমূহের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হইতে উৎসুক। ইহা জানে প্রগতি বা বিবর্তন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেখানে ভারতবর্ষেরও কিছু দিবার আছে।"[১০০] গেসেলের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টির তাৎপর্য এই পটভূমিতে গ্রহণ করতে হবে।

মার্কসীয় মুদ্রাতত্ত্বের দুর্বলতা লক্ষ্য করলেও সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে পরিকল্পনার পরীক্ষার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন (অবশ্য মার্কস নিজে পরিকল্পিত অর্থনীতির কোন ছক দিয়ে যান নি)। রাশিয়া পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের শিল্পোন্নতি ঘটিয়েছে। জার্মানীতে ফ্যাসিস্ট সরকারও যে পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত শিল্প সংগঠন করেছে, সুভাষচন্দ্র তাও লক্ষ্য করেছেন।[১০১] কিন্তু বলেছেন ফ্যাসীবাদ ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কারে সক্ষম হয় নি— (টোকিয়ো বক্তৃতা)।[১০২] অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশকে দ্রুত উন্নত করে তোলার জন্য পরিকল্পনা (প্ল্যানিং) অনিবার্য। বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে কিন্তু আমাদের দেশের পরিকল্পনা কোনো অন্ধ অনুকরণ হবে না।

ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রই সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোর প্রথম প্রবক্তা। তাঁর চিন্তাধারা ভারতে প্রযোজ্য নূতন এক পরিকল্পনা-নীতির নির্দেশ দিয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের আর্থিক কর্মনীতির খসড়া ও জাতীয় পরিকল্পনা

কৃষি ও শিল্পে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাষ্ট্রকে জনস্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্য কিছু সময়ের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর্তৃত্বমূলক (Authoritarian) রাষ্ট্রিক কাঠামো প্রয়োজন হবে। ভারতবর্ষে দ্রুত সাম্যতন্ত্রী ও স্বাধীন সমাজের রূপায়ণে তা অনিবার্য এবং তা না হলে ধনবাদী চক্রান্তকে শীঘ্র ধ্বংস করা যাবে না। দ্রুত শিল্পায়ন না ঘটলে জনতার দারিদ্র্যের নিরাকরণ ও বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সাম্য ও স্বাধীনতা অখণ্ড; বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, এর বাস্তব রূপায়ণে বাস্তব পন্থার প্রয়োজন। "স্বাধীন ভারতবর্ষ জমিদার, পুঁজিপতির ও উচ্চবর্ণদের দেশ হবে না।"[১০৩]

সুভাষচন্দ্রের আদর্শবাদের মধ্যে ছিল বলিষ্ঠ বাস্তবতাবোধ— যা আমরা প্রাচীন ভারতের আর্থিক-সামাজিক কাঠামোতে লক্ষ্য করেছি। সাম্যবাদী বা সমন্বয়বাদী আদর্শ রূপায়ণের আশু প্রয়োজনে তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মধারা ব্যক্ত করেছেন।

টোকিয়ো বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "আমরা চাই আমাদের পুরানো সংস্কৃতির ও সভ্যতার উপর একটি আধুনিক জাতি গঠন করতে। সেজন্য আমরা চাই আধুনিক শিল্প, একটি আধুনিক সৈন্যদল এবং অন্যান্য সকল জিনিস যা বর্তমান অবস্থায় আমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বজায় রাখবে।

"...প্রাকৃতিক সম্পদে আমরা ধনী, কিন্তু বৃটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির শোষণের ফলে দেশ গেছে দরিদ্র হয়ে। সেজন্য আমাদের দ্বিতীয় (প্রথম আত্মরক্ষা) বৃহত্তম সমস্যা কেমন করে লক্ষ লক্ষ বেকারজনকে কাজ দেওয়া যায় এবং কিভাবে জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য দূর করা যায়।

"...জাতীয় সমস্যাগুলি, বিশেষ করে আর্থিক সমস্যা সমাধানের বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর আমরা ছেড়ে দিতে পারি না; বর্তমানে ভারতের জনমত হচ্ছে তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা যদি দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছেড়ে দিই তা হলে সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। সেজন্য ভারতের জনমত কোনপ্রকার সমাজবাদীপন্থার পক্ষে।...

দেশকে শিল্পায়িত করার প্রশ্নই হোক বা কৃষি আধুনিকীকরণ করার প্রশ্নই হোক, আমরা চাই রাষ্ট্র এগিয়ে আসুক এবং দায়িত্ব নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কার সাধন করুক যাতে ভারতীয় জনতাকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর করা যায়।

"কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় কাজ করতে চাই। আমরা স্বভাবতঃই অন্যান্য দেশের পরীক্ষাগুলি বিবেচনা করে দেখব, কিন্তু কার্যতঃ ভারতীয় পন্থায় এবং ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী আমাদের সমস্যার সমাধান কবতে হবে। সেজন্য পরিশেষে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করব তা হবে ভারতবাসীর প্রয়োজনের উপযোগী এক ভারতীয় পদ্ধতি।

"…যদি আমরা সমাজবাদী চরিত্রের একটি আর্থিক সংগঠন চাই তা হলে রাষ্ট্রিক পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে সেই আর্থিক কার্যসূচী সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায়ে রূপায়িত করা যায়। যদি সমাজবাদী আদর্শের ভিত্তিতে আর্থিক সংস্কার করতে হয় তবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে না। সেজন্য আমাদের চাই একটি কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক পদ্ধতির রাষ্ট্র।"

"…এরূপ রাষ্ট্র জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করবে এবং তা কয়েকটি ধনীব্যক্তির চক্রান্তস্বরূপ হবে না।"[১০৪]

জনগণের সেবার আদর্শ সুভাষচন্দ্রের অন্তরে। এটি ভারতীয় ঐতিহ্য ধরে বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু প্রমুখ মনীষীদের ধারায় প্রবাহিত হয়ে সুভাষচন্দ্রে প্রবেশ করেছে। জনগণের সেবাধর্মী রাষ্ট্র ধনী চক্রান্তকারী সাম্যবিরোধী প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। দেশের শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোচন করে সে রাষ্ট্র যথার্থ সাম্য-স্বাধীনতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে। কয়েক বৎসর কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রপদ্ধতি চলবার পর অখণ্ড সাম্য-স্বাধীনতার নিরিখে আবার মূল্যায়ন, বিকেন্দ্রিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে আবার নূতন পদক্ষেপ ; সমাজ-বিবর্তনে শেষ কথা বলে কিছু নাই। জনকল্যাণধর্মী রাষ্ট্র একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে।

ভারতবর্ষে তাঁর চিন্তাধারার রূপায়ণে যে বামপন্থীদল গড়ে উঠবে তার কর্মনীতির একটি মোটামুটি খসড়া সুভাষচন্দ্র Indian Struggle পুস্তকে দিয়েছেন। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"১. এই দলটি জনগণের— অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির স্বার্থের জন্য কাজ করিবে এবং কায়েমী স্বার্থ অর্থাৎ জমিদার, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণীর পক্ষ গ্রহণ করিবে না।

"২. ইহা ভারতীয় জাতির পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতীক হিসাবে কাজ করিবে…।

"৩. ইহা চরমলক্ষ্য হিসাবে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি গভর্নমেন্ট সমর্থন করিবে, কিন্তু ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে আগামী কয়েক বৎসরের জন্য সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে বিশ্বাসী হইবে।

"৪. ইহা দেশের কৃষি ও শিল্পজীবনের পুনর্গঠনে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার দৃঢ় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হইবে।

"৬. আধুনিক জগতে যে সকল মতবাদ ও পরীক্ষা চালানো হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাসংক্রান্ত ও ঋণ-নীতি বিষয়ে নূতন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে দলটি চেষ্টা করিবে।"[১০৫]

ফরোয়ার্ড ব্লকের আদর্শ হিসাবে একটি প্রোগ্রাম রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই দলের লক্ষ্য হবে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় স্বাধীনতা এবং তা অর্জনের জন্য আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, একটি আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠন, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বৃহৎ আকারে উৎপাদন, উৎপাদন ও বন্টন উভয়ক্ষেত্রে সমাজের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতে সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং নূতন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ।[১০৬]

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হবার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে শিল্পায়নের জন্য একটি প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন। ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা একটি সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। স্বাধীনতা লাভের পর যেন কাজ শুরু করতে বিলম্ব না হয়, সেজন্য পূর্বাহ্নেই পরিকল্পনা তৈরি থাকা প্রয়োজন।[১০৭]

সুভাষচন্দ্র একটি সভায় (মোতিলাল স্মৃতিসংঘ আয়োজিত খাদি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভা) উদ্বোধনী ভাষণে বলেন: "রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল, শিল্পে নিতান্ত অনুন্নত- অবস্থায় তখন সে। ১৫ বৎসরের মধ্যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।… যদি দাসত্ব দূর করা যায় তা হলে কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা থাকবে না এবং অর্থনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্তন ঘটবে যে চেনাই যাবে না।"[১০৮]

১৯৩৮-এর ২রা অক্টোবর দিল্লীতে তখনকার কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের এক সভা আহ্বান করেন এবং সেখানে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন : "আমাদের জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা ব্যাপক সেজন্য …জাতির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের… সদ্ব্যবহার করতে হবে, এটাই এখন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের কৃষকসমাজের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার উন্নতিসাধন এবং জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য। তবে শুধুমাত্র কৃষির উন্নতির দ্বারাই তা সম্ভব হবে না।

"… আমাদের লক্ষ্য হবে, প্রতিটি নরনারী শিশুর জন্য অন্নবস্ত্র, শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করা এবং যাতে সকলে সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ও আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রচুর অবকাশ পায় তার দিকে দৃষ্টি রাখা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য শিল্পোৎপাদন বিপুলভাবে বাড়াতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে শিল্পে নিযুক্ত কবতে হবে।

"প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ আমেরিকার সমপর্যায়ের। তার খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের অতীব প্রাচুর্য রয়েছে। এখন প্রয়োজন দেশের সর্বোত্তম স্বার্থে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে তার ব্যবহার। পৃথিবীতে উন্নত ও ধনশালী দেশ-গুলি শিল্পের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সাধনের জন্য তাই করেছে।"

এর পর সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পোন্নতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন : "এটা সম্ভব হয়েছে সারাদেশে পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে— যার পূর্বশর্ত হল পরিকল্পিত বিদ্যুতায়ন। রাশিয়ার প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব যাই হোক-না কেন, অল্পসময়ের মধ্যে রাশিয়ার এই অত্যাশ্চর্য উন্নতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা আমাদের বিবেচ্য বিষয়।"[১৭৯]

সুভাষচন্দ্র জানতেন কংগ্রেসের মধ্যে বৃহৎশিল্প সংস্থাপনে গান্ধীপন্থী সহকর্মীদের ভিন্নমত রয়েছে। সে কথা মনে রেখেই তিনি বলেছেন : "যদি শিল্প-বিপ্লব অমঙ্গলজনক হয় তা হলে তা প্রয়োজনীয় অমঙ্গল।… আজকের পৃথিবীর সংগঠনের যে রূপ তাতে যে দেশ শিল্পায়নে বাধার সৃষ্টি করবে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সে হটে যাবে।

"এখন আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই কুটীরশিল্প ও ভারী শিল্পের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। যদি কোনো বিরোধ থেকে থাকে তা ভুল-বোঝাবুঝির ফলেই ঘটেছে। কুটীরশিল্প সংগঠনের ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী…।

শিল্পায়নের অর্থ এই নয় যে আমরা কুটীরশিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। তা হতেই পারে না।

"...শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ যেমন ভারী, মাঝারি ও কুটীর শিল্প। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বর্তমানে ভারী শিল্প সংগঠনের মূল্য সবচেয়ে বেশী। সেগুলি জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড গঠন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি না— কারণ তার জন্য চাই কেন্দ্রের ক্ষমতা অর্জন এবং রাজস্বনীতি নির্ণয়ে পূর্ণ অধিকার।"[১১০]

এর পর সেই সভায় তিনি জাতীয় পরিকল্পনার নীতি সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করেন, তার মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

"খ. মূল শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির বিষয়ে নীতি গ্রহণ করতে হবে— শিল্পগুলি হল ঃ শক্তি-উৎপাদন, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও আবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন, শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প ইত্যাদি।

"গ. শিল্পকুশলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে। শিল্পকুশলতা অর্জনের জন্য জাপানী ছাত্রদের মতো আমাদের ছাত্রদিগকে প্রশিক্ষণলাভের ব্যাপারে বিদেশে পাঠাতে হবে— তার জন্য একটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে— যাতে তারা ফিরে এসেই সরাসরি নূতন শিল্পসংগঠনের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। শিল্পকুশলতা বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে কোনোপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে না— এ-বিষয়ে মতৈক্য দরকার।

"ঘ. একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা সংস্থা স্থাপন করতে হবে।

"ঙ. ...জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বর্তমানের শিল্প পরিস্থিতির সমীক্ষা করতে হবে— যার লক্ষ্য হবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা।"[১১১]

অতঃপর উক্ত সভায় কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভার বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। সমস্যাসংক্রান্ত বিষয়গুলি হল ঃ

"১. প্রত্যেকটি প্রদেশের সঠিক আর্থিক সমীক্ষার ব্যবস্থা করা।

"২. কুটীর ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন— যাতে পরস্পরের উৎপাদন সীমানা লঙ্ঘিত না হয়।

"৩. দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পসংগঠনের যৌক্তিকতা।

"৪. ভারতে ও ভারতের বাইরে আমাদের ছাত্রদের প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী প্রণয়ন।

"৫. শিল্পকুশলতা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা করা।

"৬. শিল্পায়ন সমস্যা সম্পর্কে আবও উপদেশলাভেব জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যৌক্তিকতা।"[১১২]

সুভাষচন্দ্র-আহূত কংগ্রেস মন্ত্রীদের সেই সভায় তার পর শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— কংগ্রেসমন্ত্রীদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে-সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে বলা হয়: "এই সম্মেলন কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের অভিমত বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সমগ্র ভারতের জন্য সর্বাত্মক শিল্পায়নের পরিকল্পনা যতক্ষণ বিবেচনাধীন থাকবে, এবং উপস্থাপিত না হবে, তার আগেই জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত গুরুশিল্পগুলি অবিলম্বে শুরু করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এই শিল্পগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে এবং সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা যথাসম্ভব আহ্বান করে সমন্বিত করতে হবে।

"ক. কলকারখানার যন্ত্রপাতিসমেত সকলপ্রকার যন্ত্র নির্মাণ; খ. মোটর-গাড়ি ও মোটর-বোটের কারখানা নির্মাণ, সেইসঙ্গে পরিবহন যোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পস্থাপন; গ. বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুর শিল্পস্থাপন; ঘ. গুরু রসায়ন শিল্প এবং সারশিল্প স্থাপন, ঙ. ধাতুশিল্প স্থাপন; চ. বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি-উৎপাদনের এবং সরবরাহের শিল্প স্থাপন।

"পূর্ববর্তী··· প্রস্তাবের রূপায়ণের প্রাথমিক কার্যরূপে এই সম্মেলন একটি প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ করছে (যার সদস্যগণের নাম কংগ্রেস-সভাপতি ঘোষণা করবেন)।··· বর্তমান কমিটির প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে চার মাসের মধ্যে যে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হবার কথা রয়েছে তার কাছেও এই কমিটি রিপোর্ট দেবে।"[১১৩]

এই সম্মেলনে আরো স্থির হয় প্ল্যানিং কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সহ তাদের সুপারিশ পেশ করবেন : ক. শিল্পের স্থান নির্ণয় খ. শিল্পসংগঠনের নীতি : শিল্পটি কি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে থাকবে, না কি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হবে ? শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য কি ধরনের হবে ? গ. শিল্প পরিচালনার এবং অর্থ-ভিত্তির নীতি।[১১৪]

মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী শ্রী ভি. ভি. গিরি প্ল্যানিং কমিশনের আহ্বায়ক হবেন।

কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতি হবার পর কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে দ্রুত পরিকল্পনার বাস্তব চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) তারিখে সুভাষচন্দ্র বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত All India Planning Committee-র প্রথম সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ইতি-মধ্যে দেশে কংগ্রেস সভাপতির শিল্পনীতি ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে মতামতের দরুন গান্ধীপন্থী নেতৃবৃন্দ নানাপ্রকার বিভ্রান্তিকর প্রচার চালান। অনেকেই তাঁর শিল্পনীতিকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং এমন-একটা কথা উত্থাপন করা হয় যেন তিনি কুটীরশিল্পের বিনাশ সাধনে ব্রতী হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ঐ তারিখের সভায় বলেন :

"...স্মরণ করা যেতে পারে দিল্লীতে আমি উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছি কুটীরশিল্প ও বৃহৎশিল্পের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত সংঘাত নাই। বাস্তবিক আমি শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি : কুটীরশিল্প, মাঝারি শিল্প ও বৃহৎশিল্প এবং আমি প্রতিটি শ্রেণীর শিল্পের সংহত অবস্থিতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের আবেদন রাখি। শুধু তাই নয়, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনে (National Planning Commission) সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প সমিতির (All India Village Industries Association) একজন প্রতিনিধির সদস্যপদ সংরক্ষিত হয়েছে এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতেও (National Planning Committee) এরূপ সদস্যদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি জোর করে কিংবা সন্দেহ করে বলা হয় যে জাতির পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা কুটীরশিল্পের পুনর্গঠনের আন্দোলনকে বিনষ্ট করতে চান— তা হলে আমাদের প্রতি গভীর অবিচার করা হবে।

"প্রত্যেকেই জানেন কিংবা তাঁর জানা উচিত যে, ইউরোপ ও এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও যেমন জার্মানী ও জাপানে, অসংখ্য কুটীরশিল্প উন্নত অবস্থায় পৌঁচেছে। তা হলে আমাদের দেশের সম্পর্কে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকবে কেন?

"কুটীর ও বৃহৎ শিল্পের সম্পর্কের বিষয়ে আমি কয়েকটি মন্তব্য যোগ করতে চাই। বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে মূলশিল্পগুলির (mother industries) প্রযোজনই সর্বাধিক, কারণ তার লক্ষ্য হল উৎপাদন যন্ত্রাদি তৈরি করা। সেই শিল্পগুলি ছোট, মাঝারি শিল্পের কর্মীদের হাতে তুলে দেয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি— যা দিয়ে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদনের সহায়তা হয়। তার উপর পণ্য বাজারজাত করার সুষ্ঠু সংগঠন এবং কাঁচামাল সরববাহের সংগঠন থাকলে সেই-সব শিল্পকর্মীদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার গহ্বর থেকে তুলে আনা যাবে।

"শুধু তাই নয়। শক্তি উৎপাদক ও যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্পগুলি জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হলে সাইকেল, ফাউন্টেন পেন, খেলনা, প্রভৃতি তৈরির জন্য দেশের শিল্পকর্মীগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা— পারিবারিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারবেন। ঠিক এমনটিই ঘটেছে জাপানে। খুব সস্তায় বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতি পাবার উপরই এই সাফল্য নির্ভর করে এবং জাপান সরকার কাঁচামাল সরবরাহ ও সুষ্ঠুভাবে পণ্য বাজারজাত করার জন্য বোর্ড গঠন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, এই উপাযেই আমাদের দেশের তাঁতশিল্প ও সিল্ক-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে।

"অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশ শক্তি সরবরাহে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সরবরাহে আমাদের পিছিয়ে-পড়া অবস্থা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে যেখানে মাথা-পিছু সাত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, সেখানে মেক্সিকোর মতো অনগ্রসর দেশেও ৯৬ ইউনিট এবং জাপানে ৫০০ ইউনিট ব্যবহৃত হয়।'[১১৭]

এইভাবে ভারতবর্ষে বৃহৎ, মাঝারি ও কুটীরশিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র একটি সুস্পষ্ট নীতির রূপরেখা প্ল্যানিং কমিটি ও প্ল্যানিং কমিশনের সামনে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির প্রতি গভীর সন্দেহ তুলেছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেসের প্রধানেরা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে জয়লাভও তাঁর পক্ষে কংগ্রেস সংগঠন পরিচালনার সহায়ক হয় নি—

অগত্যা তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল— সে দুঃখজনক ইতিহাস এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়।

কুটীরশিল্পের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সহৃদয় ভাবনা আমরা অনেক পূর্ব-থেকেই লক্ষ্য করেছি। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে লিখিত (মান্দালয় জেল থেকে) কয়েকটি চিঠিতে দেশের তৎকালীন অবস্থার মধ্যেই মাটির পুতুল, ঝিনুকের বোতাম, কাগজের ফুল, ইত্যাদি তৈরির জন্য ছোট ছোট কুটীরশিল্প গড়ে তোলার কথা বলেন— যার জন্য বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না অথচ কিছু অর্থাগম হয়। সেই-সব কাজ শিখবার জন্য কাশিমবাজার স্কুলের নামোল্লেখ করেন এবং কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন।

যাই হোক, উপরোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুভাষচন্দ্র একটি সুসংহত শিল্প কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে বৃহৎ মাঝারি ও কুটীরশিল্প পাশাপাশি থাকবে পরস্পরের উৎপাদন সীমানার মধ্যে। এই শিল্পগুলি হবে সমন্বিত— অর্থাৎ এগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক হয়ে গড়ে উঠবে। ছোট, মাঝারি ও কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য দেশে ব্যাপক বিদ্যুতায়ন চাই, আর কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন। এ বিষয়ে জাপানের সাফল্যের দৃষ্টান্ত সুভাষচন্দ্রকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। জাপান তখন বড় শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছে, তৎসত্ত্বেও সে ব্যাপক ভাবে ছোট, মাঝারি ও পরিবার-ভিত্তিক কুটীরশিল্প গড়ে তুলেছে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁৗছে দিয়ে, এবং কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্য বাজারজাত করার সংগঠনের সাহায্যে। তদানীন্তন জাপানের শিল্প পরিস্থিতির রূপরেখা— সুভাষচন্দ্রের শিল্পনীতিকে বুঝাতে সাহায্য করবে।

জাপানের শিল্প পরিস্থিতি

ফ্যাক্টরির পরিসংখ্যান (১৯৩৭)

কর্মীর সংখ্যা	ফ্যাক্টরির সংখ্যা (শতকরা হারে)
৫ থেকে ৩০	৮৬·৩
৩১ „ ১০০	১০·১
১০০ অতিরিক্ত	৩·৬

১০০ জনের বেশী কাজ করেন এমন ফ্যাক্টরির সংখ্যা শতকরা ৩·৬ ভাগ মাত্র। শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ ফ্যাক্টরি হচ্ছে ছোট বা মাঝারি ধরনের।

কর্মীসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি (১৯৩২)

শিল্প সংস্থা যেখানে কাজ করে	মোটকর্মীর শতকরা হার
৫ থেকে ৯ জন	১৩
১০ „ ৪৯ „	২৬
১০ „ ৫০০ „	৩৬
৫০০ র বেশী	২৫

দেশের মোট কর্মীসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ ছোট ও মাঝারি শিল্পে এবং ২৫ ভাগ বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত।

এদের উৎপাদনের শতকরা হার

ছোট শিল্পসংস্থা	২৯
মাঝারি „	৩৫
বড় „	২৫

ধরা হয় ৫ জনের কম লোকের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র বা কুটীরশিল্পের উৎপাদন প্রায় ১১%। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন— মোট উৎপাদনের ২৫% এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের অবদান হল ৬৪%।[১১৬]

জাপানের ছোট শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণগুলি হল ঃ

সস্তায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, শহরে অবস্থিত বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে গ্রামে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা, চাহিদামুখী বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন, ঋণদান ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য সুষ্ঠু শক্তিশালী সমবায় সংস্থার অবস্থিতি।[১১৭]

সংহত শিল্প সংগঠন এবং কৃষি ও গ্রামের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কৃষক জমি চাষ করে, গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তোলে গ্রামের সকল মানুষ। শিল্প-সভ্যতার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হল তেমনি শ্রমিকশ্রেণী।

শিল্প শ্রমিক ও ট্রেড-ইউনিয়ন

সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংগঠনে অংশ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে সুভাষচন্দ্র সেই প্রতিষ্ঠানকে একটি ব্যাপক গণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছেন। বলেছেন ঃ "কংগ্রেসের বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন করিতে হইলে যুবক, কৃষক, শ্রমিক এই

তিনটি প্রধানশক্তিকে আমাদের দলে টানিয়া আনিতে হইবে এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হইবে।"[১১৮] এর জন্য তদানীন্তন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন চেয়েছেন।

তাঁর প্রকল্পিত সাম্যবাদী সঙ্ঘের সংগঠনের বিষয়ে বলেছেন যে তার কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি ফ্রন্টে কাজ করবে।[১১৯] বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিও বিশিষ্ট সাহায্য করবে।[১২০] তাঁর দলের কর্মনীতির যে রূপরেখা তিনি দিয়েছেন তাতে বলেছেন:

"এই দল জনতার অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক প্রভৃতির স্বার্থের জন্য লড়িবে। স্থিতস্বার্থবাদীদের অর্থাৎ, জমিদার, বিত্তশালী, সুদখোরদের জন্য নয়।"[১২১]

বলেছেন: "বিদেশী শাসনকালে ইংরেজ কেবল রাজদণ্ড পরিচালনাই করে নাই মালিকরূপে শ্রমিকও খাটাইয়াছে। সুতরাং শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে শ্রমিকদের রাখা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে শ্রমিক-কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহযোগ্য মজুরী, অসুস্থতাবীমা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[১২২]

জামসেদপুরে টাটা ইস্পাত কারখানার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির সঙ্গে শ্রমিকদের দাবি নিয়ে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।[১২৩] দীর্ঘকাল তিনি এই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে জামসেদপুরের বৃটিশ সংস্থা টিনপ্লেট কোম্পানির কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সেখানকার ঐতিহাসিক ধর্মঘটে শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে পিকেটে অংশ নেন এবং কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর্মঘটের মধ্যে কারখানায় না যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।[১২৪]

৪ঠা জুলাই ১৯৩১ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন: "সব দিক থেকেই শিক্ষা নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, এমন-কি পৃথিবীর যে-কোন অংশ থেকে আগত সাহায্যও নেওয়া যায়। কিন্তু আমস্টারডাম বা মস্কোর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। ভারতকে তার নিজের পন্থা নিজেই তৈরি করে নিতে হবে...।"[১২৫] তিনি কমিউনিস্ট দুনিয়া বা স্বাধীন দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সমূহের

কেন্দ্রগুলির নির্দেশে চলতে চান নি। কারণ, "জেনেভায় তাঁর কোন বিশ্বাস নাই।" তবুও বলছেন: "তবে বন্ধুরা যদি প্রশ্নটি প্রতি বৎসর সিদ্ধান্তের জন্য খোলা রাখতে চান তা হলে তাঁর কোনো আপত্তি নাই।"[১২৬]

আবার ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগঠন বিষয়েও উক্ত সভায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন:

"ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা থাকা উচিত··· তার অবস্থিতি ও সচলতা রক্ষার স্বার্থে এ বিষয়ে কোনো প্রকার আপস করা উচিত নয়। যদি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জনের লক্ষ্যে পেঁছতে হয় তা হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি, তার অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন সমূহেরও অবশ্য-পালনীয় হওয়া উচিত।"[১২৭]

তারপর শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে সেই সভায় বলেন:

"শ্রমিক আজ চায় কাজের অধিকার। নাগরিকদের চাকুরির সংস্থান করে দেবার দায়িত্ব রয়েছে সরকারের— যেখানে সরকার তা না পারবে সেখানে সরকারকে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। মালিকের খেয়ালখুশিতে শ্রমিক নাগরিকদের রাস্তায় বের করে দেওয়া চলবে না— তাদের অনাহারে রাখা চলবে না।·· শ্রমিক ছাঁটাই সমস্যার যদি সন্তোষজনক সমাধান না হয় তাহলে দেশের শিল্পে শান্তি থাকবে না।

"প্রতিটি কর্মী যেমন কাজের দাবি করতে পারেন তেমনি তিনি জীবনধারণের উপযোগী বেতন (Living Wage) দাবি করতে পারেন। আজ কলকারখানার কর্মীরা কি সেরূপ বেতন পান? পাটকল ও কাপড়ের কলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাদের বিপুল অঙ্কের লাভের কতটুকু অংশ তারা দরিদ্র শোষিত কর্মীদের জন্য ব্যয় করে? আমি জানি, তারা বলবে কিছু-দিন ধরে অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তাই ধরে নিলাম কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি কি— তাদের অতীত ইতিহাসে তারা কত মুনাফা করেছে, কত টাকা ডিভিডেন্ড দিয়েছে, কত টাকা সংরক্ষণ খাতে (reserve) জমিয়েছে?··· এও কি সত্য নয় কতকগুলি অঞ্চলে হতভাগ্য কর্মীদের এমন অবস্থায় রাখা হয়েছে যা পুরানো ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে তুলনীয়? লেবার কমিশন তাহলে ভারতীয় কর্মীদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহযোগ্য বেতন ও সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে কি করলেন? পাট ও বস্ত্র শিল্পে তাঁরা সর্বনিম্ন মজুরীর কথা বলেছেন।

কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি যে সেই বেতন জীবন-মানের উপযোগী হবে ?"[১২৮]

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সদা-সচেষ্ট ছিলেন।

অবশ্য শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি একটি স্বতন্ত্র মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে নেতাজীর জীবনবাদের রূপকার বিপ্লবী নেতা অনিল রায় বলেছেন ঃ "মার্কসবাদীয় সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজবিবর্তনকেই শ্রেণীসংগ্রামের একটা পরিণাম বলে কল্পনা করা হয়েছে। সুভাষ শ্রেণী সংগ্রামকে স্বীকার করেও এর গুরুত্বকে কখনো আতিশয্য দান করেন নি। এমন কি তাঁর মতে ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনই পড়বে না।"[১২৯]

সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (যা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নামেও অভিহিত হয়) তার সঙ্গে একমত নন।

টোকিয়ো বক্তৃতায় তিনি বলেছেন ঃ "কতকগুলি বিষয়ে ভারতবর্ষ রাশিয়াকে অনুসরণ করবে না। প্রথমতঃ শ্রেণীসংগ্রাম এমন একটি জিনিষ ভারতে যার কোন প্রয়োজন নাই। যদি স্বাধীন ভারতের সরকার জনতার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে তা হলে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন নাই। আমরা রাষ্ট্রকে জনতার সেবকরূপে সংগঠিত করে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি।"[১৩০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, শ্রমিক আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র মালিকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎসাদন সংগ্রামে যুক্ত করতে চেয়েছেন এবং নিজেও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুক্ত হয়েছেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পর যে ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা কৃষক-শ্রমিক-প্রজা সাধারণের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হবে এবং জমিদার, ধনিক শোষক শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটাবে। সেবাধর্মী রাষ্ট্র সাম্যতন্ত্রী আর্থিক সামাজিক রূপায়ণে নিজেকে নিয়োজিত করবে ; শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করবে তার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে। রাষ্ট্র অহেতুক শ্রেণীসংগ্রামকে সমাজ-প্রগতির আঙ্গিক করবে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের পূর্ণক্ষমতা হাতে আসার পর সেবাধর্মী, সাম্যবাদী রাষ্ট্র সামাজিক ও আর্থিক বিপ্লব সফল করবে।

কৃষক, ভূমিনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষি ও গ্রাম সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক, ভূমিনীতি ও গ্রাম সংগঠন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে নানা ভাষণে ও লেখার মধ্যে তাঁর নির্দেশ রেখেছেন।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত (১লা পৌষ ১৩৩৪) বঙ্গীয় যুবসম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"...প্রধানতঃ নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায়প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ফিরিয়া আসিবে-এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লীসংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লীবাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে পল্লীসংস্কারের কোনো সার্থকতা হইবে না।"[১৩১]

১১-৬-২৬ তারিখে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন ঃ "আমাদের কৃষিসমস্যার সমাধান Co-operation-এর দ্বারা হতে পারে, অন্য পথ নাই। Co-operative Bank তো চাই-ই কিন্তু শুধু Bank এর দ্বারা কার্যোদ্ধার হবে না। সমবায়ের দ্বারা বীজ, সার, লাঙ্গল, চাষের গরু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চাষীদের Cost of Production কমাইয়া Production বাড়াইতে হইবে। তারপর monopolist-কে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় না করে সমবায়ের দ্বারা বেশী দরে শস্য বিক্রয় করবার চেষ্টা করতে হবে।... সহযোগিতায় কাজ করতে করতে initiative-এর বৃত্তি সকলের মধ্যে স্ফুরিত হয় এবং জাতীয় initiative জাগরূক হলে জাতি গঠনের আর বিলম্ব থাকে না।"[১৩২]

কৃষি ও পল্লীসমস্যা ভারতবর্ষে ব্যাপক সমস্যা। সে সমস্যা সমাধানে জাতির ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যম national will & initiative জাগ্রত করতে হবে। এর জন্য চাই আদর্শ নেতৃত্ব। জনগণের আশা, ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যম জাগিয়ে তুলবে— সেই নেতৃত্বের তিতিক্ষা, সেবার আদর্শ ও অদম্য কর্মস্পৃহা। এর উপরই গড়ে উঠবে পারস্পরিক সাহচর্যপুষ্ট কৃষি-সমবায় সমূহ, যার সাংগঠনিক শক্তি উৎপাদনে ও পণ্য বাজারজাত করার কাজে কৃষককে সাহায্য করবে।

কৃষক ও গ্রামীণ জীবনধারার উন্নতির পূর্বশর্ত জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও নূতন ভূমিনীতির প্রবর্তন। সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পিত দলের কর্মনীতিতে বলেছেন :

"(৪) ইহা দেশের কৃষি ও শিল্পজীবনের পুনর্গঠনে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার দৃঢ় ব্যবস্থায় বিশ্বাস করিবে।

"(৭) ইহা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র ভারতে একই প্রকার ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিবে।"[১২৩]

সুভাষচন্দ্র নূতন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার জন্য পৃথিবীর নূতন পরীক্ষাগুলির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অন্যত্র কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে ধনবাদী ও কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় তিনি আকৃষ্ট হন নি। বলেছেন : "স্বাধীন ভারতের সামাজিক আর্থিক অবস্থা বর্তমানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইবে। শিল্প, কৃষি ভূমিস্বত্ব, অর্থ বিনিময়, মুদ্রা, শিক্ষা, কারা প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে নূতন তত্ত্ব ও নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে।"[১২৪]

বৃটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের দেশের কৃষকদের অপর্যাপ্ত শোষণ করে গ্রামগুলিকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সেই কৃষকসমাজকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। সেজন্য দেশের কৃষির উন্নতিতে রাষ্ট্রের সাহায্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ অনিবার্য। শিল্পায়ন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের প্রবর্তন বেকার সমস্যা সমাধানেরও শর্ত।

সুভাষচন্দ্র বলছেন : "বৃটিশ ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতবর্ষকে বৃটিশ শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারীর ভূমিকায় রাখিয়াছে। ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যাঁরা শিল্পজীবী ছিলেন তাঁরা কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বিদেশী শাসন কৃষকদের নিঃস্ব করিয়াছে এবং কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে ভারতের একদা সুফলা জমিতে উৎপাদন অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং সে উৎপাদনে দেশের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান আর হয় না। চাষীদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগ বৎসরে ছয় মাস কর্মহীন হইয়া পড়েন। সুতরাং, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যা দূর করিতে হইলে— ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় শিল্পোন্নয়নে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষিকার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।"[১২৫] এইসঙ্গে আরও বলেছেন : "কৃষকদের অতিরিক্ত করভার ও ভয়াবহ ঋণভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে।"[১২৬]

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে দেশের পুনর্গঠনের প্রাথমিক নীতি

হিসাবে বলেছেন: "এর জন্য প্রয়োজন জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদসহ ভূমি-ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার। কৃষকদের ঋণভার হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং গ্রামবাসীদের জন্য সস্তা ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থেই সমবায় আন্দোলনের প্রসার প্রয়োজন। জমি হইতে বেশী উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা পত্তন করিতে হইবে।"[১৩৭]

স্বাধীনভারতে গ্রামীণ কৃষি ও সমাজ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় 'পঞ্চায়েতী' প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হবে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "ইহা (অর্থাৎ তাঁহার পরিকল্পিত দল) গ্রাম-পঞ্চের দ্বারা শাসিত অতীতের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবে এবং জাতিভেদের ন্যায় বর্তমান সামাজিক বাধাগুলি ভাঙিয়া দিবার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।"[১৩৮]

এই 'পঞ্চায়েত' সম্পর্কে The Indian Struggle পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন: "পুরাকাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে 'পৌর' এবং 'জনপদ' নামে অভিহিত জনপ্রতিষ্ঠানের নাম ছড়াইয়া আছে। 'পৌর' বর্তমানের মিউনিসি-প্যালিটির মতো আর 'জনপদ' সম্ভবতঃ গ্রামাঞ্চলের একপ্রকার গণ-প্রতিষ্ঠান। তখন পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে বর্ণ-গণতন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক ব্যাপারে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় 'পঞ্চায়েত' প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল…।"[১৩৯] সুভাষচন্দ্র পঞ্চায়েতের পরিচালনায় একটি স্বয়ম্ভর গ্রামীণ কৃষিনীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

বর্তমান ভারতে কৃষকদের সমস্যা শ্রমিকদের সমস্যা থেকেও গুরুতর, কারণ কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষকদের সংখ্যা শ্রমিকদের চেয়ে বিপুলতর। তাই টোকিয়ো বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "আর-একটি বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়া অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ, সেজন্য কৃষকদের সমস্যা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[১৪০]

স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র পরিকল্পনা-অনুসারে কৃষকদের সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করবে সরকার। কৃষক ঋণভার ও করভারে জর্জরিত হবেন না। উৎপাদনের স্বার্থে কৃষক তার স্ব-শাসিত সমাজ সংগঠনের মধ্যে সমবায় গড়ে তুলবেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল কৃষির মধ্যে রূপায়িত হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতায়ন হবে এবং গ্রামীণ কুটীর ও ছোট শিল্প গড়ে উঠবে পরিবারভিত্তিক

ভাবেও। প্রাচীন গ্রামীণ শিল্পগুলি আর্থিক দুরবস্থায় ভুগছে। তারা রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সজীব ও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠলে কৃষক ও গ্রামশোষণ বন্ধ হবে।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতি

অর্থনীতিতে যুদ্ধকালীন অর্থব্যবস্থারও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সংগঠনে ও পরিচালনায়, আজাদ-হিন্দ সরকারের অর্থদপ্তরের কার্যকর্মের মধ্যে, আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় ও তার কাজে, যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরীক্ষিত হয়েছে। নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতবাসীকে সামগ্রিক সংগঠনের মধ্যে এনেছিলেন। স্বাধীনতার উন্মাদনায় তাঁরা যথাসাধ্য নিয়ে আজাদ-হিন্দ সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদেরই অর্থে সরকারের সমস্ত কার্যকর্ম ও যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন সময়েই আজাদ-হিন্দ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। সরকারের পরিচালনায় সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং যুদ্ধের সাহায্যের জন্য কতকগুলি ছোট বড় কারখানা গড়ে তোলা হয়।[১৪১] কারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির পরিচালনার জন্য কর্মীদলকে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।[১৪২] সরকার নিজের কারেন্সি, ডাকটিকিট, সংবাদপত্র চালু করেন।[১৪৩]

মুক্ত অঞ্চলগুলিতে 'নয়ী সরকার' (যে নামে স্থানীয় অধিবাসীরা আজাদ-হিন্দ সরকারকে অভিহিত করতেন) অভ্যর্থনা লাভ করে এবং অধিবাসীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ করে ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আজাদ-হিন্দ বাহিনীর লোকদের কাছে আসেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন।[১৫৭] নূতন সরকারের প্রশাসনিক সংগঠন দ্রুত গড়ে ওঠে আজাদ-হিন্দ দলের মাধ্যমে।

মুক্তাঞ্চলের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশঘরা (বিশটি গৃহ নিয়ে গঠিত) ও গ্রাম সংগঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল: দশটি গ্রাম নিয়ে হবে দশগাঁও, পাঁচের অনধিক দশগাঁও নিয়ে দায়রা। অনুরূপ পাঁচের অনধিক দায়রা নিয়ে মহকুমা আর পাঁচের অনধিক মহকুমা নিয়ে হবে জেলা। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম পঞ্চায়েত যার দায়িত্ব থাকবে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলসরবরাহ ও জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা; জমির সীমানা বিরোধের

মীমাংসা করা ; একশত টাকার অনূর্ধ্ব ভূমিরাজস্ব-বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি করা ; চুরি, ডাকাতি, ভীতিপ্রদর্শন মারধোর করার ব্যাপারে দোষী ব্যক্তির শাস্তিবিধান করা। অনুরূপ ভাবে দশগাঁও, দায়রা, মহকুমা ও জেলার বিশদ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি হয়। প্রশাসনের সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গঠিত হয় প্ল্যানিং ব্যুরো।[১৪৭]

৪ঠা জুলাই, ('৪৪) তারিখে রেঙ্গুনে জুবিলী হলে অনুষ্ঠিত সভায় নেতাজী অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে বলেন ঃ "…স্বাধীন ভারত ভূখণ্ডের শাসন ও পুনর্গঠন কার্যের ভার গ্রহণ করার জন্য আমরা আজাদ-হিন্দ দল নামে এক নূতন সংগঠন গড়ে তুলেছি।"[১৪৮]

কিন্তু শেষরক্ষা এবারকার মতো হল না, আজাদ-হিন্দ সরকার-পরিচালিত আজাদ-হিন্দ বাহিনীকে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে যেতে হয়েছে। ভারতবর্ষের জনতার সৌভাগ্য হয় নি নেতাজীর নেতৃত্ব লাভের— যাঁর স্বপ্ন হল ভারতবর্ষে নূতন এক জাতি ও তার আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ; অখণ্ড সাম্য-স্বাধীনতার রূপায়ণে যে-সমাজ বিবর্তনের পরের ধাপে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীকে নূতন অবদানে উন্নততর করবে। সে স্বপ্ন সফল করে তোলার দায়িত্ব ভারতবর্ষের জনতার, বিশেষ করে যুবসমাজের।

--

মুক্তিসংগ্রামে আজাদ-হিন্দ আন্দোলন ও নেতাজী

১

সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদহিন্দ বাহিনীর সংগঠন এক অনন্য ঘটনা, ইতিহাসে যার নজীর নেই। এই বিপ্লবী-বাহিনী একটি সুসংগঠিত সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়েছে—যে সরকার নয়টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। এই সরকারের আশু লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির অপসারণ। আজাদ-হিন্দ বাহিনী ছিল আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের অঙ্গ এবং এই আন্দোলন বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের প্রথম ফ্রন্টের সঙ্গে ভারতের বাইরে থেকে তাঁর সশস্ত্র আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের দ্বিতীয় ফ্রন্টকে সংহত করে বৃটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটিয়ে তাকে ভারত ভূমি থেকে বিতাড়িত করবেন এবং পরে নূতন ভারতবর্ষ গঠনে সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন—এই ছিল নেতাজীর উদ্দেশ্য।

আজাদ-হিন্দ বাহিনী ও আজাদ-হিন্দ সরকার গঠনের পটভূমি সম্পর্কে যাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন এবং সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং যাঁরা ভারতের জাতীয়তা-বিরোধী উৎকট আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে খ্যাত তাঁরা সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করেন এবং অনেক সময় তাঁর এই আন্দোলনকে ভুল বলে প্রচার করে তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। ভারতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর জাতীয়তাবোধের নিরিখে এই আন্দোলনের পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। ভারতীয় জনগণের মনে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও এই আন্দোলনের সঠিক সমীক্ষা স্বাধীনতা আন্দোলনের সরকারী ইতিহাসেও স্থান পায়নি। আবার এক শ্রেণীর চতুর রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্রকে কেবল যুদ্ধের নায়ক হিসাবে প্রচার করে নেতাজী-মূর্তির গলায় মাল্যার্পণ দ্বারাই ইতিহাসের ছেদ টেনেছেন। এঁরাও আমাদের যুব-সমাজের কাছে বিকৃত তথ্য উপস্থাপিত করে তাঁদের মনকে একপেশে করে দিতে সাহায্য করেন। কিন্তু বিপ্লবী নায়ক নেতাজী আর বীর সুভাষের দুস্তর ব্যবধান চালাকির দ্বারা গোপন করা সম্ভব হয়নি।

২

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রবেশের সময় থেকে নানা ঝঞ্ঝা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপ কারাবরণ ও নির্বাসনের ক্লেশ উপেক্ষা করে ত্রিপুরী কংগ্রেস পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ও পরে নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করে কংগ্রেসের সে আন্দোলনে নূতন জোয়ার সৃষ্টির নিদ্রাহীন প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছে একটি স্থির নির্বাত সংগ্রামী শিখা যা রূপান্তরিত হয়েছে নেতাজী সুভাষে। সুভাষজীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, ভারতদর্শন-সিঞ্চিত ভারত-পথিকের সংগ্রাম।

ভারতের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে সুভাষ-চন্দ্র বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে শুধু অহিংস আন্দোলনের দ্বারা বিতাড়িত করা যাবে না। অহিংস আত্মপীড়নের মধ্যে আমাদের নৈতিকশক্তি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তা বৃটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য বা দাবি আদায়ে কৃতকার্য হতে পারে কিন্তু তাতে হিংস্র বৃটিশের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে না এবং তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে না। তারা যে-কোনো উপায়ে ভারতের অহিংস আন্দোলনের মোকাবিলা করতে দ্বিধা করবে না কারণ ভারতবর্ষ তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শক্তির জীয়নকাঠি।

ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশের শ্যেন দৃষ্টির অন্তরালে কোনো বৃহৎ সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না—যা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করে বিতাড়িত করতে পারে। ভারতের বাইরে থেকে বৃটিশের শত্রু শক্তির সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে বৃটিশকে আঘাত হানতে হবে। ভিতরের সংগ্রামী আন্দোলন ও বাইরের মুক্তি-বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ একত্রিত হলেই তবে সাম্রাজ্যশাহী বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়ন করা সম্ভব। সুভাষচন্দ্র এরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সেই সুযোগ এনে দেয়। একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪১, সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পরে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া পৌঁছান এবং ২৮শে মার্চ বার্লিনের উদ্দেশে মস্কো ত্যাগ করেন। তখন জার্মানী বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি বহাল রয়েছে। জাপানও সেসময় আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত হয়নি। ইটালী জার্মানীর মিত্রশক্তি।

সুভাষচন্দ্রের কাছে তখন বৃটিশ-বিরোধী শক্তিশালী জার্মানীর বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণই ছিল সশস্ত্র আন্দোলনের পন্থা। সেখানেই তিনি বন্দী বৃটিশ-

ভারতীয় বাহিনীর লোকদের নিয়ে স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাশিয়া ছিল জার্মানীর মিত্রশক্তি, সেজন্য সুভাষচন্দ্র রুশীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ প্রবেশের প্রধান পরিকল্পনা রচনা করেন এবং পরিকল্পনার সমগ্র বিষয় ব্যাখ্যা করে ৯ এপ্রিল ১৯৪১ জার্মান সরকারের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। এর মধ্যে তিনি দাবি করেন, বার্লিনে একটি 'স্বাধীন' ভারতীয় সরকার গঠন করতে হবে এবং সেই স্বাধীন সরকারের সঙ্গে অক্ষশক্তির চুক্তি হবে যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সম্ভবমতো বন্ধু দেশগুলিতে ভারতীয় বাহিনী গঠিত হবে। স্বাধীনভারত রেডিও ষ্টেশনের নামে বেতার প্রচার হবে। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে বিপ্লব পরিচালনায় সহায়তা করতে হবে। আপাততঃ ঋণ হিসাবে আর্থিক খরচ দেবেন জার্মান সরকার। ভারতের স্বাধীনতার পর সে ঋণ শোধ করা হবে। ভারতে আছে মাত্র সত্তর হাজার বৃটিশ সৈন্য যার উপর তারা নির্ভর করতে পারে। পঞ্চাশ হাজারের মত সৈনিক নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী ভারতের সহায়তা করলে বৃটিশকে ভারত থেকে নির্মূল করা যেতে পারে। ১৯৪০-এ ফ্রান্সের পতনের পর বৃটিশের সম্মান লুণ্ঠিত হয় এবং বৃটিশের ভারতীয় সৈনিকরা তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ভারতীয়রা সে সময় বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। অক্ষশক্তির হাতে বৃটিশ শক্তি প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেলে সে সুযোগ আবার আসবে। বৃটিশ অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হলেও তখন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটান যাবে যদি সে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

এই স্মারকপত্রে আরও বলেন যে যদি জাপান বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় তবে প্রাচ্যে বৃটিশ নৌ-বাহিনী জাপানী নৌ-বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। জাপানের হাতে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটলে এবং সিঙ্গাপুরের পতন হলে ভারতে বৃটিশের সম্মান লুণ্ঠিত হবে। এর জন্য চাই জাপান-রুশ চুক্তি এবং চীনের ব্যাপারের ফয়সালা।

একটি অতিরিক্ত স্মারক পেশ করে বলেন—জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে···ভারতে যাবার পথের জন্য রাশিয়া বা টার্কির পরোক্ষ সাহায্যের প্রয়োজন হবে।[১]

সুভাষচন্দ্র জার্মানীর কাছে যে প্রধান তিনটি প্রস্তাব করেন তার মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে বার্লিন থেকে প্রচার ও যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব জার্মানী স্বীকার করে নেয়। কিন্তু অক্ষ শক্তি

কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার তৃতীয় প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। শ্বেতকায় বৃটিশ-জাতির প্রতি হিটলারের দুর্বলতার বিষয় গোপন ছিল না। উপরন্তু সোভিয়েত-জার্মান গোপন চুক্তিও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে-চুক্তিতে বৃটিশ শক্তির পতনের পর ভারতবর্ষ সোভিয়েত প্রভাবে যাবে এরূপ নির্ধারিত ছিল।[১] জার্মানীর পক্ষে সেজন্য সে-সময় ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। যাই হোক জার্মানী ২২শে জুন ১৯৪১ হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্রের রণকৌশলগত অনেক চিন্তায় প্রচণ্ড আঘাত আসে। তিনি তখন ইটালীতে অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে ৫ই জুলাই ('৪১) তিনি ডঃ ওয়ারম্যানকে (জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্) লেখেন ঃ "...পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার পরিকল্পনা ফলবতী হওয়ার প্রত্যাশা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এখন শীঘ্র বার্লিন ফিরে লাভ নাই। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের এই নূতন পরিস্থিতিতে আমার দেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া জার্মান সরকারের প্রতি অনুকূল নয়।"[২]

১৯৪২-এর বসন্তে সুভাষচন্দ্র জার্মান এডমিরাল ক্যানারিসকে বলেন ঃ 'আপনি যেমন জানেন সেরূপ আমিও জানি, জার্মানী এ যুদ্ধ জিততে পারবে না। কিন্তু এবার বিজয়ী বৃটিশ ভারতবর্ষ হারাবে।"[১]

৩

যাই হোক নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তিন হাজার ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। এঁরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পারদর্শিতা জার্মান সেন্যাধ্যক্ষ রোমেলের প্রশংসা অর্জন করে। জার্মানীতেই 'নেতাজী' ও 'জয়-হিন্দ' শব্দ দুটির উৎপত্তি হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই শব্দ-দুটির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নাই। দুঃখের বিষয় ভারতের স্বাধী-নতার স্বার্থে জার্মানীর সাহায্য গ্রহণের পরিকল্পনার জন্য বিদেশের বহু গণ্য ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রকে অন্যায়ভাবে ফ্যাসীবাদী বলে আখ্যাত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ-সম্পর্কে নন্দ মুখার্জি তাঁর Netaji Through German Lens নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ "নাজী জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্যে চার্চিল ও রুজভেল্টের পক্ষে স্টালিনের সঙ্গে মিত্রতা যদি সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলে ভারত থেকে বৃটিশ-রাজকে বহিষ্কার করার জন্য হিটলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মিত্রতাকে নিন্দনীয় ও অনৈতিক বলা হবে কেন ? যদি রাশিয়ার সঙ্গে এ্যাংলো-আমেরি-কান মিত্রতা চার্চিল এবং রুজভেল্টের পক্ষে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ না বোঝায়,

তাহলে জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে মিত্রতার জন্য সুভাষচন্দ্রকে নাজী বলে আখ্যাত করা হবে কেন ? বৃটেন ও ফ্রান্স যেহেতু নাজীদের সঙ্গে যুদ্ধরত সেই হেতু স্টালিনের সঙ্গে এই দুই দেশের মৈত্রী সম্পর্ককে নৈতিক বলা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য সুভাষচন্দ্রের ভারত-জার্মান সহযোগিতার প্রস্তাবকে নিন্দা করা হবে কেন ?"[৫]

সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে গিরিজা মুখার্জি এক ভাষণে বলেছেন ঃ "যেহেতু জার্মানী ও জাপান এই দুটি মাত্র দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ড যুদ্ধরত, সেইহেতু বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধবাদী একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর পক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষের সাহায্য সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়া কি উচিত ছিল না ? নেতাজী একজন জাতীয় বিপ্লবপন্থী হিসাবে তাই করেছিলেন, যেমন তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে গ্যারীবল্ডি (Garibaldi) ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রয়োজনে অস্ট্রিয়ার শত্রুদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সান-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yat-Sen) রাজকীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য জাপানের এবং আয়র্ল্যান্ডকে মুক্ত করার জন্য ডি-ভ্যালেরা (De-Valera) এবং সিন ফিনেরা আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। যে কেউ ইতিহাস থেকে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারেন ; বলাবাহুল্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ নাজী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চেয়েছিল এবং পেয়েছিলও।

"ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্য জেনারেল ডি-গল যে ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তাতে কি অন্যায় হয়েছে ?"[৬]

সুভাষচন্দ্র গিরিজা মুখার্জীকে বলেছেন ঃ

"নাৎসীদের সঙ্গে আমাদের মিল মোটেই নাই--তা সত্য। কিন্তু যদি তারা আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে এবং আমাদের মতাদর্শকে প্রভাবান্বিত করতে সচেষ্ট না হয় তবে তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে বাধা কোথায় !"[৭]

শ্রীগিরিজা মুখার্জী তাঁর উক্ত ভাষণের অন্যত্র সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন যে—তিনি জার্মান সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবাসীরা জার্মানীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের (বৃটিশ ব্যতিরেকে) বিরোধ ও জার্মানীর কোন প্রকার অন্তর্বিরোধে নিজেদের জড়াতে অনিচ্ছুক। জার্মানীও সুভাষচন্দ্রের এই মত স্বীকার করে নেয় এবং জার্মানী কখনও তাদের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধে সুভাষচন্দ্রের সমর্থন প্রার্থনা করে নাই। আজাদ-হিন্দ রেডিও (বার্লিন) থেকে কোনো দিন নাৎসীদলের কার্যক্রমের সমর্থনে কিছু প্রচার করা হয় নাই।[৮]

হরিপুরা ভাষণে (ফেব্রুয়ারি '৩৮) সুভাষচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধান

করতে হবে ঃ "সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিস্ট দেশ হলেও তার রাষ্ট্রনেতা-গণ অন্যান্য অ-সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে মিত্রতা করতে ইতস্ততঃ করেনি।"[৯]

বার্লিন থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৪২ এক বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছেন ঃ "আমি ত্রি-শক্তির সমর্থনে যুক্তি প্রচার করি না- তা আমার কাজ নয়—আমার একমাত্র ভাবনা ভারতবর্ষ।"[১০]

বার্লিন থেকে প্রচারিত অন্য এক বেতার ভাষণে বলেছেন ঃ "ভারতের আভ্যন্তরীণ নীতি ভারতবাসীরই নিজস্ব বিষয় আর তার বৈদেশিক নীতি হবে বৃটিশের শত্রুশক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা। ...স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ কখনই সহ্য করব না। আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে আমার ধ্যান-ধারণা ঠিক পূর্বের মতোই আছে-অর্থাৎ আমার স্বদেশে অবস্থান-কালে যেমন ছিল তেমনই আছে এবং কেউ যেন এই ভুল সিদ্ধান্ত না নেন যে বৈদেশিক ব্যাপারে ত্রি-শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ হল আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের আধিপত্য বা তাদের মতাদর্শ স্বীকার করে নেওয়া।"[১১]

এই বেতার বক্তৃতায় আরও বলেন ঃ "ধূর্ত, নীতিজ্ঞানবর্জিত, সম্পদশালী বৃটিশ আমাকে প্রলোভিত করতে পারেনি এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিও তা করতে সমর্থ হবে না। যাইহোক আমার একমাত্র দায়িত্ব ভারতের প্রতি।"[১২]

এই ভাষণেই তিনি B. B C কে Bluff & Bluster Corporation (মিথ্যা আর কোলাহল করপোরেশন) আখ্যা দেন।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট হয়—সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে জটিল রাষ্ট্র-নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও সুনিপুণভাবে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর চিন্তার পারম্পর্য যে অটুট সে বিষয়ে সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের পর ইউরোপে সমর পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং সুভাষচন্দ্রের পূর্বরচিত পরিকল্পনাগুলির রূপায়নে দুস্তর বাধা দেখা দেয়। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ জাপান যুদ্ধে যোগদান করলে পূর্ব-প্রাচ্যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সিঙ্গাপুরের ও ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটে। সুভাষচন্দ্র যে এরূপ এক পরিস্থিতির কথা ভেবেছিলেন এই প্রবন্ধে জার্মান সরকারকে লেখা সুভাষচন্দ্রের ৯ই এপ্রিল ১৯৪১ এর স্মারকপত্রে উদ্ধৃত অংশবিশেষ অনুধাবন করলেই তা বোঝা যাবে।

১৯৪২-এর মাঝামাঝি ইউরোপের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুভাষচন্দ্র বুঝলেন জার্মানীতে থেকে তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা নাই। তিনি তখন জাপান ও দূরপ্রাচ্যের ভারতবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

ও পরোক্ষ আলোচনা চালাতে লাগলেন যাতে তিনি প্রাচ্যের রাজনৈতিক, সামরিকক্ষেত্রে উপনীত হতে পারেন।[১৩]

৪

এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে ৯ই আগষ্ট ১৯৪২ অগষ্ট আন্দোলন শুরু হলে সুভাষচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বার্লিন রেডিও থেকে এর সমর্থনে প্রচার চালিয়ে ভারতবাসীগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হন। ভারতের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক আন্দোলনই সুভাষচন্দ্রের ঈপ্সিত প্রথম ফ্রন্টের সংগ্রাম। এর সঙ্গেই তিনি তাঁর রচিত দ্বিতীয় ফ্রন্টের সংগ্রাম যুক্ত করে বৃটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। নেতাজী তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের কথা স্মরণ রেখে ভারতবাসীর উদ্দেশে বলেন: "আমার সমস্ত জীবনভর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন, আপসহীন সংগ্রামই আমার সততার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।"[১৪]

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কাছে বৃটিশের বিরুদ্ধে চরমপত্র দানের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তা গৃহীত হয়নি। ১৯৪২ এ কংগ্রেসের সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। গান্ধীজী বলেন: "জাপানী-বাহিনী যদি ভারতে আসে সে আমাদের শত্রু হিসাবে নয় বৃটিশের শত্রু হিসাবে আসবে। যদি বৃটিশ এখনই ভারত ত্যাগ করে, তিনি বিশ্বাস করেন তাহলে জাপানের ভারত আক্রমণের কোনো কারণ থাকবে না।"[১৫]

জওহরলালজী প্রথমে ফ্যাসীবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন, পরে তা পরিবর্তিত হয়। ১৪ই জুলাই '৪২-এর ওয়ার্কিং কমিটির 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন: "এই প্রস্তাব ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার অভিপ্রকাশ। বৃটিশ শক্তির ধ্বংস সাধনের উপর ভারতের সমস্যার সমাধান নির্ভর করে এবং ভারতবাসীগণকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রাম করতে হবে। প্রস্তাবটি মূলতঃ কংগ্রেসকে লেখকের (সুভাষচন্দ্রের) মতেরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

"গান্ধীজী ওয়ার্ধায় গৃহীত কংগ্রেসের প্রস্তাবকে যদিও খোলাখুলি বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তবুও সে প্রস্তাব বৃটিশের বিরুদ্ধে লেখক কর্তৃক প্রচারিত আশু আপসহীন সার্বিক সংগ্রামের নীতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের নীতির যে পার্থক্য তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারেনি। কিছু কংগ্রেস নেতার মনে এখনও বৃটিশের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার মনোভাব বিদ্যমান।"[১৬]

গান্ধীজী বলেন, "ভারতবর্ষকে মুক্ত করব নয়ত মৃত্যু বরণ করব।" তিনি

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-এর ডাক দিলেন। কিন্তু ৮ই অগস্ট '৪২ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশের পর ৯ই অগস্ট ভোর না হতেই অধিকাংশ মুখ্য কংগ্রেস নেতা জেলে বন্দী হন। জনতা নেতৃত্বহীন হয়েও আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে আন্দোলন অহিংস আচরণের বেড়া ডিঙিয়ে সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ তদানীন্তন সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ সে সহিংস আন্দোলনের শরিক হন এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করেন। জয়প্রকাশজী বলেন: "আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং বৃটিশকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়েছি। সেজন্য বম্বে প্রস্তাব অনুযায়ী বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত। যদি তা গান্ধীজীর নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তা হলে আমার দোষ নাই।"[১৭]

সরকারী হিসাব মতো সহিংস আন্দোলনে ২৫০টি রেলষ্টেশন, ২৫০টি পোস্ট অফিস, ৭০টি পুলিশ স্টেশন, ৮৫টি সরকারী ভবন পোড়ানো বা বিধ্বস্ত হয়। ৩৫০০টি স্থানে টেলিফোন, টেলিগ্রাম লাইন ছিন্ন করা হয়। পুলিসের লাঠি ও গুলিতে '৪২ এর শেষ পর্যন্ত ৯৪০ জন নিহত ও ১৮৩০ জন আহত হন। কলকাতা, চট্টগ্রাম, ফেণী অঞ্চলে বিমান আক্রমণে ১৬.৯.৪২ থেকে ১০.২.৪৩ পর্যন্ত ৩৪৮ জন নিহত, ৪৫৯ জন আহত হন। জওহরলালজীর মতে সরকারী সূত্রে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা যে ১০২৮ ও আহতের সংখ্যা ৩২০০ ধরা হয়েছে, সে সংখ্যা ভুল: মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের কম নয়। এই আন্দোলন দমনে ১১২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৮]

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারেনি। বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে জয়প্রকাশজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করেন কিন্তু পথে ১৮.১২.৪৩ এ আবার ধৃত হন।[১৯] ভারতের আভ্যন্তরীন আন্দোলনের সঙ্গে আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের সংযুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী পরবর্তীকালে অগস্ট আন্দোলনের হিংসাত্মক অভিপ্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিজেকে এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন।[২০] কিন্তু ১৯৪২ থেকে '৪৫ পর্যন্ত ঘটনায় ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার উত্তাল আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করার উপায় নাই।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে কমিউনিস্টদের আচরণও ছিল অদ্ভুত। তাঁরা তখন কট্টর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট। ভারতবর্ষে যখন জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধী-

নতার প্রশ্ন জ্বলন্ত তখন তাঁদের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বার্থ ছিল রাশিয়ার সর্বৈব স্বার্থের নীচে। যতদিন জার্মান-রুশ মৈত্রী অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন তাঁরা ছিলেন বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে সে যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত হল। ১৫ ডিসেম্বর '৪১ তাঁরা প্রস্তাব নিলেন —'এখন আমাদের প্রধান শ্লোগান হবে—জনযুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে জনতার আন্দোলনে যুক্ত করা'।

বৃটিশ সরকার কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি দিলেন এবং কমিউনিস্ট দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সদ্যমুক্ত ও গোপনতা থেকে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে সামরিক, বে-সামরিক নানা উচ্চপদে নিয়োগ করে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি বাধা সৃষ্টির উদ্যোগ করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হয়েছিল পরবর্তী কালে তা প্রকাশিত হলে জানা যায় সি. পি. আই-এর কর্মীরা বৃটিশের সামরিক ও বে-সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরগুলিকে ১৯৪২-এর আন্দোলনে জড়িত জাতীয় কর্মীদের ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর যেসব ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।[১১]

৫

ওদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকে সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব রণাঙ্গনে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে আহ্বান জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু জার্মানী থেকে শত্রু অধ্যুষিত বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পেরিয়ে দূরপ্রাচ্যে আসা প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হচ্ছিল। জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমা নেতাজীর পূর্বপ্রাচ্য গমনে জার্মানীর সম্মতি আদায়ে সহায়তা করেন। জার্মান সরকার দীর্ঘ সময় এ-বিষয়ে সাহায্য করতে টালবাহানা করছিলেন। অবশেষে সুভাষচন্দ্র ৮-২-৪৩ তারিখে আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান ইউ-বোট ইউ-১৯০ তে কিয়েল থেকে রওনা হন এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে আফ্রিকার উপকূল পেরিয়ে মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের একস্থানে জাপানী সাবমেরিন ১২৯-এ আরোহণ করেন। তারপর ভারতমহাসাগর পাড়ি দিয়ে সাবাং-এ উপনীত হন। পরে বিমানে ১৬-৫-৪৩ এ টোকিয়ো পেঁছান। ১৮ই জুন তাঁর আগমন টোকিয়ো বেতারে ঘোষিত হয়।[১২] প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে নানা আলোচনার পর জাপান অস্থায়ী সরকার গঠনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং ১৬ই জুন '৪৩ জাপান পার্লামেন্টে (Diet-এ) প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করেন: "জাপান ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় জনগণের শত্রু এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাব নির্মূল ও

বিতাড়ন করতে এবং ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের দৃঢ় প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।"[২৩]

১৯.৬.৪৩ এ টোকিয়োতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ "স্বাধীনতা কেউ দান করবে না, ভারতবাসীকে তা সংগ্রাম ও বলিদানের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হবে।"[২৪]

তিনি এক জাপানী সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারকে বলেছেন ঃ "জাপানীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভারতের যে কোনো প্রকার মুক্তি দাসত্বের থেকে অধম হবে।"[২৫]

২৪শে জুন, ('৪৩) টোকিয়ো বেতার থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশে বলেনঃ "আমি আপনাদিগকে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলব। যে বৃটিশ-সরকার আমার উপর জীবনভর অত্যাচার চালিয়েছে, আমাকে এগার বার জেলে নিক্ষেপ করেছে তারা আমাকে নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা আশা করতে পারে না।...কেউ তা করতে পারবে না।"[২৬]

এদিকে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৬৩০০ জন ভারতীয় সৈনিক [২৭] নিয়ে যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি বা আই. এন. এ. গঠিত হয়েছিল, তা তখন ভগ্নপ্রায়। রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র ২রা জুলাই ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরে আসেন এবং ৪ঠা জুলাই ১৯৪৩ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতিত্বের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই দিনের বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংএ সমবেত ভারতীয়দের উদ্দেশে বলেন ঃ "আমি পূর্ব-এশিয়ায় আমার স্বদেশবাসীগণকে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হতে এবং সামনের ভয়ানক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

"আপনাদের আমি আবার নিশ্চিত ভাবে বলতে চাই এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি, এবং ভবিষ্যতে যা করব তা সবই ভারতের স্বাধীনতার জন্য। ভারতের স্বার্থবিরোধী বা ভারতীয় জনগণের ইচ্ছার প্রতিকূল কোনো কাজ আমরা করব না। কার্যকরভাবে সমস্ত শক্তিকে সংহত করবার জন্য আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে চাই।"[২৮]

আই. এন. এ'র অভিবাদন গ্রহণ করে ৫ই জুলাই-এর ভাষণে তিনি বললেন ঃ "ভারতের মুক্তি-সেনানীবৃন্দ! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ আমার সৌভাগ্য যে বিশ্ববাসীকে জানাতে পারছি, ভারতের মুক্তি-বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। ...এই বাহিনী ভারতের নিজস্ব বাহিনী এবং প্রত্যেক ভারতবাসী একথা জেনে গৌরববোধ করবেন যে ভারতীয় নেতৃত্বেই এই বাহিনী গঠিত।

"সৈনিক হিসাবে আপনাদের আদর্শ হবে—বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা ও বলিদান। প্রকৃত সৈনিক হতে হলে সামরিক ও আত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন।

"বর্তমানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, কষ্টকর পথশ্রম আর মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই আমার দেবার নাই। কিন্তু জীবনে-মরণে আপনারা আমাকে অনুসরণ করলে মুক্তির বিজয় পথে আপনাদের নিয়ে যাব···প্রার্থনা করি ঈশ্বর আগামী যুদ্ধে আমাদের জয়ী করুন।"[২৯]

৬ই জুলাই ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এক সভায় ঘোষণা করলেন যে ভারতের উপর জাপানের কোনো আঞ্চলিক, সামরিক বা আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং যে কোনো বৈদেশিক শাসন থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপান মুক্তি আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।[৩০]

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে জনতা ও আজাদী বাহিনীর বিশাল যুক্ত সমাবেশে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : "ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের দ্বারা যদি আদৌ স্বাধীনতা লাভ করা যেত, তাহলে এই বন্ধুর পথ বেছে নিতাম না। সংক্ষেপে বলতে পারি, আমার ভারত ত্যাগের উদ্দেশ্য হল ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা আন্দোলনকে বাইরে থেকে সাহায্য করা। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

"বৃটিশ সরকারই যখন আমার সংকল্পকে ধ্বংস করতে পারেনি, আমাকে প্রতারিত বা প্রলোভিত করতে পারেনি তখন অন্য কেউই তা পারবে না।···

"পূর্ব-এশীয় ভারতীয়গণ এমন একটি সংগ্রামী বাহিনী গঠন করতে চলেছেন যে-বাহিনী ভারতের বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণের স্পর্ধা রাখে। আমরা যখন এই আক্রমণ পরিচালনা করব তখন যে-বিপ্লব শুরু হবে তা শুধু দেশের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বৃটিশের পতাকাতলে যে ভারতীয় সৈন্যদল রয়েছে তার মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হবে। বৃটিশ সরকার এইভাবে ভিতরে বাইরে আক্রান্ত হয়ে ধ্বসে পড়বে এবং ভারতবর্ষ অর্জন করবে স্বাধীনতা।

"বন্ধুগণ! ত্রিশ লক্ষ পূর্ব-এশীয় ভারতীয়গণের শ্লোগান হোক 'সার্বিক যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ'। সাহসী ভারতীয় নারীদের নিয়ে আমি একটি মৃত্যু-ভয়হীন নারীবাহিনীও গড়ে তুলতে চাই···।

"···স্বদেশবাসী ভারতীয়গণ দ্বিতীয় রণাঙ্গন কামনা করছেন। আপনারা সমগ্র ধনবল জনবল আমার হাতে অর্পণ করুন, আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করব—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"[৩১]

২৬শে জুলাই সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের শেষ সংগ্রামী শাসক বাহাদুর শাহের সমাধিতে মাল্য অর্পণ করেন। ২৫শে অগস্ট '৪৩ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আই. এন. এ'র সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মুক্তিবাহিনীর নাম দেন—আজাদ-হিন্দ ফৌজ। এই উপলক্ষে নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেন: "আমি নিজেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৩৮ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে মনে করি।...অনাবিল জাতীয়তাবোধ, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই কেবল আজাদ-হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে।

"আসুন, "দিল্লী চলো" হুঙ্কারে আমরা যুদ্ধযাত্রা শুরু করি—রাজধানী দিল্লীর বড়লাট ভবনে জাতীয় পতাকা উড্ডীন না হওয়া পর্যন্ত এবং লালকেল্লায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের দীপ্ত বিজয় প্রদর্শনী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিরাম নাই।"[২]

এই বৎসরই ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন পালিত হয় এবং ব্যাঙ্কক রেডিও থেকে নেতাজী, মহাত্মাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষণ দান করেন।

৬

২১শে অক্টোবর '৪৩ অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র সেই সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্র হন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব। সরকারের ঘোষণাপত্রের মধ্যে বলা হয়: "এই অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে বৃটিশ ও তার মিত্রশক্তিগুলিকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করা, তারপর...ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী সরকার গঠন।

"এই সরকার প্রত্যেক নাগরিককে যে কোনো ধর্ম-পন্থা অনুসরণের স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও সমান সুযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সমগ্রজাতির সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে আজাদ-হিন্দ সরকার কৃতসংকল্প।...বিদেশী সরকার ভারতবাসীর মধ্যে অতীতে যে সকল বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, এই সরকার তা নিঃশেষ করবে।

"ভগবানের নামে, আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ ভারতীয় জনগণকে একজাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে গেছেন তাঁদের নামে এবং যে সব পরলোকগত বীরপুরুষেরা আমাদের মধ্যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তাঁদের নামে, আমরা প্রত্যেক ভারতীয়কে আজাদ-হিন্দ সরকারের পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছি।"[৩]

২২শে অক্টোবর '৪৩ সিঙ্গাপুরে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত

হয়। নয়টি রাষ্ট্র (জার্মানী, জাপান, ইটালী, চীন-নানকিং সরকার, মাঞ্চুকুয়ো ক্রোয়েসিয়া, ফিলিপাইন, বর্মা, শ্যামদেশ) আজাদ-হিন্দ সরকারকে স্বীকার করে নেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ডি-ভ্যালেরা নেতাজীকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন পাঠান। ২৩শে অক্টোবর আজাদ-হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে বৃটেন ও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে দুই ডিভিসন সৈন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং তৃতীয় ডিভিসন তৈরির কাজ চলছিল। আর ও দু'টি ডিভিসনের জন্য সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছিল।

১৯৪৫ সালে এই সেন্যসংখ্যা ৪৫ হাজারের কম ছিল না।[৫৪] আজাদ-হিন্দ সরকারের অসামরিক বিভাগের প্রশাসক কে. এস. গিয়ানী লিখেছেন যে, আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ১৫০০ অফিসার ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সৈনিক ছিলেন এবং আরও ৩০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল।[৫৫]

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাবকমিটিগুলি সাধারণভাষা, রোমানলিপি প্রবর্তন, নারীপুরুষের পোষাক, জয়হিন্দ অভিবাদন, স্মারকমেডেল ও উপাধিপ্রদান, সৈন্যদের ভাতা পেনসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা কার্যকরী করতে সাহায্য করে। মুক্তাঞ্চলে প্রশাসনিক সংগঠনের জন্য বিভাগ সৃষ্টি হয়। ২৫শে অক্টোবর নেতাজী বৃহৎ পূর্ব-এশীয় সম্মেলনে (Great East Asia Confe-) rence) যোগদানের জন্য টোকিয়ো যাত্রা করেন। মেজর জেনারেল ভোঁসলা (সৈন্যাধ্যক্ষ) এস. এ. আয়ার (প্রচার সচিব), এ. এম. সহায় (সরকারের সেক্রেটারী) এবং মেজর আবিদ হাসান নেতাজীর সঙ্গে যান। ৫ই নভেম্বর এই সম্মেলন শুরু হয়। নেতাজী এই সম্মেলনে আজাদ-হিন্দ সরকারের তরফে একজন দর্শক হিসাবে যোগদান করেন। সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১. স্বাধীনতা ২. ন্যায় ও ৩. পারস্পরিকতার নীতি গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ এই সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেন: "বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে অন্যত্র নূতন পদ্ধতি গঠনের প্রচেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। সংগঠনকারীদের স্বার্থপরতা, লোলুপতা ও সন্দেহপরায়ণতাই এর ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"রাষ্ট্রপ্রধানগণ! আপনারা জানেন বিশ্বজনীনতা ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"...অনেক দুঃখ, কষ্ট ও অবমাননার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে শিখেছি মিথ্যা আন্তর্জাতিকতা আর সত্য আন্তর্জাতিকতার পার্থক্য কি ? বুঝেছি সেই

আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে অবহেলা করে না এবং জাতীয়তাই যার ভিত্তি।

"..বৃটিশ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ থেকে মুছে যাবে এবং পূর্ব এশিয়া থেকে ভীতির ছায়া চিরদিনের মত লুপ্ত হবে।"[২৬]

এই সম্মেলনেই তোজো আজাদ-হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। তিনি বলেন, নেতাজী ভারতেব প্রধান হবেন। সুভাষচন্দ্র এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন—তোজো নন, ভারতেব জনগণই স্থির করবেন স্বাধীন ভারতের প্রধান কে হবে। তিনি একজন সেবক মাত্র। নেতাজী ডিসেম্বরের ('৪৩) মধ্যেই আন্দামান যান এবং উক্ত দ্বীপপুঞ্জগুলির নামকরণ করেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। সেখানে আজাদ-হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সেলুলার জেল থেকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার নেতাজী মেজর জেনারেল এ.ডি. লোগনাথনের উপর ন্যস্ত করেন। জানুয়ারি '৪৪-এ নেতাজী রেঙ্গুনে ফিরে আসেন এবং ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৪ সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে সরকার, ফৌজ ও স্বাধীনতালীগের হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত হয়। আজাদ-হিন্দ সরকারের অধীনে ভারতীয়দের অর্থে আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

৪ঠা জুলাই ১৯৪৩ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই অভাবনীয় দ্রুততার সঙ্গে লীগ, ফৌজ ও সরকারী দপ্তরসমূহ সংগঠিত করে আজাদ-হিন্দ সরকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। নভেম্বর '৪৩-এ প্রথম রেজিমেন্টকে সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা লীগ সৈন্যবাহিনীকে এবং সরকারী দপ্তরসমূহকে সর্বতোভাবে সাহায্য করত। মালয়ে এই লীগের শাখা ছিল ৭০টি এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। বর্মায় ও শ্যামে যথাক্রমে ১০০টি ও ২৪টি শাখা গঠিত হয়। আন্দামান, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিয়ো, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন, মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপানে লীগের শাখা স্থাপিত হয়। আজাদী বাহিনীগুলির নামকরণ করা হয়, আজাদ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু বিগ্রেড প্রভৃতি। ঝাঁসির রাণীবাহিনী, বালসেনাদল এবং আত্মঘাতী স্কোয়াডও গঠিত হয়েছিল। সুভাষ ব্রিগেড গঠিত হলে নেতাজী ঐ নাম খারিজ করে দেন। আজাদী সৈনিকগণ একই রন্ধনশালায় তৈরী খাবার একসঙ্গে আহার করতেন। নেতাজী নিজে আহার্য খেয়ে দেখতেন ও ব্যারাক পরিদর্শন করতেন।

১৮ই মার্চ ১৯৪৪ আজাদী ফৌজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কোহিমা

অধিকার করে এপ্রিলে তারা ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা আজাদ-হিন্দ সরকারের অধীনে আসে এবং সেখানে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ দ্রুততালে চলতে থাকে। নাগারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজাদী বাহিনীকে সাহায্য করে। আরাকান, কালাদান, হাকা-ফালম, কোহিমা, ইম্ফলের প্রান্তরে প্রান্তরে আজাদী বাহিনীর যুদ্ধজয়ের গৌরব সকলের মনে বিপুল উৎসাহের ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে-বৎসর অনেক আগে মৌসুমীর দুর্ভাগ্যজনক আগমন ও জাপানী বাহিনীগুলির কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। জুনের শেষে নেতাজীর আদেশে আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসন পিছনে ফিরে আসতে থাকে।

৪ঠা থেকে ১১ই জুলাই (১৯৪৪) নেতাজী সপ্তাহ পালিত হয়। এক বৎসর আগে নেতাজী (৪ঠা জুলাই ১৯৪৩) ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ই জুলাই ১৯৪৪ নেতাজী মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে ভাষণ দেন: "‥ভারতের বাইরে যে সব ভারতীয় আছেন তাঁহাদের কাছে পদ্ধতির অনৈক্য, পারিবারিক অনৈক্যের সমান।

"প্রবাসী ভারতীয়গণ এবং ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক বিদেশী বন্ধুরা আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন, ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে আপনার 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব ঘোষণার পর তা তাঁদের শতগুণ বেড়ে গিয়েছে।

"...বাইরে থেকে কাজ না করলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে এ আশা যদি আমার বিন্দুমাত্রও থাকত তাহলে এই সংকট মুহূর্তে আমি কখনো ভারতবর্ষ ত্যাগ করতাম না।

"...বৃটিশ রাজনীতিকরা যখন আমায় মিষ্টি কথায় বা জোর করে প্রলোভিত করতে পারেনি তখন জগতের অন্য কোনো দেশের রাজনীতিকদেরও সে সাধ্য নাই।

"স্বদেশীয়রা যদি কোনোরকমে নিজেদের চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করতে পারেন অথবা বৃটিশরা যদি আপনার 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব মতো ভারত ছেড়ে চলে যায় তা হলে আমাদের চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি এই দুইয়ের কোনটাই সম্ভব হবে না—তাই সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য।

"ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতভূমিতেই এখন সাহসভরে যুদ্ধ করছে।

"আপনি আমাদের জাতির পিতা, তাই ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"[৩৭]

যুদ্ধ-পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন হলে বর্মার মধ্য থেকে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং মান্দালয়ে ডিভিসনাল হেড কোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে নেতাজী মেমিও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এই সময়ে সেখানে শত্রুপক্ষ নির্বিচারে বোমা ফেলে এবং মেসিনগান থেকে গুলি চালায়। নেতাজী রেঙ্গুনে ফিরে এক মন্ত্রনা সভায় বলেন যে তাঁরা যদি '৭৪-এর জানুয়ারির মধ্যে আক্রমণ শুরু করতে পারতেন এবং উপযুক্ত বিমান সাহায্য পাওয়া যেত তাহলে বর্ষা শুরু হবার আগেই ইম্ফল অধিকারের আশা করা যেত। বর্ষার আগে আজাদী ফৌজ প্রতিফ্রন্টেই এগিয়েছিল বা শত্রু-দের ঠেকিয়ে রেখেছিল।[৩৮]

যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সংহত করার জন্য ক্ষুদ্রায়তন সমর পরিষদ গঠিত হয়। নভেম্বরের প্রথমদিকে নেতাজী নূতন জাপানী প্রধান মন্ত্রী কাইসোর আমন্ত্রণে টোকিয়ো যান। সম্রাট হিরোহিতোও নেতাজীকে অভ্যর্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রী কাইসো তাঁর আয়োজিত ভোজসভায় ঘোষণা করেন যে ভারতীয় ভূখন্ডের উপর জাপানের কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁদের সাহায্যের বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে তাঁরা কোনো সুবিধা চান না। জাপান তার সংস্কৃতি ও ধর্মের জন্য ভারতের কাছে ঋণী…।[৩৯]

জাপান পুনরায় ভারতকে সর্বৈব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আজাদ-হিন্দ সরকারের বৈদেশিক দফতরের সঙ্গে জাপান সরকারের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।[৪০] এই সময় জাপানের যুদ্ধ-পরিস্থিতিও খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

৭

নভেম্বরে (১৯৪৪) টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে এক ঐতি-হাসিক ভাষণের মধ্যে নেতাজী বলেন ঃ "·· অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

"কয়েক হাজার বছর আগেকার মতো আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা যদিও মূলতঃ একই তথাপি আমরা পরিবর্তিত হয়েছি এবং সময়ের সাথে চলেছি।

"আমাদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমরা চাই এক আধুনিক ভারতবর্ষ, অবশ্য অতীতের উপর যার ভিত্তি থাকবে।"[৪১]

তারপর তিনি প্রথমতঃ প্রতিরক্ষা সংগঠন দ্বিতীয়তঃ ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান ও তৃতীয়তঃ শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে বলেন ঃ "এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় কাজ করতে চাই। আমরা স্বভাবতঃই অন্যান্য দেশের পরীক্ষাগুলি বিবেচনা করব। কিন্তু তা সত্বেও ভারতীয়

পদ্ধতিতে ও ভারতীয় পরিবেশে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। সেজন্য পরিশেষে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করব তা হবে ভারতবাসীর প্রয়োজনের উপযোগী এক ভারতীয় পদ্ধতি।

আমরা আজ কার্যতঃ দেখছি যে আমাদের বর্তমানের জাতীয় আন্দোলন জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম এবং এই জনসাধারণের শতকরা ৯০ভাগের বেশী হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক। এঁদের স্বার্থ আমাদের অন্তরে, সেজন্য কমিউনিস্ট পার্টির মতো একটি স্বতন্ত্র দলের কোনো প্রয়োজন নাই।"[৪২]

দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র চেয়েছেন— যে রাষ্ট্র জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করবে এবং যা ধনীদের চক্রান্তে পরিণত হবে না। তিনি জানান, দেশের সর্বপ্রকার বিভেদ সৃষ্টির মূলে বৃটিশ সরকার। আজাদ-হিন্দ ফৌজের মধ্যে ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীর প্রশ্ন নাই। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন কি হবে— তার জবাব দিয়ে বলেন ঃ "এই প্রশ্নে আমি আমার মতামত দশ বছর আগে Indian Struggle নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি।· · যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বলা বোকামি হবে যে—কোনো একটি পদ্ধতি মানব প্রগতির শেষ ধাপ।·· পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নূতন পদ্ধতি তৈরি করব।

"ন্যাশনাল সোস্যালিজম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছে কিন্তু তা ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয় নি।

"অপর দিকে কমিউনিজমের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত পদ্ধতি পরীক্ষা করা যাক। এতে এক বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করবেন— তা হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজম যেখানে দুর্বল তা হচ্ছে কমিউনিজম জাতীয় প্রবণতার মূল্য দেয় না। আমরা ভারতে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ।

"ভারতবর্ষ সেজন্য রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হবে।"[৪৩]

কঠিন যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র সতত তাঁর আদর্শের কথা ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে নূতন ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন তা হবে বর্তমানের প্রচলিত রাষ্ট্র-

পদ্ধতিগুলি— যেমন ধনবাদ, ফ্যাসীবাদ, ও কমিউনিজম প্রভৃতি থেকে— স্বতন্ত্র এক সমাজ সভ্যতা। তিনি তাঁর রচিত Indian Struggle গ্রন্থে লিখেছেন : "...পরবর্তী ধাপে সংস্কৃতি সভ্যতার লক্ষণীয় অবদানের দায়িত্ব হবে ভারতবর্ষের।"[৪৯]

ভয়ংকর সামরিক পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রের অতন্দ্র দর্শন ভাবনা তাঁকে আদর্শবাদী জীবন-সংগ্রামী বলে চিহ্নিত করে। আই. এন. এ.-বিষয়ে একজন গবেষক তাঁর সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বলেছেন : "বস্তুতঃ তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) নেতৃত্ব ছিল বহুমাত্রিক (many dimensional)। তিনি যে শুধু সৈনিক ও সাধারণের মনে দেশপ্রীতির প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।... গভীর যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে তিনি বিপ্লবের একটি আর্থিক-রাজনৈতিক দর্শন চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বিরল ক্ষমতার মধ্যেই আর নেতৃত্বের মহানতা নিহিত রয়েছে।"[৫৭]

৮

১০ ফেব্রুয়ারি '৪৫ রেঙ্গুনের মিয়াং হাসপাতালে আমেরিকার ফ্লাই ফোর্ট্রেস বি-২৯ বিমান থেকে ভীষণ বোমাবর্ষণ হয়। অসংখ্য আহত ফৌজী মারা যান— হাসপাতালের ত্রিশফুট উপরে রেডক্রস পতাকা উড্ডীন থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ-আমেরিকান বাহিনী কর্তৃক এই জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়। আজাদী সৈনিকেরা বর্মায় মিথটিলা, ন্যানগু, পেগান, কাউকপাডাঙ; পোপা, লেগি, ও সাদি পাহাড় অঞ্চলে মৃত্যু তুচ্ছ করে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সময় বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনায় অনেক আজাদী সৈনিক অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে নেতাজী অফিসারদের পরামর্শে ও চাপে ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫ রেঙ্গুন থেকে বিপদ-সংকুল পথে ব্যাঙ্কক যাত্রা করেন। বর্মা ত্যাগের আগে তিনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতি এক ভাষণে বলেন : "ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ থেকে আপনারা দুঃসাহসিক যুদ্ধ করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন। ইম্ফলে ও বর্মায় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্বের পরাজয় ঘটেছে। এটা শুধু প্রথম পর্ব। আমাদের আরো অনেক পর্ব যুদ্ধ করতে হবে।... শত্রুর বিরুদ্ধে ইম্ফলে আরাকানের জঙ্গলে পর্বতে, বর্মার প্রান্তরে প্রান্তরে আপনাদের দুঃসাহসিক যুদ্ধের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

"আপনাদের আত্মত্যাগের ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ক্রীতদাস হয়ে নয়,

স্বাধীনদেশের নাগরিক হিসাবে জন্মলাভ করে আপনাদের প্রশংসা করবে। জগতের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে তাদের পূর্বসূরীরা আসাম, মণিপুর বর্মার যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করেও পরিশেষে তাঁদের গৌরবময় বিজয় এনে দিয়েছেন।

"আপনাদের হাতে নিরাপদ আমাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আর ভারতীয় যোদ্ধাদের গৌরবময় ঐতিহ্য রেখে যাচ্ছি।

"আজাদী অফিসারদের পরামর্শে, স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার স্বার্থে আমাকে বর্মা ত্যাগ করতে হচ্ছে।...আপনাদের দুঃখকষ্টভোগ বৃথা যাবে না। আপনারা আমার মতো বিশ্বাস করুন— উষার আগে আসে তমিস্রাঘন অমা-নিশা। ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধীন হবে।'[৪৬]

১৯৪৫-এর মে মাসে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে আজাদী বাহিনীকে যুদ্ধ শেষ করতে হয়। নেতাজী জুন মাসের বেতার ভাষণগুলিতে ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। ২০ জুন ১৯৪৫ ভারতবাসীদের উদ্দেশে আবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আবেদন করেন— যাতে বৃটিশের সঙ্গে কোনো আপস সম্ভব না হয়। ২১শে জুন '৪৫ তিনি বলেন: "বর্তমান যুদ্ধকালে স্বাধীনতা লাভ না হলেও যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতালাভের সুযোগ আমরা পাব।"[৪৭]

নেতাজী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য জুন-জুলাই মাসে ('৪৫) মালয়ে আরো দুই ডিভিসন আজাদী সৈন্যবাহিনী গঠনের তৎপরতা পরিদর্শন কর-ছিলেন। ৮ জুলাই '৪৫ যুদ্ধে নিহত চার হাজার আজাদী সৈনিকের স্মরণে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে শহীদস্তম্ভের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। পর-বর্তীকালে এই শহীদস্তম্ভ মাউন্টব্যাটেনের বর্বর আদেশে বিধ্বস্ত হয়।

সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ আরো প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। ৬ অগস্ট ('৪৫) আমেরিকা কর্তৃক হিরোসিমায় আণবিক বোমা বর্ষিত হয়। ১০ অগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫ অগস্ট ('৪৫) জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে নেতাজীর উদ্দেশে বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ১৮ অগস্ট ('৪৫) বিমান দুর্ঘটনার অন্তরালে নেতাজী দ্বিতীয়বার অন্তর্ধান করেন। ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার একবার বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করেছিল তিনি তখন জার্মানীতে অবস্থান করছিলেন। এবার সেই কৌশল বৃটিশের

বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও নানা ভাগ্য বিপর্যয়ে বিপ্লবী নায়ক ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রকে ফিরে যেতে হল।

৯

কিন্তু বন্দী আজাদী বাহিনী ভারতবর্ষে আনীত হলে সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলনের আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে। ৫ নভেম্বর '৪৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লীর লালকেল্লায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি.এস. ধীলন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল পি. কে. সাইগল, ও মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খানের বিচারের প্রহসনের সময় ভারতব্যাপী বিপুল গণ আন্দোলনের চাপে এঁদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করতে হয় এবং সমস্ত আজাদী সৈনিকের শাস্তির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। হাজার হাজার আজাদী সৈনিক মুক্তি পেয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন এবং ভারতবাসী তাঁদের মুখে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর অপূর্ব অজ্ঞাত কাহিনী শুনে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হন। '৪৬-এর ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন রসিদের সাত বৎসর কারাদণ্ড হলে ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ('৪৬) দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতায় তীব্র হিংসাত্মক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম জনতা একত্রে রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। নেহরুজী অকিনলেককে লিখলেন— আই. এন. এ-র জনপ্রিয়তার 'গভীরতা ও ব্যাপ্তি' আশ্চর্যজনক।[৪৮] জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে সীতারামাইয়া লিখেছেন : "...কিছুকালের জন্য অবশ্য মনে হল কর্নেল শাহ্‌নওয়াজ, সাইগল, ধীলনের নাম জাতীয় নেতাদের নাম ম্লান করে দিয়েছে। মনে হল আজাদ-হিন্দ ফৌজই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করে দিয়েছে...।"[৪৯]

রেঙ্গুনে আজাদী সৈনিকদের সঙ্গে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর লোকেদের গভীর যোগাযোগ ঘটে এবং এঁদের মধ্যে ব্যাপক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। "এর ফলে ভারতীয় বাহিনীগুলিতে অভুতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়।"[৫০]

তারপর বৃটিশ সরকার পনেরো লক্ষ সৈনিক ও অফিসারকে ভারতীয় বাহিনী থেকে অপসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তাঁরা দ্রুত বৃটিশ সরকারের আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন এবং আই. এন. এ.-র মর্যাদায় প্রভাবিত হয়ে তাঁরা অজ্ঞাতসারে ভারতের স্বাধীনতাব সৈনিক হয়ে পড়েন।[৫১]

'৪৬-এ বিমান বাহিনীতে ধর্মঘট হয়। সমগ্র নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ, কলকাতা, কোচিন, বিশাখাপত্তনম

আন্দামান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাইতে সাত হাজার নৌসেনা ধর্মঘটে যোগ দেয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অর্থবহ অনীহার ফলে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। ভারতবর্ষ বৃটিশের পক্ষে মারাত্মক এক বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়ায় কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব ভীত হয়ে বিপ্লব দমনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ডঃ কে. কে. ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তকে (Indian National Army) ঠিকই লিখেছেন ঃ "কংগ্রেস ভারতে যে বিপ্লবাত্মক জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করল তাতে নেতৃত্ব দেবার অনিচ্ছা ও সম্ভবতঃ অক্ষমতার জন্য তাঁরা সেই অবস্থা দমনে বৃটিশের মতোই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল।"[৫২]

১৯৪৬-এর মার্চে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বলল যে এ সময় বিপ্লবাত্মক ঘটনা কংগ্রেসের পথের বাধাস্বরূপ।[৫৩] বিদ্রোহ প্রশমিত হলেও সরকার অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল। একজন রক্ষণশীল প্রতিনিধি বৃটিশ পার্লামেন্টে বলেন ঃ "ভারতে যে আবহাওয়া হয়েছে তা বিপদসঙ্কুল, যে-কোনো দুষ্ট ব্যক্তি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে দিতে পারে।"[৫৪]

বস্তুতঃ বৃটিশ সরকার সম্মান বাঁচিয়ে ভারত ত্যাগে উদ্‌গ্রীব হল এবং সত্বর তা কার্যকর করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে ১৬ অগাস্ট ('৪৬) এ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল এবং হাজার হাজার লোকের প্রাণবলি হতে লাগল। '৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে হিন্দু-মুসলিম জনতার বৃটিশ-বিরোধী সমবেত উত্তাল আন্দোলনের সময় থেকে মাত্র পাঁচটি মাসের ব্যবধানে বৃটিশের প্ররোচনায় তাদের কুটিল উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ধূর্ত বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের সাহায্যে, কংগ্রেসের অক্ষম নেতৃত্বের দুর্বলতায় ও কমিউনিস্ট সমর্থনে ভারত-বিভাগে কৃতকার্য হল। অখণ্ড ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে খণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করল। বৃটিশ সরকার আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করবে ; একথাই সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতিকে কটাক্ষ করে হুঁসিয়ারী দিয়ে বলেছিলেন ঃ "ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকেজো করে দেবার জন্য অন্তর্বিভাজন প্রয়োজন।"[৫৫]

১২ সেপ্টেম্বর ('৪৪) বর্মা থেকে তিনি এক বেতার ভাষণে বলেন ঃ "আমার স্বদেশবাসীগণ!··· প্রাচ্যে আমরা ভারতীয়রা স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের জন্য সংগ্রাম করছি।···আয়াল্যাণ্ড, প্যালেস্টাইন আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমরা বুঝেছি দেশের অন্তর্বিভাজন তাকে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করে দেবে।

"ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাই।

"আমি নিশ্চিত যে পাকিস্তান স্বীকৃত হলেও আমাদের সমস্যার সামাধান হবে না।··· আমাদের স্বর্গসম মাতৃভূমিকে খণ্ডিত কোরো না।"[৫৬]

সুভাষ-নেতাজীর আবেদনে, হুঁসিয়ারীতে প্রধান ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্ণপাত করেন নি। আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য বিধ্বস্ত হলে বৃটিশ ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে হিউ টয় বলেছেনঃ "এতে সন্দেহ নাই যে আজাদ-হিন্দ বাহিনী তার বজ্রঝঞ্ঝাতুল্য ভাঙনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে দেয়।"[৫৭]

প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি কলকাতার গভর্নর হাউসে (১৯৫৬ সালে) তদানীন্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি পি. বি. চক্রবর্তীকে বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলির মধ্যে বৃটিশের প্রতি আনুগত্য শিথিল হয়ে যাওয়াই বৃটিশশক্তির ভারতত্যাগের প্রধান কারণ।"[৫৮]

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির পরাজয় ঘটলে অখণ্ড ভারতে আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নূতন এক সমাজবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনা ছিল ভাগ্যের পরিহাসে তা প্রতারিত হল। বিশ্ব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে পৌঁছবার জ্বলন্ত ভারতীয় প্রত্যাশা অন্তর্হিত হল। ভারতীয় জনতার হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়ার স্বপ্নের রূপায়ণ হল ব্যাহত। বিধাতা ভারতবর্ষকে আবার সে সুযোগ এনে দেবেন কিনা— এ প্রশ্ন ভারতবাসীর মনে এক-কঠিন জিজ্ঞাসার অবতারণা করে।

১০

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় বলেন: "আদিতে ও অন্তে তিনি (নেতাজী) ছিলেন ভারতবাসী। আর তাহার অধিক হইল এই যে তিনি অনুগামীদের অন্তরে উৎসাহের এমন আগুন জ্বালাইয়াছিলেন যে তাঁহার সম্মুখে তাহারা সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া একটিমাত্র মানুষের মত কাজ করিয়াছিল।··· সেখানে (প্রাচ্যে) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহসী যুবকগণকে লইয়া তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করিলেন এবং একটি শক্তিশালী গভর্নমেন্টের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। নেতাজী যে-সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াছেন তাঁহা

অপেক্ষা কম শক্তিশালী অপর কেহ হইলে তাহাতে ভাঙিয়া পড়িতেন।"[৫৯]

টোকিয়োতে পূর্ব-এশীয় সম্মেলনে নেতাজীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিউ টয় লিখেছেন: "টোকিয়োতে উপস্থিত বিদেশী রাজনৈতিকগণ রাজনৈতিক মর্যাদায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবের দিক দিয়ে কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না— জাপান তা উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করেছিল। · তিনি জাপানী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে স্তুতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন ·।"[৬০]

নেতাজী সম্পর্কে আলেকজান্ডার ওয়ার্থ লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও নৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলির অনেকে এবং অন্যান্য দেশ এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতির পক্ষপাতিত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কোনো দেশ কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির বিচার নির্ভর করে কোনো নীতির বিষয়ে সে দেশের সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। কমিউনিস্ট বা অ-কমিউনিস্ট সব দেশের সম্পর্কেই এ কথা সত্য। ·· কাল যত এগিয়ে যাবে সুভাষচন্দ্রের খ্যাতি ততই বাড়বে অন্ততঃ সেই সব দেশে যেখানে এখনো তিনি স্বীকৃত নন এবং ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও।[৬১]

ইতিহাসের রথচক্রের গতিরোধের সাধ্য কারো নাই। ভারতবাসী প্রার্থনা করে তিনি আবার আবির্ভূত হয়ে ভারতের আত্মাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন। যাঁরা সুভাষচন্দ্রের জীবনেতিহাস অনুধাবন করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন ১৮ অগস্টের ('৪৫) বিমান দুর্ঘটনা একটি প্রয়োজনীয় ছলনামাত্র। ভারতীয় নেতৃবর্গ ও সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার গুরুদায়িত্বও এড়িয়ে চলেছেন। দুটি কর্তাভজা কমিটি, কমিশনের মিথ্যা ও পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্তের প্রতারণা কাটিয়ে ওঠাই যথেষ্ট নয়।

ভারতবর্ষ তার ঈপ্সিত অখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। নূতন ও আদর্শ ভারত গঠনে রয়েছে এখনো দুস্তর বাধা। অনেক দুঃখ ও অশ্রুবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সে পথ বেয়ে যেতে হবে এবং নেতাজীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও দেশসেবার সংগ্রামী আদর্শই আমাদের সাফল্যে উত্তীর্ণ করতে পারে। সুভাষদর্শনের রূপকার বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায় তাই লিখে গেছেন: "ভারতবর্ষ, বারবার তোমার ইতিহাসে আসবে অন্ধতমসাময় দুর্দিন। সেদিন ভুলোনা তোমার এই রুদ্রসাধককে, এই মরণ-বিজয়ী ভারতপথিককে।"[৬২]

—

নান্যঃ পন্থা

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতা মাত্র নন, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস-পুরুষ। তাঁর চেতনায় ভারতবর্ষের অবস্থিতির একটা উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছিল বলেই ভারতবর্ষের ভূমি তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল তীর্থতুল্য, এবং সেই হেতু নিজেকে তিনি আখ্যাত করেছেন 'ভারত-পথিক' রূপে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতের মুক্তি এবং সকলের জন্য অখণ্ড স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির চক্রান্তগুলিকে তিনি খুব গভীর-ভাবে পূর্ব থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ভারতবর্ষ বিভাজনের অশুভ ইঙ্গিত পেয়ে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে প্রাচ্যের এক বেতার কেন্দ্র থেকে দেশের নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে বলেছিলেন: "...দেশ বিভক্ত হলে তার আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিনাশ ঘটবে।... আমাদের স্বর্গতুল্য মাতৃভূমিকে খণ্ডিত কোরো না।"[১]

এর ছয় বৎসর পূর্বে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণেও তিনি বলেছেন: 'বিভেদ সৃষ্টি দ্বারা শাসন কায়েম রাখার নীতিই হচ্ছে সাম্রাজ্যশাহীর ভিত্তি, এ সত্য সকলের বিদিত।... এই নীতি অনুসারে আয়ার্ল্যান্ডের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে আলস্টারকে অবশিষ্ট আয়ার্ল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এইভাবে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের আগে ইহুদীগণকে আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকেজো করে দেবার জন্য এরূপ অন্তর্বিভাজন অপরিহার্য।"[২]

সুভাষচন্দ্রের সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা জাগিয়ে তুলে অনিবার্য দেশভাগের পথ উন্মুক্ত করলেন। দেশে আজাদ-হিন্দ সৈনিকদের বিচারের সময়ে এসেছিল জাগ্রত গণচেতনার জোয়ার এবং সকল বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলির ভিতরে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়েছিল, কিন্তু তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে বিধ্বস্ত করে ক্ষমতালিপ্সু লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে বৃটিশ-অর্পিত স্বাধীনতা অর্জন করলেন। দেশ ভারত-পাকিস্তানে বিভক্ত হল।

অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের অপমৃত্যুর ফলে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার ক্রূরতায় আকাশে বাতাসে মানুষের আর্তনাদ ধ্বনিত হল। আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধসমূহ চূর্ণ করে ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার ক্রন্দন-রোলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল দুটি দেশের রাষ্ট্ররথ। দেশভাগ সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে সজীব করে রাখতে সাহায্য করল। ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের বিরুদ্ধে কোনো কথাই শোনা গেল না, বিশ্বের কোনো প্রগতিবাদী রাষ্ট্রের কাছ থেকেও। পরবর্তীকালে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল যে ধর্মই জাতিরাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির পরিবর্তে সন্দেহ, রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাত, পরস্পরকে হেয় করার মানসিকতা বৃদ্ধি পেল। বৃহৎ শক্তিগুলির গোপন চক্রান্ত-জাল বিস্তারের অনিবার্য ঘাটি হয়ে উঠল এই বিশাল অখণ্ড ভৌগোলিক অঞ্চল। অখণ্ড ভারতের সম্ভাব্য সংহত আর্থিক বনিয়াদ খণ্ডিত অবস্থায় অবিন্যস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। স্বার্থসন্ধ নেতৃত্বের ভেদবুদ্ধি কেবল রাষ্ট্রবিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকল না, দেশের অভ্যন্তরে সমাজ নানা বিভেদের বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ল। ভারতের মূল্যবোধের ব্যাপক বিনষ্টির উপর বিভেদ, হানাহানি বিচ্ছিন্নতাবাদ, আর্থিক বিপর্যয় দেশকে আশঙ্কাজনকভাবে সেইদিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে যেখানে এই অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা আর বাঁচার অধিকার বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জিত হলেও পরাধীনতার গ্লানি মোচন হয় নি। উপ-মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য অহেতুক শত শত কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে কারণ বিভাগজনিত নূতন সীমান্ত রক্ষায় দেশগুলির লক্ষ লক্ষ সৈন্য বহাল রয়েছেন। জনসংখ্যায় দ্বিতীয় ভারতবর্ষ যাতে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য বিশ্বের সমস্ত শক্তিজোটের তৎপরতা আর চক্রান্ত অন্তহীন। এদের মধ্যে যতই শত্রুতা থাক্-না কেন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলতে সকলের অস্ত্র ও অর্থসাহায্য প্রসারিত হয়। বলাই বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে অন্য কোনো বৃহৎ বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের কিঞ্চিৎকর। উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রতিরক্ষার ব্যয়, দেশ গঠনে জাতীয় উদ্যমের অভাব, দেশের দৈন্য ও পরমুখাপেক্ষিতা বাড়িয়ে তুলে আমাদের হীনমন্য করে দিয়েছে। অনিবার্যভাবে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রগতির মান অনেক নিচু হওয়ায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য, আর্থিক বৈষম্য, নিরক্ষরের সংখ্যা,

সামাজিক বিভেদ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এর সুযোগে বৈদেশিক শক্তিগুলির প্ররোচনায় দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নকামিতার বিষ প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে চলেছে। দেশে বৈদেশিক অর্থপুষ্ট জাতীয়তাবিরোধী শক্তিগুলি কপট মুখোশ পরে দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের ভালোর জন্য অবতীর্ণ হয়ে নানা-প্রকার বিকারের জন্ম দিচ্ছে এবং ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধের উপর আঘাত হেনে চলেছে। দেশ যেন এক সামগ্রিক বিনষ্টির দিকে ধাবমান। খণ্ডিত ভারতেব এই বর্তমান সমাজচিত্র নেতাজীর আশঙ্কারই ভয়াবহ রূপ।

বিশ্বের সঙ্কট

মানবাত্মার অবমাননা শুধু এই উপমহাদেশে নয়, বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে তা নগ্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের যে পাহাড় জমিয়ে তুলেছেন তা পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজকে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত। এদের ক্ষমতাবিস্তারের লোভ এবং শক্তির অহংকার অতীত ইতিহাসের লোভী ও নৃশংস নৃপতিদের বিশ্ববিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির দম্ভকে অনেক গুণ অতিক্রম করেছে। বস্তুতঃ বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্র-বর্গের শস্ত্রবল, আর্থিক সবলতা, শাসন ও শোষণক্ষমতা এবং প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য মানুষ হত্যার সংখ্যা অতীত ইতিহাসের রাষ্ট্রগুলি থেকে শত-শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক মূল্যবান কথার বাঁধনে তৈরি এক সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলা হয়েছে। এর স্থায়ী সদস্য হলেন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বিজয়ী মিত্রশক্তি জোটের পঞ্চরাষ্ট্র যাঁরা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। নিরাপত্তা পরিষদে কোনো দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চশক্তির কোনো একটি রাষ্ট্র কর্তৃক সামরিক আক্রমণের আলোচনাও ঐ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মতামতে উক্ত রাষ্ট্রগুলির কিছু আসে যায় না। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ, পররাষ্ট্র আক্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভীতিপ্রদ সামরিক মহড়া এবং মানুষের প্রতি অত্যাচার রোধের অপারগতা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে রাষ্ট্রগুলির হঠকারী ও আক্রমণাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ কোনো কার্যকারিতা নাই।

সুভাষচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অফ নেশনসের নাম দিয়ে-ছিলেন 'লীগ অব রবার্স' অর্থাৎ ছিনতাই জোট। বর্তমান বিশ্বেও মাৎস্য-ন্যায়ের ঘাটতি নাই এবং বিশ্বের সংঘাতগুলির পক্ষে বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে

বৃহৎ শক্তিজোট। অন্যদেশের ভিতরে সৈন্য পাঠিয়ে জনগণের স্বাধীনতা কায়েমের প্রচেষ্টাও প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষীণ প্রতিবাদ ছাড়া তার যোগ্য জবাব দেবার ক্ষমতা পৃথিবীর অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলির নাই। রাষ্ট্রসংঘও দর্শকের ভূমিকায় ম্লান হয়ে বিদ্যমান। স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল্যবোধকে কবরিত করে নূতনভাবে দেখা দিয়েছে কঠিনতর সাম্রাজ্যবাদ। ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন হবার মুখে।

আবার একই রাষ্ট্রের মধ্যেই শক্তিশালী শাসক-গোষ্ঠী ও শক্তিহীন করা প্রজার মধ্যে অনিবার্য নিরন্তর বৈষম্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সুনিপুণ চাতুর্যে সুবিধাভোগী শ্রেণী কর্তৃক শোষণের ভিত পোক্ত করার কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সংঘাতের বীজ, সে সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি কেউ পায় না। সাম্য ও স্বাধীনতার বিবর্তন বাধা পেলে ক্রমশঃ তা দুর্বার হয়ে ভাবী বিপ্লবের পথ রচনা করে এবং মানব মুক্তি নূতন করে রূপ পায়। সুভাষচন্দ্র সেই বিপ্লবের মূর্ত দিশারী।

ভারত মনীষীদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ অখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করলে সে নূতন সাম্যের পথের সন্ধান দিতে পারত। ভারতের প্রাণপুরুষ সুভাষচন্দ্র তাই বলেছিলেন: "India freed means humanity saved."[৩] ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হবে মানবসমাজের মুক্তি। আরো বলেছেন, "পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"[৪] এরূপ সমাজ হবে বিশ্বমানবের কাছে এক আদর্শ সমাজ; আর 'ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে।"[৫] এই বাণী হল অখণ্ড সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী এবং তা কখনোই জনগণের অধিকার বিরোধী রাষ্ট্রবাদী দর্শনসমূহের লভ্যবস্তু হতে পারে না। ভারতবর্ষের সাম্য-ভাবনা মানুষকে অখন্ড সাম্যে পৌঁছে দেবে, জনগণের হাতেই থাকবে সব ক্ষমতা এই হল সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য। ভারতকে সেই পথেই চলতে হবে, কারণ তাই হল অখন্ড মুক্তির পথ।

মুক্তির সন্ধানে

মানুষকে অখণ্ড সাম্যে পৌঁছে দেবার স্বপ্ন দেখেছেন সুভাষচন্দ্র। সাধনার মধ্য দিয়ে তাকে রূপায়িত করে তোলার ডাক দিয়ে বলেছেন: "এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি জাতির মানসক্ষেত্রে একদিনে আসে না। বহুদিনের সাধনার ফলে এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ডরূপের উপলব্ধি

পাইতেছি।"[৬] আর "আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে— সকলপ্রকার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। ...রাজনৈতিক হউক, অর্থনৈতিক হউক, বা সামাজিকই হউক— সকলের উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নীতিটিকে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। নর-নারী-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে।..."[৭] কিন্তু "ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কার-মূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়— জীবনের রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না— মূলগত রূপান্তরই চাই।"[৮]

এই রূপান্তরের কাজ সহজসাধ্য নয়। নানা সংঘাত অতিক্রম করে গভীর সাধনার মধ্যে দিয়ে তা লাভ করতে হয়। এ সাধনার শিক্ষা রয়েছে ভারতের ঐতিহ্যে, সংস্কৃতিতে। সে সাধনার বাণীবিধৃত ভারত বেঁচে আছে যুগ যুগ ধরে আপন সাম্য সংস্কৃতির মর্মকে অন্তরে বহন করে— বিশ্বমানবতার স্বার্থে। তাই বলছেন সুভাষচন্দ্র: "ভারতবর্ষ একটি ছোট খাটো পৃথিবী...তাই ভারতের সমস্যা সমাধানের অর্থই জগতের সমস্যাব নিরাকরণ। অবর্ণনীয় দুঃখ-বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ তাহার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে, তাই তাহার মুক্তিলাভের প্রয়োজন আছে। জগৎ আজ ভারতের দানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া আছে— তাহা না পাইলে জগৎ দীনতর থাকিবে।"[৯]

প্রেম ও বিদ্রোহ

ভারতের এই বাণী, এই সাধনার রূপ দেবেন কে? চারিদিকে ছড়ানো দুর্গতির জাল থেকে আমাদের রক্ষা করবেন সে পুরুষ কোথায়? ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করেছেন সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক' রূপে,[১০] আমাদের জাতির রক্ষাকর্তা হিসাবে; গীতা যেমন বলছেন 'সুকৃতের রক্ষা আর দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য' জগৎপিতা 'বারংবার আবির্ভূত হন'। এ সেই দেশনায়ক যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দেশের 'যথার্থ' স্বাভাবিক প্রতিনিধি', যিনি 'সর্বজনীন'; 'বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে' যিনি 'ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন'। কবি চেয়েছেন

দেশের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সুভাষচন্দ্রকে বরণ করে নিক এবং সেই ইচ্ছাতে তাঁর 'ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ'।[১১]

ভারতপুরুষ সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি রক্তাণুতে প্রবাহিত ভারত-ইতিহাসের সাধনা-সিঞ্চিত মমত্ববোধ। কবি তাই বলছেন: "দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"[১২] কিন্তু একমাত্র যোগীই, শুধু যোগী নয় কেবল শ্রেষ্ঠ যোগীই পরের দুঃখকে আপন দুঃখ করতে পারেন। গীতায় তাই বলা হয়েছে: "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যো অর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।"[১৩] অর্জুনকে সম্বোধন করে কৃষ্ণের উক্তি: যিনি সবলের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। শ্রেষ্ঠ যোগীই পূর্ণযোগী, অখণ্ড যোগী।

মানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র রচনা করেছেন অখণ্ড সাম্যমন্ত্রের অতন্দ্র সাধক ভারতের আত্মপুরুষ সুভাষচন্দ্র। তাই যৌবনের প্রারম্ভকালেই অরবিন্দের পূর্ণযোগ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সুভাষচন্দ্র বলছেন যে এর মাধ্যমে অরবিন্দ আত্মা ও জড়, ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেছিলেন।[১৭] আবো বলেছেন: "...অধিমানসের অস্তিত্ব ও যোগ সাধনার দ্বারা আমাদের উহাকে হৃদয়ঙ্গম করার সম্ভাবনা পাশ্চাত্যদর্শনকে স্বীকার করতেই হইবে।"[১৫]

এই যোগ সাধনা মানুষকে নিয়ে যায় অধিমানসের স্বরাজ্যে যার দিব্যপথে ব্রহ্ম লালায়িত হচ্ছেন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, নেমে আসছেন বিশ্বের সৃষ্টির চেতনায় প্রেমের ধারায়। এই প্রেমধারাই সুভাষদর্শনের গঙ্গোত্রী। তাই বলেছেন সুভাষচন্দ্র: "উহা (জগৎ) নিত্যশক্তির নিত্যলীলার প্রকাশ।

"আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং মানবজীবনের মূলনীতি।

"...সত্য হইতেছে আত্মা...যাহার সার হইতেছে প্রেম।"[১৬] ভারতের আত্ম-পুরুষের উপলব্ধির কথা। প্রেমের এই বিজ্ঞানভূমিতে পৌঁছতে পারেন যাঁরা তাঁদের অতিমানব বলা যেতে পারে এবং এই প্রচেষ্টা করতেই হবে। তাই বল-ছেন সুভাষচন্দ্র: "যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ Supermar-এর (অতিমানু-ষের) স্বপ্ন দেখেন না, সে জাতির কি Idealism বা আদর্শবাদ আছে?"[১৭]

আমরা দেখেছি জীবনের সকল কর্মে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, রাজনৈতিক

দুঃখ ভোগে, আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে, আজাদ-হিন্দ সরকার পরিচালনায়, জীবনের মর্মবাণী প্রকাশে সুভাষজীবন এক নিরবচ্ছিন্ন যোগ-সাধনা। প্রেমকে তিনি পেয়েছেন জীবনাদর্শের মূল হিসাবে। সেখান থেকে তা প্রসারিত হয়েছে মানুষের মধ্যে। মানুষের দুঃখ তাই তাঁর আপন দুঃখ হয়ে উঠেছে।

প্রেমই যাঁর জীবনাদর্শের উৎস, রাষ্ট্রদর্শনে অহিংসবাদী হিসাবেই তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত। তিনি শক্তি-প্রয়োগবাদী বিপ্লবী হতে পারেন কিভাবে! যুক্তির এক খেই ধরে এ কথা বলা চলে। কিন্তু ইতিহাসের জটিল বাস্তব প্রয়োজনে সাময়িক শক্তিপ্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনধারা যেন ভাগবত ও গীতার সমন্বয়। আসুরিক শক্তির বিনাশের জন্য দৈবীশক্তির অস্ত্র-ধারণের বা শক্তিপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থরাজিতে। বৈষ্ণব লীলাবাদের উদগাতা পুরুষ 'রসো বৈ সঃ' শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাগবতের চিন্ময় রসঘন পুরুষ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' অবতীর্ণ। সুভাষচন্দ্র তাই বলেছেন: "The voice of Krishna was the voice of immortal youth. (কৃষ্ণের বাণীই চিরন্তন যৌবনের বাণী।*) ধ্বংসের করাল মূর্তি দেখিয়া অর্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না; তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রের মহা-শ্মশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।"[১৮] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী আন্দোলনের দর্শন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য শক্তি প্রয়োগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অহিংসা ও স্বাধীনতা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট ভারতের রাষ্ট্রদর্শনে নেতাজী অহিংসা-বাদকে গ্রহণ করেন নি। গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে নেতাজীর অন্যতম মৌলিক বিভেদ রয়েছে। অহিংসাবাদ রাজনৈতিক আন্দোলনে অস্ত্রহীন জাতির সাময়িক কৌশল হতে পারে কিন্তু তা সহিংস সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিদূরিত করতে পারে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২. ১০. ৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে এক জনসভায়

---

* অনুবাদ লেখকের।

বলেছেন : "...গান্ধীজী ১৯২০ সালে বলেন, 'ভারতের হাতে যদি আজ তলোয়ার থাকত তবে সেই তলোয়ার হাতেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত'। তারপর তিনি বলেন যে, অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব শুরু করা যখন বর্তমানে সম্ভব নয়, তখন আমাদের দেশের মুক্তির একমাত্র পন্থা হচ্ছে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ। কালচক্র এগিয়ে গেছে, এখন ভারতীয়দের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামবার দিন এসে গেছে।"[১৯] ১৯২০ সালে গান্ধীজীর আন্দোলন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ সাধন করে কিন্তু পরবর্তীকালে অহিংসা গান্ধীজীর জীবনবেদ হয়ে দাঁড়ালে গান্ধীজীর পন্থায় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। সুভাষচন্দ্রের মতে তখন গান্ধীবাদের বৈপ্লবিকতা আর রইল না। Gandhism ceased to be revolutionary.[২০]

জনতার তাগিদে এবং বৃটিশের কপটতায় বার বার বিড়ম্বিত হয়ে গান্ধীজী '৪২-এর ঐতিহাসিক অগস্ট আন্দোলনের সূচনা করলেও তার সহিংস বৈপ্লবিক প্রকাশের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নি। "গান্ধী নিজে ১৯৪২-এর সহিংস অভ্যুত্থানের জন্য পরিতাপ প্রকাশ করলেন, এবং জওহরলাল নেহরু ও আবুল কালাম আজাদ উভয়েই প্রকাশ্যে অনুরূপ মত ব্যক্ত করলেন।"[২১]

বস্তুতঃ নেতাজীর আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধই ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার কে. কে. ঘোষ রচিত Indian National Army নামক গবেষণা পুস্তকের মুখবন্ধে লিখেছেন : "... but for the I. N. A. Britain would not have granted independence to India in 1947 seems to me a very reasonable conclusion, as I have stated in my own books."[২২]

আই. এন. এ.-র ঘটনা ব্যতিরেকে ১৯৪৭ সালে বৃটেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মঞ্জুর করত না— এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে খুবই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে ; আমিও আমার পুস্তকগুলিতে এরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছি।

১৯৫৬ সালে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারত-ভ্রমণে এসে কলকাতার রাজভবনে দুদিন অবস্থান করেন। সে সময় পশ্চিম-বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তিনি লর্ড অ্যাটলির সঙ্গে আলোচনার অংশবিশেষ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রকাশককে একটি চিঠিতে জানান। এই চিঠির মধ্যে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লিখেছেন : "ডঃ মজুমদারকে দিয়া বাংলাদেশের এই ইতিহাসটি লেখাইয়া এবং ইহা প্রকাশ করিয়া আপনি একটি মহৎ কর্ম করিয়াছেন।

…গ্রন্থটির ভূমিকায় ডঃ মজুমদার লিখিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যে একমাত্র অথবা প্রধানতঃ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফল এই মত তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমি যখন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরেজ শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই লর্ড অ্যাটলি ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতার রাজভবনে দুইদিন অবস্থান করেন। তখন তাঁহার সহিত আমার ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজদের তাড়াহুড়া করিয়া এ দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল— তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে অ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক ভারতের স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী যুক্তদেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া।'[২৩]

সুভাষচন্দ্রের জীবনীলেখক হিউ টয় (Hugh Toye) বলছেন: "There can be little doubt that the Indian National Army,… in its thunderous disintegration hastened the end of the British rule."[২৪] এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আজাদ-হিন্দ বাহিনী তার… বজ্রঝঞ্ঝাতুল্য ভাঙনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে দিয়েছে।

১৯৪৩-এর ৯ জুলাই সিঙ্গাপুরে এক ভাষণে নেতাজী বলেছেন: "প্রবাসী ভারতীয়রা বিশেষ করে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়রা এমন একটি ফৌজ গড়ে তুলছেন যা… বৃটিশবাহিনীকে আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। এই আক্রমণ যখন আমরা করব তখন যে বিপ্লব শুরু হবে তা শুধু ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই নিবন্ধ থাকবে না, বৃটিশের বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে।… ভিতর ও বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হবে… ভারতবাসী পাবে মুক্তি।"[২৫]

আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতে ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। "The Army and the Air Force were not altogether unaffected. There was trouble in several places…"[২৬] পদাতিক ও বিমানবাহিনীগুলিও একেবারে অবিচলিত ছিল না। বিভিন্ন স্থানে গোলযোগ ঘটেছিল।

হিউ টয় আরো বলেছেন : "...since the first contact of the Indian army, navy and airforce with the mass of the I. N. A. in Rangoon, there had been widespread fraternisation...It's result was a political consciousness which the Indian Servicemen had never before possessed."[২৭]

বৃটিশ-ভারতীয় পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনীগুলির সঙ্গে রেঙ্গুনে আই. এন. এ.-র প্রথম যোগাযোগের পর থেকে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, ফলে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর জোয়ানদের ভিতর এমন রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হল যা পূর্বে কোনোদিন তাদের ছিল না।

এতে বৃটিশের চোখ খোলে। "They realised they were sitting on the brink of a volcano which may erupt at any moment. It is highly probable that this consideration played an important role in their final decision to quit India."[২৮]

তারা বুঝতে পারল তারা এমন একটি আগ্নেয়গিরির কিনারায় বসে আছে যা যে-কোনো মুহূর্তে অগ্নি উদ্গীরণ করতে পারে। খুব সম্ভব তাদের ভারত-ত্যাগের সিদ্ধান্তে এই বিবেচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

কিন্তু এই বৈপ্লবিক চেতনার অপমৃত্যু হল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে। বৃটিশের সঙ্গে আপস হল; রামগড়ের বিশাল জনসভা থেকে আপস-বিরোধী সংগ্রামের ডাক হল ধূলায় লুণ্ঠিত। ভারতবিভাগের মধ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে অহিংস উপায়ে (!) স্বাধীনতা এল; ইতিহাসের জঘন্যতম হিংসার প্রকাশে, রক্তঝরা এক বিপুল নরমেধ ও নারীমেধ যজ্ঞের ভিতর দিয়ে। ঐতিহাসিক Mosley-র ভাষায় : "6.00.000 dead. 1.40.00.000 driven from their homes: 1.00.000 young girls kidnapped by both sides, forcibly converted or sold on the auction block."[২৯]

ছয়লক্ষ মৃত। এক কোটি চল্লিশলক্ষ গৃহ থেকে বিতাড়িত। উভয়পক্ষের একলক্ষ যুবতী অপহৃতা হয়ে ধর্মান্তরিতা কিংবা নীলামে বিক্রিতা।

হিংসার পৈশাচিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই উপমহাদেশে চিরস্থায়ী এক উৎকট সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হল। নেতাজীর স্বপ্নের অখণ্ড সাম্য, স্বাধীনতা, জনগণের ঈপ্সিত মুক্তি স্বপ্নই রয়ে গেল। ভারতের মহান আদর্শবাদের হল নির্মম বিসর্জন।

এর বিরুদ্ধে সংহত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কয়েকজন

মাত্র সুভাষ-অনুরাগী নেতা ও নেত্রী ব্যতিরেকে, এগিয়ে এলো না কেউ। ভারতবর্ষ এক গভীর চক্রান্তের মরণকাঠির ছোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

তবুও ভারতবর্ষের আত্মিক হনন সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "...ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগৎকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতিরূপেই ভাবতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে।"[৩০]

ভাবতবর্ষের এই সাধনার, এই সভ্যতার এক বিশিষ্ট অস্বিত্ব হল সমন্বয়বাদ।

সমন্বয়বাদ

সমন্বয়তত্ত্ব সুভাষ-জীবনদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য; যা তিনি আহরণ করেছেন ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের ভূমি থেকে। বলছেন: "আমাদের ইতিহাসে তখনই এসেছে গৌরবময় যুগ যখন আমরা চৈতন্য ও জড়ের এবং আত্মা ও দেহের দাবির মধ্যে একটা সমন্বয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি এবং সেজন্য একই সঙ্গে উভয়ক্ষেত্রে উন্নতি করা গিয়েছে।... আবার যদি আমাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে হয় তা হলে উভয়ক্ষেত্রে একইসঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।"[৩১]

ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস এই সমন্বয়ের ধারায় প্রবহমান। বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, লীলাবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সকল ধারা ভারতপ্রবাহে লীন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রাকৃত জীবনে সর্বধর্মের সবন্বয়সাধন দেখিয়েছেন। ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন ঋষি অরবিন্দ। সমন্বয়-তত্ত্বকে নূতন ভাস্বরতা দান করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। দেশবন্ধুর জীবনে এই সমন্বয়তত্ত্ব কেমনভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল সুভাষচন্দ্র নিজেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। সমন্বয়তত্ত্বে সুভাষচন্দ্র ভারত-মনীষীদের সফল উত্তরসূরী। 'নেতাজীর জীবনবাদ'-রচয়িতা বিপ্লবীনেতা অনিল রায় বলেন: "সুভাষচন্দ্র শুধু ব্যক্তি নন তিনি সঞ্চিত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের যুগমূর্তি।"[৩২] এবং তাঁর সমন্বয় বিচ্ছিন্ন সুর-সমষ্টির কোলাহল নয়; তা "...একটা সমন্বিত ঐকতান, একটা symphony'র প্লাবন।"[৩৩]

তিনি আরও বলেছেন: "বহুমুখী মানবজীবনের... বিচিত্র সমতা ও সূক্ষ্ম ভারসাম্যকেই নেতাজী নাম দিয়েছেন 'সাম্যবাদ' বা Doctrine of Synthesis. এই সাম্য, সমতা বা সমন্বয়ই নেতাজীর জীবনবাদের মূলতত্ত্ব।"[৩৪]

এই সমন্বয় জীবনের পূর্ণতার দিকে এক বৈপ্লবিক অভিযান। জীবনকে

পূর্ণতর করার অভীপ্সায় সত্যের জয়যাত্রা। কিন্তু এই সমন্বয় নির্বিচার সংযোজন নয়, পূর্ণতার পক্ষে প্রতিকূলতত্ত্ব বা ধারণার বর্জনও বটে। তাই বলছেন সুভাষচন্দ্র: "মায়াবাদে কোন কাজ হয় না।"[৩৫] আবার চাই বর্তমান সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন: "যদি পুরাণগুলি কোনো বিষয়ে বেদান্তগুলি থেকে ভিন্ন হয় তা হলে পুরাণগুলির সে অংশ নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে।"[৩৬]

রাষ্ট্রদর্শনে সমন্বয়বাদ: কমিউনিজম ও ফ্যাসীবাদ

সুভাষচন্দ্র, তাঁর সমন্বয়তত্ত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতের সত্য অংশটুকু গ্রহণ করতে চান যুক্তিবিচারের নিরিখে জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে। বিভিন্ন মতবাদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলছেন: "প্রথমতঃ সকল মতের ভিতর অল্পাবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মতকে চরমসত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসংগত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্যদেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে।

"...আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্যদেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।"[৩৭] বিবর্তনের পথে সমন্বয়ের ধারায় পরবর্তী ধাপের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে নূতন অবদান রাখবে ভারতবর্ষ। তাই বলছেন নেতাজী: "ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবে।"[৩৮]

ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যেও ভালো দিকগুলির সমন্বয় সম্ভব বলে সুভাষচন্দ্র তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই বিষয়টি গভীর মনন সহকারে বুঝতে হবে, তা না হলে আমরা মারাত্মক ভ্রমে উপনীত হব। নেতাজী বলেছেন: "...মানব প্রগতি থেমে যেতে পারে না, সেজন্য পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নূতন কাঠামো তৈরি করব। সেজন্য আমরা ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সাধন করব এবং উভয়ের ভালো দিকগুলি তাতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব।"[৩৯]

এই সমন্বয় রূপায়িত হলে তা হবে এক নূতন রাষ্ট্রদর্শন। ফ্যাসীজমে

জাতীয়তাবাদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এতে জাতির মধ্যে নূতন চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা; জাতীয় ইতিহাসের ধারা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্তি এবং জাতি হিসাবে পৃথিবীর মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার মানবিক অধিকারবোধ রূপ পরিগ্রহ করে। জাতি তার বিশিষ্ট সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলে। পৃথিবীও সে অবদানে মহত্তর হয়ে ওঠে।

দার্শনিক হেগেল দেখেছিলেন তাঁর 'Idea' বা ভাব দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আপন ফুলের পাপড়ি খুলতে খুলতে জার্মান রাষ্ট্রের ভিতরে আপন রূপকে প্রস্ফুটিত করছে। অনেকের মতে এরই খেই ধরে হিটলারের নাৎসীবাদে জাতীয়তাবাদ তীব্র রূপ পেল।[৪০]

জাতি হয়ে উঠল সজীব জ্ঞানে গরিমায়, বিজ্ঞানে, শিল্পে, যাবতীয় উৎপাদনে, সংগঠনে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র। যেন পৃথিবীতে এক নূতন পরীক্ষা বাস্তবায়িত হল। কিন্তু ফ্যাসীবাদ সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে লিপ্ত হলে তা তখন ভারতীয় দৃষ্টিতে সবল জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হল। নেতাজী তাই বলছেনঃ "আমি যখন ভারতের মুক্তিসংগ্রাম লিখছিলাম তখন ফ্যাসীবাদ সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে লিপ্ত হয় নি এবং মনে হয়েছিল ফ্যাসীবাদ একপ্রকার প্রবল জাতীয়তাবাদ।"[৪১] কিন্তু "...তা (ফ্যাসীবাদ) ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয় নি।"[৪২]

ফ্যাসীবাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তিনি তার গঠনাত্মক দিকগুলি বিবেচনা করেছেন, যেমন জাতীয়সংহতি ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতি কিন্তু তার নঙর্থক দিক যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ও ধনবাদী অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন সাধনের অক্ষমতাকে বর্জন করেছেন।

মার্কসবাদ সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্রের বিচার-বিবেচনা ভারতের বিপ্লবাত্মক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় এক নূতন সংযোজন। তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন অবশ্য পরিকল্পনার রূপায়ণে তিনি নিজস্ব ধারায় ভারতীয় পদ্ধতিতে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে চান। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে তাঁর পরিকল্পনা কমিটি ও কমিশন সংগঠনের মধ্যে তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। বলছেনঃ "আপনারা এতে (সোভিয়েত পদ্ধতিতে) এক বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করবেন তা হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজম যেখানে দুর্বল, তা হচ্ছে কমিউনিজম জাতীয় প্রবণতার

মূল্য দেয় না। আমরা ভারতবর্ষে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তার আবেগ অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়— আজকের জার্মানীতে ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম যে জিনিসটি অর্জন করতে পারে নি।"[৪৩]

এবং স্বভাবতঃই কমিউনিজমেও তা ঘটে নি। জাতীয়তাবাদের প্রতি বিদ্বেষভাব কমিউনিজমকে পরিণত করেছে এক উগ্র আন্তর্জাতিকতাবাদে। নেতাজীর জাতীয়তাবাদ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ও জাতির রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের দর্শন। এ জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তা নয় বরং তা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক যে জাতীয়তাবাদ গৃহীত না হলে বিশ্ব হয়ে থাকবে দীনতর। নেতাজী বলছেন: 'সমগ্র মানবসমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে।[৪৪]

আন্তর্জাতিকতাবাদ হবে দাঁড়াবে জাতীয়তাবাদগুলির বিশিষ্ট অবদানের এক সার্থক সমন্বয়, এক কল্যাণকর বিশ্ব-সংগঠনের বনিয়াদ। বলছেন: "আমরা এখন বুঝেছি সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে অবহেলা করে না বরং জাতীয়তা থেকেই তা গড়ে ওঠে।"[৪৫]

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তা গড়ে উঠেছে ভারতের মূল্যবান ঐতিহ্যের উপর আর সে ঐতিহ্য অখণ্ড সাম্য-সাধনার নামান্তর।

এই জাতীয়তা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।[৪৬]

কমিউনিজমের ধর্ম-বিরোধিতাও ভারতে গৃহীত হবে না। সুভাষচন্দ্র বলছেন: "ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মসংস্কার ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মধ্যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।"[৪৭]

সুভাষচন্দ্র আরো বলেছেন: "ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা যাহা কমিউনিজমের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া মনে হয় তাহা ভারতে যাঁহারা ঐ মতবাদের অর্থনৈতিক দিকটি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এমন-কি তাঁহারাও বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইবেন না।"[৪৮]

আবার কমিউনিজম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখলেও কতকগুলি আর্থিকতত্ত্বেও তা দুর্বল। বলেছেন: "যেমন মুদ্রাবিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে

ইহার নূতন কোনো অবদান নাই, চিরাচরিত মুদ্রানীতিই ইহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যাহাই হউক, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পৃথিবীর মুদ্রাবিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনও নিকটবর্তী নয়।"[৪৯]

মুদ্রানীতি এক সমস্যাবহুল তত্ত্ব যার সমাধান পৃথিবী এখনও করে উঠতে পারে নি। মুদ্রা হচ্ছে ধনবাদী অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রবল ভিত্তিভূমি— সে ধনবাদ ব্যক্তিকই হোক বা রাষ্ট্রীয়ই হোক। বর্তমান মুদ্রাতত্ত্বের মূলে যে সাম্য-বিঘ্নকারী একটি ক্ষতিকর ধারা নিভৃতে কাজ করে চলেছে— তা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। তিনি এর থেকে মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র কোনো মুদ্রানীতির অনুসন্ধান করেছেন এবং সেইজন্য সিলভিও গেসেলের (Silvio Gesell) 'ফ্রি-মানি' তত্ত্ব (Free Money Theory) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলছেনঃ "...let me mention the new theory of Free Money evolved by Silvio Gesell, which has been put in operation in a small community in Germany and proved thoroughly satisfactory."[৫০]

আমি সিলভিও গেসেল কর্তৃক উদ্ভাবিত নূতন 'ফ্রি-মানি' তত্ত্বের উল্লেখ করব, জার্মানীর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে যার প্রয়োগ সম্পূর্ণ সফল প্রমাণিত হয়েছে।

এ তত্ত্ব হয়তো সমাজ প্রগতিতে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় ধনবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে কাজ করবে।

মার্কসবাদ সম্বন্ধে আলোচনায় নেতাজী টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতায় বলেছেন ঃ "মার্কসবাদে মানবজীবনে আর্থিক দিকের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা আর্থিক দিকের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি যা পূর্বে অবহেলিত হয়েছে কিন্তু তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নাই।"[৫১]

ইতিহাসের উপর আর্থিক প্রভাব স্বীকার্য কিন্তু তা একমাত্র প্রভাব নয়; ভূগোল, জাতীয়তা, ধর্ম, কামনাবৃত্তি, ব্যক্তিত্ব এ সমুদয়ও গুরুত্বপূর্ণভাবে সমাজের জটিল গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সুভাষ-মনন-ধারা হল বহুবাদী এবং তা সকল মতবাদের সফল সমন্বয়ের দিগ্‌দর্শন রচনা করেছে। মানবসমাজের ইতিহাস একবাদী হতে পারে না। সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ "... বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির ও জাতির বিকাশ সাধন করিতে

হইবে।"[৫২] একবাদী দর্শনসমূহের অসহিষ্ণুতা ও আক্রমণাত্মক আচরণ প্রগতির ও স্বাধীনচিন্তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কমিউনিজমও অন্যতম একবাদী দর্শন। সমন্বয়ের পথে অগ্রসর না হলে 'মানব প্রগতি শেষ হয়ে আসবে'।"[৫৩] চিন্তার ক্ষেত্রে দর্শনের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু নাই। পূর্বেই বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র চেয়েছেন, "ভারতবর্ষ…রাজনৈতিক সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবার চেষ্টা করবে।" অন্যত্র বলেছেন ঃ "…হেগেল, বার্গসন বা অন্য কারো বিবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করুন-না কেন, কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের ভাবা ঠিক নয় যে সৃষ্টি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"[৫৪]

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে সরাসরি শ্রমিক ধর্মঘটেও অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই তিনি বলেছেন ঃ "ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষকদের সমস্যা শ্রমিক সমস্যা অপেক্ষা অধিক গুরুতর।"[৫৫]

শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারেও সোভিয়েত রাশিয়ার কার্যকলাপ ভারতবর্ষ অনুসরণ করবে না। বর্তমানের সমাজ-কাঠামোতে ভারতে ধনী ও সর্বহারার বিরোধ বর্তমান। এই নির্ধনের দল বিপ্লবের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে।[৫৬] কিন্তু স্বাধীন সরকারের হাতে যখন সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তখন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীসংগ্রামকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। তাই নেতাজী টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ভাষণে বলছেন ঃ "যদি স্বাধীন ভারতীয় সরকার জনতার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে তাহলে শ্রেণীবিরোধের প্রয়োজন নাই। আমরা রাষ্ট্রকে জনতার সেবক রূপে সংগঠিত করে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি।"[৫৭]

এই ভাষণের অন্যত্র বলছেন ঃ "আমরা আজ বাস্তবে দেখছি আমাদের যুগে আমাদের জাতীয় আন্দোলন জনগণের অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক যাঁরা জনতার শতকরা ৯০ ভাগ তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে; তাঁদের স্বার্থ আমাদের অন্তরে সেজন্য কমিউনিস্ট পার্টির মতো একটি স্বতন্ত্র দলের কোনো প্রয়োজন নাই।"[৫৮]

নেতাজীর সমাজবাদী চিন্তাধারা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের উপর পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিমূলক চিন্তাধারার সত্য অংশগুলির যৌক্তিক সংযোজন। সাম্যের চিন্তাধারা কোনো নূতন আবিষ্কার নয়। তাই বলছেন সুভাষচন্দ্র ঃ

"...socialism did not derive its birth from the books of Karl Marx. It has its origin in the thought and culture of India."[৫৯]

সমাজবাদ কার্ল মার্কসের পুঁথির পাতায় জন্ম নেয় নি। ভারতবর্ষের চিন্তা ও সংস্কৃতির মধ্যে এর মূল নিহিত রয়েছে।

আরও বলেছেন: "অনেকের ধারণা আছে যে Socialism অথবা Republicanism বুঝি-বা পাশ্চাত্য সামগ্রী কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism ও Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না, এমন-কি বর্তমান যুগেও ভারতের কোন কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।"[৬০]

দর্শনের ভালো ছাত্র হিসাবে পৃথিবীর দার্শনিক মত সমূহ সুভাষচন্দ্রের অধিগত ছিল। অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী একজন খাঁটি ভারতীয় হয়েও তিনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণ বর্জন করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা এক নূতন সাম্যতন্ত্রী ভাবনার জন্ম দিয়েছে যাকে সাম্যবাদ যা সমন্বয়বাদ বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই সাম্যবাদ হয়ে উঠেছে এক নূতন জীবনদর্শন। কমিউনিজম ও ফ্যাসীবাদের যে যে উপাদানগুলি সুভাষচন্দ্র বর্জন করেছেন, সে-সব পরিত্যক্ত হলে অবশিষ্টাংশ আর কমিউনিজম বা ফ্যাসীবাদ থাকে না।

সুভাষচন্দ্র বলেন: "আমার মত হল আধুনিক যুগের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে যা-কিছু ভালো ও প্রয়োজনীয় পাওয়া যাবে, সে সবের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এজন্য ইউরোপ-আমেরিকার সকল প্রকার প্রচলিত আন্দোলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি সমালোচনা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।"[৬১]

এইভাবে বিভিন্ন মতবাদের ভালো দিকগুলি গ্রহণের কথা বলে, ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি তাঁর বহুবাদী সমন্বয়ী চিন্তাধারার রূপ দিয়েছেন। এই বহুমুখী চিন্তার সমন্বয়ে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তিনি তারই নামকরণ করেছেন 'Doctrine of Synthesis' অর্থাৎ সাম্যবাদ বা সমন্বয়বাদ।

তাঁর মননধারা বর্তমান বিশ্বের চলতি আদর্শগুলির ব্যর্থতা ও দেউলে অবস্থা অতিক্রম করে আমাদের নূতন জীবনাদর্শের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুভাষচন্দ্র সে আদর্শ রূপায়ণে আত্মবলিদানের আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও নির্ভীকভাবে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ডায়ালেকটিকস ও বিবর্তন সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্র

তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেনঃ "...বহু চেষ্টা হইয়াছে অগ্রগতির নিয়মকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। এই প্রচেষ্টার কোনটিই নিষ্ফল নহে; প্রত্যেকটির ভিতরে আমরা সত্যের ইঙ্গিত পাই।"[৮১]

এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র অতীত ভারতের সাংখ্যদর্শন, বর্তমান জগতের চিন্তাবিদ স্পেন্সার, ভন হার্টমান, বার্গসন, ও হেগেলের নামোল্লেখ করেছেন। হেগেলের মতকে তিনি সত্যের কাছাকাছি বলে আখ্যাত করলেও তাঁর (হেগেলের) বিশ্বাসকে একরোখা মনে করেছেন। বলছেনঃ "...হেগেলের এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে কি চিন্তারাজ্যে, কি বস্তুজগতে এই বিবর্তন-ক্রিয়ার প্রকৃতিটা তর্কশাস্ত্রের ব্যাপার।"[৮২]

আবার বলছেনঃ " অখণ্ড সত্য বলিয়াও উহাকে (হেগেলের মতকে) স্বীকার করা যায় না, কারণ যে সকল বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি ঐগুলির সঙ্গে উহা মিলে না।"[৮৩]

কার্ল মার্কস, হেগেলের ডায়ালেকটিকস তত্ত্বের যুক্তি গ্রহণ করে তাকে জড়বাদের উপর দাঁড় করিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতেই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক সত্তা। অপরপক্ষে অগ্রগতির নিয়ম সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাঁর মত ব্যক্ত করে বলেছেনঃ "...সত্য হইতেছে আত্মা যার সার প্রেম, উহা পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ ও ঐগুলির সমাধানের নিত্যলীলার মধ্য দিয়া নিজেকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছে।"[৮৪] বিবর্তন সম্পর্কে হেগেল ও কার্ল মার্কসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের ভিত্তিমূলক প্রভেদ রয়েছে।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক যুক্তিবাদ এবং মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদে ইতিহাসের গতিপথ স্থিরীকৃত। হেগেলের দর্শনে প্রজ্ঞার বিকাশ হয় রাষ্ট্রে। হেগেলের রাষ্ট্রীয় শ্রেয়োবাদ ও শ্রেষ্ঠ জাতিতত্ত্ব স্বৈরী জাতীয়তার ইন্ধন। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি সুভাষচন্দ্রের বহুবাদী ধ্যানধারণা এরূপ মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী ও সংকীর্ণতাবাদী মহলে আজও তাঁকে একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র গণতন্ত্র সম্পর্কেও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

গণতন্ত্রের প্রতি

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্র সংগঠনের মতকে অনেকে একনায়কতন্ত্র বা একদলীয় কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্টদের অনুরূপ সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন কিন্তু তা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক বিবেচনার পরিচয় বহন করে। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তার আর্থিক, সামাজিক সমস্যাগুলির আশু প্রতিকারের তাগিদে অল্প কয়েক বছরের জন্য কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র আমাদের দেশে ফলদায়ক ব্যবস্থা নয়। কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সময়েই গড়ে তুলতে হবে স্বাবলম্বী আর্থিক কাঠামোর ভিত্তি। তাঁর গঠিত দল হবে সামরিক শৃংখলার অধীন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "…(তাঁর দল) ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে কয়েক বৎসরের জন্য কর্তৃত্বমূলক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে বিশ্বাসী হইবে।"[৬৬]

আরো বলছেন: "ইহা (দল) মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গণতন্ত্র সমর্থন করিবে না বরং স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর যখন ভারতকে নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিতে হইবে তখন ভারতের সংহতি রক্ষা ও বিশৃংখল অবস্থা রোধের একমাত্র উপায় হিসাবে সামরিক শৃংখলাযুক্ত একটি শক্তিশালী দলের সরকার স্থাপন সমর্থন করিবে।"[৬৭]

এই প্রাথমিক অবস্থা উত্তীর্ণ হবার পর দল "অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে ভারতের জন্য একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকার গঠন সমর্থন করিবে।"[৬৮]

সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো ভাষণেও বলেন: "যদি আমরা সমাজবাদী চরিত্রের একটি আর্থিক সংগঠন চাই, তা হলে আমাদের রাষ্ট্রিক পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে সেই আর্থিক কার্যসূচী সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায়ে রূপায়িত করা যায়। যদি সমাজবাদী ভিত্তিতে আর্থিক সংস্কার সাধন করতে হয়, তবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে না। সেজন্য আমাদের চাই একটি কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক পদ্ধতির রাষ্ট্র। …যে-রাষ্ট্র জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করবে এবং তা কয়েকটি ধনী ব্যক্তির চক্রান্ত-স্বরূপ হবে না।"[৬৯]

আরো বলেছেন: "আমরা স্বভাবতঃই অন্যান্য দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি বিবেচনা করব কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি ও ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ীই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেজন্য পরিশেষে যে পদ্ধতি আমরা

গ্রহণ করব তা হবে ভারতবাসীর প্রয়োজনের উপযোগী এক ভারতীয় পদ্ধতি।"[৭০] অর্থাৎ তা কোনো দেশের নকল করা পদ্ধতি হবে না।

মৌলিক অধিকার বিষয়ে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে হরিপুরা ভাষণে বলেন: "ভারতের প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের, স্বাধীনভাবে মেলামেশা এবং সংগঠন গড়ে তোলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে অস্ত্র না নিয়ে সমাবেশের অধিকার থাকবে, এগুলি আইন ও নীতিবিরুদ্ধ হবে না।

"প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা সংগঠিত হবে।"[৭১] এই ভাষণের অন্যত্র বলেন:

"একটি মাত্র দল থাকলে রাষ্ট্র সম্ভবতঃ একনায়কতন্ত্রী হয়ে উঠবে যেমন হয়েছে জার্মানী, রাশিয়া, ইটালীতে। কিন্তু অন্যদলগুলিকে নিষিদ্ধ করার কোনো কারণ নাই। তা ছাড়া পার্টির থাকবে গণতান্ত্রিক ভিত্তি, এবং উদাহরণস্বরূপ তা নেতাভিত্তিক নাৎসীপার্টির মতো হবে না। একের বেশি দলের অবস্থিতি এবং কংগ্রেসদলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ভবিষ্যৎ ভারতরাষ্ট্রের একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবার পথে বাধাস্বরূপ হবে। উপরন্তু দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকায় এটা নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হবে যে উপরের থেকে জনগণের উপর নেতা চাপিয়ে দেওয়া হবে না বরং তাঁরা নীচের থেকে নির্বাচিত হবেন।"[৭২]

অনেকে ভাবেন এ ধরনের গণতন্ত্র পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ। সুভাষচন্দ্র এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছেন: "আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে গণতান্ত্রিক বা আধা-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য-ধর্মী হয়ে গেছে কারণ গণতন্ত্র হচ্ছে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান।··· অজ্ঞানতা আর ধৃষ্টতা এর থেকে বেশি হতে পারে না। গণতন্ত্র কোনোমতেই পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান নয়, গণতন্ত্র এক মানবিক প্রতিষ্ঠান।···ভারতের অতীত ইতিহাস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কথায় পূর্ণ। শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর 'হিন্দু পলিটি' (Hindu Polity) নামক আশ্চর্যজনক পুস্তকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন ভারতের ৮১টি রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন।··· আজো ভারতের কোনো কোনো প্রান্তে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থিতি রয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ আসামের খাসিদের মধ্যে এখনো প্রচলিত প্রথা অনুসারে সমগ্র গোষ্ঠীর ভোটে প্রধান শাসক নির্বাচিত করা হয় এবং এই প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষ-পরম্পরায় চলে আসছে। গণতন্ত্রের নীতি গ্রাম ও শহরগুলির সরকারী প্রশাসনে প্রয়োগ করা হয়েছিল।···

স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ প্রশাসন সম্পর্কে গ্রাম-পঞ্চায়েতের কথা ভারতীয়দের মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নাই— এই পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান অতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক নয়, উন্নত ধরনের অন্যান্য সামাজিক রাষ্ট্রিক মতবাদ অতীত ভারতের অবিদিত ছিল না।"[৭৩]

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে গ্রাম সংগঠনে অতীতের পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবিত দলের কর্মসূচীর মধ্যে বলেছেনঃ "ইহা (দল) অতীতের পঞ্চায়েত-শাসিত গ্রাম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবে এবং জাতিভেদের ন্যায় বর্তমানের সামাজিক বাধাগুলি উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করিবে।"[৭৪]

সুভাষচন্দ্রের গণতন্ত্রের বাণী হল, ''জনগণের হাতে সব ক্ষমতা''। All power to the Indian people.[৭৫] এই মন্ত্রকে রূপ দেবার জন্য বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ধনীচক্রের বাধা-বিপত্তি প্রতিরোধ করে নূতন আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপনের জন্য সেবাব আদর্শ নিয়ে সাময়িকভাবে কর্তৃত্বমূলক প্রশাসন প্রয়োজন হবে। তার পর 'জনতার হাতে সব ক্ষমতা'র দর্শন রূপায়ণে অখণ্ড স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কিন্তু তা কেতাবী গণতন্ত্র হবে না। ভারতেব পঞ্চায়েত প্রশাসনের ভিত্তিতে গ্রাম-স্বরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা হবে যাতে ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে বিকেন্দ্রিত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে গ্রাম-প্রধান ভারতের মানুষ অখণ্ড সাম্য ও স্বাধীনতার সফল রূপায়ণে নিজেদের পূর্ণ করে তুলে পৃথিবীতে নূতন এক সাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার দিগ্‌দর্শন রচনা করতে পারে।

ভারতবর্ষে এই রূপায়ণ স্বপ্নই থেকে যাবে যদি না আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভেঙে ফেলতে সক্ষম হই। সেজন্যই চাই বিপ্লববাদী মানসিকতা। সাম্রাজ্যশাহীর বিতাড়ন ও পরে অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সাম্য-সমাজ গঠন— একটি বিশাল দেশে এই প্রকার দ্বয়ী বিপ্লবের কাজে কোনো ঐতিহাসিক উদাহরণ নাই। সেজন্য সুভাষচন্দ্রকে গভীর মননের সঙ্গে নূতন পথের সন্ধান করতে হয়েছে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের অনন্য কার্যাবলী তাঁকে এক নূতন দুঃসাহসী সাম্য-সমন্বয়বাদী ভারতীয় বিপ্লবীরূপে চিহ্নিত করে।

নির্ভীক অনন্য বিপ্লবী

কাম্বে বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেনঃ "আমি এ কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা মূলগত। সামান্য দু-চারটি নগণ্য

পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না। একটি গভর্নমেন্টের পরিবর্তন বা মন্ত্রীদলের পরিবর্তন বিপ্লব নয় কারণ এতে জাতীয় জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে না।

'বিপ্লব দুই প্রকারের। এক হচ্ছে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব। দ্বিতীয়তঃ দেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব। বৈদেশিক শাসনাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়তঃ নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় নি কারণ ফরাসীদেশীয় রাজারাই তখন সে-দেশে রাজত্ব করতেন। ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন এবং একটি নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি। রাশিয়ার বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন। দেশবাসী উপলব্ধি করেছিল যে তাদের নিজেদের রাজাই দেশের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। নূতন সমাজ সৃষ্টির জন্য তাদের রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করতে হয়েছিল। ১৯২৬ সালের আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লব ছিল বৈদেশিক শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সুতরাং আমাদের বিপ্লবকে আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দেশীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করে নূতন সমাজব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। কিন্তু প্রথমে বিদেশী শক্তিকে অপসারিত করা এবং তার পরে নূতনতর সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি সত্যই আরো কঠিন কাজ।

"তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটাই হচ্ছে জাতীয় বিপ্লব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন— এটা হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব। আমাদেরকে প্রথমতঃ বৈদেশিক শাসনপাশ হতে মুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ আমাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশকে পুনর্গঠিত করতে হবে।

"...আমাদের বিপ্লব কেবলমাত্র সেইদিনই শেষ হবে যেদিন আমরা সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যে সমাজে প্রত্যেক ভারতবাসীই তার জন্মগত অধিকার লাভ করবে।

"...যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার আদর্শ এবং সমাজজীবনে ন্যায়ের আদর্শ সফল না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা বিপ্লব চালিয়ে যাব।"[৭৬]

এই বিপ্লবী কার্যকলাপ তিনি গড়ে তুলেছিলেন দেশের মতাদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে এবং এ বিষয়ে বাইরে থেকে কমিউনিস্টদের সাহায্যের জন্যও হস্ত

প্রসারিত করেন নি। বস্তুতঃ জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষে বামপন্থার সংজ্ঞা ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ছিল ভিত্তিগত পার্থক্য। কমিউনিস্টদের বামপন্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাশিয়ার তদানীন্তন চুক্তিগুলি সুভাষচন্দ্র ভালোচোখে দেখতে পারেন নি। বলছেনঃ "…রাশিয়া আত্মরক্ষায় বিব্রত এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আপাতবিপ্লবী চরিত্র সত্ত্বেও বিশ্ববিপ্লব জাগিয়ে তোলার মতো কোনো স্বার্থবোধ তার নাই। রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির লিখিত ও অলিখিত নানা শর্ত-সমন্বিত চুক্তি, লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ গ্রহণ বিপ্লবী শক্তি হিসাবে রাশিয়ার গুরুতর মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে। তার উপর রাশিয়া তার শিল্পসংগঠনের জন্য ও পূর্বপ্রান্তে জাপানী আতঙ্কের মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকায় এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রতা রক্ষায় উদ্‌গ্রীব বলে ভারতবর্ষের দিকে সক্রিয় লক্ষ্য দেবার মতো মানসিকতা তার নাই।"[৭৭]

ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অদ্ভুত ও শত্রুতামূলক আচরণ এবং বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা সুভাষচন্দ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

বলছেন ঃ "ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক জীবনধারায় বামপন্থা বলিতে বুঝায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। যিনি প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাঁহার রাজনৈতিক লক্ষ্য হইতেছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতার সারবস্তু নয়) এবং তিনি বিশ্বাস করেন আপসহীন জাতীয় সংগ্রামই এই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর, বামপন্থা বলিতে বুঝাইবে সোস্যালিজম বা সমাজবাদ।"[৭৮]

আরও বলেছেন ঃ "আমরা অনেক ছদ্মবেশী বামপন্থীর সাক্ষাৎ পাই যাঁহারা কাপুরুষতাহেতু সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম এড়াইয়া চলেন এবং যাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দর্শান যে মিস্টার উইনস্টন চার্চিল (যাঁহাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ামণি বলিয়া জানি) হইতেছেন সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্রোহী। এই সব ছদ্ম বামপন্থীদের রীতি হইয়াছে বৃটিশ সরকারকে বিপ্লবী আখ্যা দেওয়া, যেহেতু ঐ সরকার নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার্থে তাঁহারা বিস্মৃত হন যে বৃটেনের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ এবং

বিশ্বের বৃহত্তম বিপ্লববাদী-শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী সরকারের সহিত পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে।"[৭৯]

নির্ভীক এই মানুষটি ভারতের বা অন্যদেশের কোনো ব্যক্তির কাছে মাথা নত করেন নি। গান্ধী, মার্কস, হেগেল প্রমুখ চিন্তাবিদদের সঙ্গে মতৈক্য বা মত-পার্থক্যের বিষয় নির্ভীকভাবে ঘোষণা করে তিনি তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর এই বিপুল চিন্তাবৈভব আর অবিশ্বাস্য নির্ভীকতা ইতিহাসে তাঁকে এক অনন্য চিন্তাবিদ বিপ্লবী বলে চিহ্নিত করেছে। ভারতবর্ষে তিনি শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে জনতার হৃদয় অধিকার করেছেন— মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর গ্রন্থে নেতাজী সম্পর্কে বলেছেন : "Only one outstanding personality took a different and violent path and, in a sense, India owes more to him than to any other man..."[৮০]

কেবলমাত্র একজন সুবিদিত ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র ও সহিংস পথ গ্রহণ করেছিলেন; বলতে গেলে, ভারতবর্ষ অন্য যে-কোনো ব্যক্তির তুলনায় তাঁর কাছেই অধিকতর ঋণী।

জার্মানীর রুশ আক্রমণকে তিনি সমর্থন করেন নি, জার্মানীতে অবস্থান কালেই (হের ওয়রম্যান রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।[৮১] আরো বলেছেন : "Tell His Excellency (Hitler) that...I do not need advice from any side . "[৮২] মহামান্য হিটলারকে জানাবেন··· কারো কাছ থেকে আমার উপদেশের প্রয়োজন নাই··· ।

বলেছেন : " I am not an apologist of the three powers .. my concern is however with India."[৮৩]

আমি ত্রি-শক্তির সমর্থনে যুক্তিপ্রচার করি না। আমার একমাত্র ভাবনা হল ভারতবর্ষ।

১৯৪২-এর বসন্তকালে জার্মান অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে বলছেন : "You know as well as I do that Germany can not win this war. But this time victorious Britain will lose India."[৮৪]

আপনিও জানেন যেমন আমিও জানি, জার্মানী এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু এবার বিজয়ী বৃটিশ ভারতবর্ষ হারাবে।

দেখেছি জাপানের সঙ্গে শর্তাদি আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। শুনেছি তাঁর বক্তৃতা আরাকান ফ্রন্টে যাবার আগে সৈন্যদের সামনে : "যদি

আপনারা দেখেন জাপানীরা ভারতে কোনো প্রকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা হলে ঘুরে দাঁড়াবেন এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে যেমন উৎসাহব্যঞ্জক যুদ্ধ করেছেন তেমনি ভাবেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।"[৮৫]

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে এই বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মে।

সমাধানের ইঙ্গিত

অভীমন্ত্রের সাধক বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে আত্মোৎসর্গ করেছেন। নেতাজী চেয়েছেন অতীত ভারতের ঐতিহ্যানুসারী পঞ্চায়েতী গ্রাম-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সম্ভাব্য স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজবাদী নীতিতে রাষ্ট্রকর্তৃত্বে বড় বড় শিল্প সংগঠন, উৎপাদন ও বন্টন, পরিপূরক ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের সংস্থান, সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি সমস্যার সমাধান, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও সারা ভারতে সুষ্ঠু ভূমিনীতির প্রবর্তন, বেকার সমস্যার সমাধান, ধনবাদী চক্রান্তের অবসান, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে সমাজবাদী ব্যবস্থার সংগঠন; পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে এর রূপায়ণ, 'All power to the Indian people' অর্থাৎ ভারতীয় জনতার হাতে সব ক্ষমতার নীতিতে নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান অধিকার দান; প্রত্যেকের সমান সুযোগের ব্যবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতার প্রবর্তন; জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি।

ভারতীয় সমাজ সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে নেতাজী রাষ্ট্র-নৈতিক ও আর্থিক-সামাজিক দ্বয়ী বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কোনো বৃহৎ দেশে এ ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয় নি। ভারতবর্ষে এই দ্বয়ী বিপ্লবের লক্ষ্য হল প্রথমে বৈদেশিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে সামাজিক-আর্থিক বিপ্লবকে সফল করে তোলা। পূর্ব-এশীয় ভারতীয়-গণ ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগঠনে, বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায়, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায়, আজাদ-হিন্দ সরকার কর্তৃক মুক্তাঞ্চলের রাষ্ট্রিক, সামাজিক সংগঠনে ও সেই সরকারের অন্যান্য কাজের মধ্যে এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিকাশ ঘটেছিল। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতায় স্বাধীনতার পর কাজের প্রসঙ্গে নেতাজী বলেছেন: "ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে বড় কাজ হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংগঠন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের

স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায়। সেজন্য আমাদের আধুনিক যুদ্ধোপযোগী শিল্প গড়ে তুলতে হবে।... এর অর্থ হল শিল্পোন্নয়নের জন্য এক অতি বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ।

"আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটলে পরবর্তী জরুরি কাজ হবে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান।... আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা কেমন করে লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া যায় এবং কিরূপে জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য মোচন করা যায়।

"স্বাধীন ভারতের তৃতীয় কাজ হবে শিক্ষা বিস্তার।

"আমরা যদি দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছেড়ে দিই তা হলে তাতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। সেজন্য ভারতের জনমত কোনোপ্রকার সমাজবাদী পন্থার পক্ষে যে পন্থা ব্যক্তির উপরে উদ্যোগ গ্রহণের ভার ছেড়ে দেবে না। সরকারই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।"[৮৬]

ভারতের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে নেতাজীর বক্তব্য নানা লেখায়, বক্তৃতায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এক মহান ভারতকে নূতন ভাবে গড়ে তোলা; জ্ঞান-গরিমায় মহান, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে গরীয়ান, আধুনিক বলে বলীয়ান, কৃষি ও শিল্পে প্রাগ্রসর, অখণ্ড সাম্য-সমন্বয়ী ভারতীয় চিন্তাধারার জীবন্ত বিকাশে প্রোজ্জ্বল এক নূতন মহাভারত। বিশ্বকে নূতন বাণী শোনাবার দায়িত্ব নিয়ে যে ভারত এগিয়ে আসবে পৃথিবীর বুকে এক সফল মানবিক সমাজ রচনায় সহায়তা করতে। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ-মুক্তিসম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে... সে সমাজে জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না— যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে... যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না... যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে,... সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে-আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট নিত্য ও অখণ্ড সত্য...এবং এই

স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিলেও 'সে মরণ স্বরগ সমান'।"[৮৭]

নান্যঃ পন্থা

এই ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে বিভিন্ন জাতির মিলিত প্রয়াসে মহান চিন্তার ও ধর্মের বিকাশ ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই মহাভারতের সফল সাম্য-সমন্বয়ী ধারার ইতিহাস-মনীষা। তাঁর জীবনবাদ দেশী ও বিদেশী স্থিত স্বার্থের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রিক সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে আত্মিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে এক নূতন প্রমূল্য প্রতিষ্ঠার দিকদর্শন। এই মূল্যবোধ রূপায়ণের গুরু দায়িত্ব ভারতবর্ষের। নেতাজীর কর্মে ও চিন্তাধারায় ভারতের আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিপ্লবের মহান সমন্বয় ঘটেছে বলেই ভারতের ঈপ্সিত পথ নেতাজীর পথেরই সমার্থক। ভারতবর্ষকে সেজন্য নেতাজীর পথেই অগ্রসর হতে হবে। তাঁর পথই জাতির সংকটমুক্তির ও ভারতীয় ঐতিহ্য-অনুসারী সাম্য-সমন্বয়ের লক্ষ্যে উত্তরণের পথ।

নেতাজীর জীবনবাদের রূপকার বিপ্লবী চিন্তানায়ক অনিল রায় তাই বলেছেন: " নেতাজীর পথই ভারতের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।"[৮৮]

—